ফানুসের আয়ু

ফানুসের আয়ু

বিমল কর

কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন
১৩৬৫
প্রকাশক। বীরেশ্বর বসু
কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২
মুদ্রক। সুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ। সুবোধ দাশগুপ্ত
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ। রঞ্জিত প্রসেস
দাম: ৫.৫০ নঃ পঃ

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

প্রথম পর্ব

তিতু

এই ঘর তিতুর।

এখানে সবই বেমানান। তিতুর সঙ্গে কোথাও খাপ খায় না।

ঘর বড়। এত বড় ঘর—তিতু মাঝে মাঝে ভাবে: স্কুলের ঘরের মতন। ক্লাস-রুমে আটটা হাইবেঞ্চ, ত্রিশ জন ছেলে, চারটে জানলা, টিচারদের দাঁড়াবার কাঠের ছোট চৌকো ফ্লোর—তার ওপর টেবিল, চেয়ার। ওআল্‌-বোর্ড। সব মানিয়ে যায়। ভরাট লাগে। মনে হয় না, ঘর বড়; জানলা বেশি, দরজা অনেক উঁচু।

এই ঘর অনেক বড়। তিতু এখানে একা। তিন জানলা, তিন দরজা। পুব দেওয়ালে দুটো জানলা, দরজার দুপাশে। দুটোই বড়; কাঠ নেই—শুধু রঙ মাখানো শার্সি। পুবের দরজাও বেশ বড় আর উঁচু। শার্সির বাইরে কাঠের পাল্লা। যেমন দক্ষিণের জানলা। শার্সি আছে, কাঠও আছে। দক্ষিণের জানলা কোনোদিন খোলা হয় না। বন্ধ থাকে। বরাবরই। কাঠের সঙ্গে বল্টু দিয়ে আঁটা। কেন? যদি চোর আসে।

পুবের জানলা দিয়ে চোর আসতে পারে—, হয়ত এসেছিল আগে কোনোদিন, তিতুরা তখন এই বাংলোয় আসে নি। তিতুরা আসার আগেই পুবের জানলায় বরফি-কাটা তারের জাল পড়ে গেছে। বাইরে থেকে। ঘন বাদামী রঙ মাখানো জাল।

পশ্চিমের দরজা ছোট। কম চওড়া—কম উঁচু। ওটা বাথরুমের দরজা। লাট্টুর মতন ঘুরোনো ছোট্ট হাতল। দরজায় ঘন করে বাদামী রঙ মাখানো। আঠা আঠা, চকচকে। এই দরজাটা তিতুর ভাল লাগে। বাথরুমে একটি জানলা, একটি কাঠ-কাচ মেশানো দরজা দক্ষিণে। তিতুর খুব পছন্দ।

বাথরুমের মতন তার ঘরও যদি ছোট হত, ছাদ নীচু হত, আধখানা দেওয়াল ফিকে-হলুদ বার্নিশ দেওয়া থাকত, তিতুর ভাল লাগত।

এই ঘর তিতুর ভাল লাগে না। বড়, ভীষণ বড় ঘর। পুবের দরজা অনেকখানি উঁচু। উত্তরের দরজাও তাই। আরও চওড়া। ও-দরজা বন্ধ করা হয় না। ফিকে-খয়েরী রঙের মোটা পরদা ঝোলে। সারাক্ষণ।

পরদা পুবের দরজাতেও ঝোলে। পেতলের আংটার সঙ্গে জড়ানো ভারী পরদা, সেই খয়েরী রঙেরই। জানলার পরদা ছোট ছোট, আধখানা জানলা ঢাকা। পাতলা মশারির মতন জাল জাল কাপড়। সাদায় খয়েরীতে নক্‌শা করা।

এত কাচ, পরদা ঢাকা-রাখার ফলে এ-ঘরে আলো কম আসে। রোদ আসেই না। প্রায় শেষ দুপুরে খুব হালকা একটু ঝকঝকে আলো আসে, অল্পক্ষণের জন্যে।

এই ঘর তাই সব সময় ছায়া-ছায়া। সকালে ফরসা ভাব খানিকটা থাকে, বেলা বাড়ার পর কমে যায়। দুপুর থেকে রীতিমত ছায়া ঘন হয়ে আসে কোণে কোণে—পশ্চিম

দেওয়ালে। ছাদের সিলিং অন্ধকার হয়ে যায়। কী উঁচু সিলিং। তিতুর মনে হয়, অন্ধকারে, তার মাথার ওপর ছাদ নেই। আকাশ ঝুলে আছে।

বিকেল হলে এ-ঘর মরা-গোধূলির মতন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চার পাশে চাপ চাপ অন্ধকার জমে যায়। নানা রকমের কিম্ভূত ছায়া যেন ঘরের কোণা গড়িয়ে, দেওয়াল থেকে লাফ মেরে, পরদার গা থেকে টুপ করে নেমে ঘরের মধ্যে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ে। আর যত বিকেল বাড়ে, এই ছায়াগুলো তত গাঢ় হয়, তত আরাম পায়—খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আলনা দেরাজ সব জুড়ে বসে। বাতি না-জ্বলা পর্যন্ত তিতুর এ-ঘর আর ভাল লাগে না। খারাপ লাগে। কেমন এক ধরনের ভয়ও হয়।

এ-ঘরের সবই বেয়াড়া তিতুর কাছে। সাদা রঙ ধরানো লোহার খাট—স্প্রীং দেওয়া; চার কোণায় পেতলের সরু চৌকো চৌকো খুঁটি—মশারি বাঁধার। তিতুর মনে হয়, লোহার এই কঠিন শক্ত রড্ ভাল না। একদিন এই রড্ খুলে বাবা তাকে মারতে পারে।

লোহার স্প্রিং-দেওয়া খাট বেশ লম্বা চওড়া, অনেকটা পড়ে থাকে, তিতু টান টান পা ছড়িয়ে শোবার পরও। পাশেও তাই। আরও দু-মানুষ শোওয়ার জায়গা খালি খালি থাকে তিতুর শোওয়ার পরও। তিতুকে পাশবালিশ দেওয়া হয় না। পাশে কেউ কোনোদিন শোয়ও না। একা-একা শুয়ে থাকে তিতু। তার মনে হয় এই বিছানা ভীষণ ফাঁকা। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে তিতুর ভয় হয় খুব। এ-পাশ ও-পাশ সব ফাঁকা; ঘুটঘুটে অন্ধকার, এতটুকু শব্দ নেই কোথাও।...

ভয়ে তিতু চোখ খোলে না। মাথার বালিশটা টেনে বুকের পাশে জড়িয়ে ধরে, ভগবানকে ডাকে।

তারপর তিতু ভাবে, মাসি আর বাবা এক ঘরে অত বড় সুন্দর খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বলে ওরা ভয় পায় না। তিতুর পাশে কেউ থাকলে তিতুও ভয় পেত না।

পাঁচ বছর তিতু এই ভাবে একা শুচ্ছে। আগে ঠিক এতটা—এ-ভাবে একা নয়। তাদের ঘর তখন ছোট ছিল, বাবার পাশেই আলাদা খাটে শুয়েছে কিছুদিন। পরে বাবার পাশের ঘরে, একা একা। মেঝেতে বুড়ী ঝি মোহনা শুত।

মা যতদিন বেঁচে ছিল তিতু মার পাশে প্রায়ই শুয়েছে। শেষের দিকে তিতুর সঙ্গে মা পাশের ঘরে তার বিছানাতেই শুত। ছোট বিছানা। গায়ে গা ঘেঁষে শুতে হত। তবু ভাল লাগত তিতুর। কোনো কোনো দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিতু বুঝতে পারত মা পাশে নেই। ঘুম ভেঙে যেত তিতুর। বাবার ঘর থেকে মা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভাল লাগত না। উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত খানিক পরেই। ঘুমের মধ্যে একসময় বুঝতে পারত, মা এসেছে। আরও কুঁকড়ে কাছে গিয়ে মার বুকের মধ্যে মুখমাথা গুঁজে দিত। ভোর হলে চোখ খুলে প্রথমেই দেখত মা পাশে আছে কি না। মা থাকত, ঘুমত। তিতু তখন আদর করত মাকে। গলা জড়িয়ে, গালের পাশে নাক ঘষে, মার গায়ের ওপর চড়ে, চোখের পাতায় ফুঁ দিয়ে। তিতুর তখন মনে হত সে কত বড়, কত বড়—মা কত ছোট; মাকে সে আদর করছে।

ঘুম ভেঙে গেলে মা মিথ্যে মিথ্যে রাগ করে ভুরু

কোঁচকাত, তিতুকে ঠেলে দিত, বলত—বিরক্ত করবি ত ও-ঘরে চলে যা

মা একদিন সত্যি সত্যি চলে গেল। স্বর্গে। কেন ?

বাবা মাকে ভালবাসত না; মা বাবাকে ভালবাসত না। বাবা তিতুকে ভালবাসত না ; ভালবাসে না। তিতুও বাবাকে ভালবাসে না।

বাবা মাসিকে ভালবাসে। বাবা মাসিকে বিয়ে করেছে। মাসি তিতুকে বলেছে, লোকজনের সামনে আমায় মা বলে ডাকবে ; এমনিতে মাসি।

লোকজনের কাছে তিতু মাসির সামনে থাকে না। খুব কম, এক আধ বার। তিতু তবু মুখ ফস্‌কে মাসি বলে ফেলে। মা বলতে পারে না, বলতে চাইলেও বলতে পারে না। বলতে গিয়েও গলার মধ্যে কেমন করে ওঠে। মনে হয় এক গরস ভাত গলার মধ্যে আটকে গেছে। গিলতে পারে না। খুব ব্যথা লাগে, কষ্ট হয়। আর ভয়। কী ভীষণ যে ভয় হয়! গলার মধ্যে কিছু আটকে যাওয়ার ভাবটা সারাদিনই থাকে তারপর। তিতু কিছু খেতে পারে না, জল পর্যন্ত নয় ; মনে হয় ঢোঁক গিললে গলার মধ্যে আটকানো পুঁটলিটা আরও নীচে নেমে যাবে। সোডার বোতলের গুলির মতন আটকে যাবে বুকে। তারপর দমবন্ধ হয়ে তিতু মরবে।

লোকজনের সামনে মাসিকে মা বলে না ডাকলে মাসি তিতুকে মারে। শাস্তি দেয়। আর বাড়িতে বাবার সামনেও যদি ঘাবড়ে গিয়ে কখনও আচমকা মা বলে ফেলে মাসিকে— তা হলেও শাস্তি পেতে হয়।

এ-বাড়িতে উঠে আসার পর এই বিচ্ছিরি বড় ঘর মাসিই তাকে দিয়েছে। হাসপাতালের দিকে কোয়ার্টারে যখন তিতুরা থাকত তখন সেখানকার বাড়ি ছোট ছিল। দু'খানা একটু-বড় ঘর, একখানা ছোট, সামনে খানিক বারান্দা, ছোট মতন বাগান—পিছু দিকে রান্নাঘর, বাথরুম, সব্জি বাগান, কলাঝোপ। তিতু সেই বাড়িতে জন্মকাল থেকে কাটিয়েছে। তিতু একটু দূরে হাসপাতালে জন্মেছিল। তিতু ছোটবেলার সেই বাড়ি ভালবাসত। তার মা সেই বাড়িতেই ছিল। মা সেই বাড়িতে মারা গেছে।

তিতু তাদের পুরনো ছোট বাড়ির কথা এখনও ভাবে। বাবার শোওয়ার ঘরের পাশে তার ঘর ছিল। তিতুদের বাড়িতে কেউ এলে সে-ঘরে বসত। বেতের চেয়ার, গদি। একটা খাট। দেরাজের সঙ্গে আয়না। ক্যালেণ্ডার, যীশু-খৃষ্টের ছবি। ছোট মতন টেবিল।

বাবার ঘর আর তিতুর ঘর ছিল পাশাপাশি। ছোট দরজা। দরজা খোলা থাকত, পরদা ঝুলত। বাবার সঙ্গে মার যখন ঝগড়া রাগারাগি কথা কাটাকাটি হত তিতু শুনতে পেত।

খারাপই লাগত তিতুর। বাবা এমন ভাবে কথা বলত, মনে হত মাকে মারবে, কি মারছে। মা যে-ভাবে কথা বলত, মনে হত এক্ষুনি কী একটা করে বসবে।…ভয় করত তিতুর। বুকের মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করত। চোখ ও-ঘরের দিকে পড়ে থাকত। তবু, তিতু বুঝতে পারে এখন, সেই ঘর সেই ঝগড়া ভাল ছিল। তিতু সব জানতে পারত, বুঝত কোনো কোনোটা।

এই নতুন বাংলোয় তিতু কিছুই জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। বাবা আর মাসির শোওয়ার ঘর অনেক দূরে। একেবারে ও-পাশের শেষেরটা। তিতু আর বাবার ঘরের মধ্যে প্রায় এই রকমই তুটো বড় বড় ঘর পড়েছে। তিতুর ঘরের পাশে ডাইনিংরুম, তারপর ড্রইংরুম—তারপর বাবার ঘর। কত দূর! চেঁচিয়ে ডাকলেও শব্দ যাবে না। মাঝরাতে ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যদি ভয় পায় তিতু, যদি চোর ডাকাত কিছু আসে, আর গলা ফাটিয়ে ডাকে তিতু—তবু বাবা শুনতে পাবে না।

নতুন বাংলোয় এসে বাবা আর তিতু আরও অনেক দূর দূর হয়ে গেছে। আগে মাঝে মাঝে বাবা খুব জোরে হাসত। মজার হাসি। খুশীর হাসি। আমোদের। হাসিটা ভাল লাগত তিতুর। বাবা আজও হয়ত অমন করে কখনও কখনও হাসে। তিতু শুনতে পায় না। তার ঘর অনেকখানি দূরে।

বাবা বলত আগে, মন মেজাজ ভাল থাকলে মার সঙ্গে গল্প করতে করতে: তিতুর মাথায় একগাদা চুল হয়েছে—ভাল করে কাটিয়ে দিয়ো কাল। বাবা বলত, সুষমা তোমার ছেলে বড় রোগা রোগা; ওকে হপ্তায় দিন চারেক করে মাংস খাওয়াও। এই ত শীত পড়েছে, কড্‌লিভার খাওয়াও না। কারখানার মিস্ত্রী মজুরের ছেলে, গায়ে শক্তি না হলে বড় হয়ে করে খেতে হবে না।...বাবা কখনও বা বলত, তিতুকে মিশনারি স্কুলে পাঠাবো, এখানকার স্কুলটা বাজে, বোগাস।

বাবা কি এখনও এ-সব কথা বলে! কে জানে! তিতুর ঘর অনেক দূর; তিতু কিছুই শুনতে পায় না।....সুষমাও মরে গেছে।

মা-র নাম ভালবাসত। মার নাম তার কানে ভাল লাগত। 'সুষমা' শব্দটার মানে জেনে নিয়েছিল তিতু। লাবণ্য, সৌন্দর্য—তার মানে সুন্দর খুব সুন্দর। খুব ভাল মানে। মাকে মানায়।

কেন যে বাবা আর মা তাদের মধ্যে মানাতে পারত না, তিতু আগেও বুঝত না, আজও বোঝেনি। মাঝে মাঝে কখনও কখনও মা আর বাবার বেশ ভাব হয়ে যেত। হওয়া উচিত—তিতু ভাবত। বাবার নাম হেম। হেম মানে সোনা। তার বাবা অবশ্য সোনার মতন দেখতে নয়। খুব কালো, কুচকুচে কালো। কিন্তু কী লম্বা চওড়া শক্ত চেহারা। বাবা নাকি এখানে একবার এক সাহেবকে বক্সিং লড়ে হারিয়ে দিয়েছিল। লোকে বলে। তিতু সে-গল্প শুনে খুব খুশী হত।···মার কাছে তিতু শুনেছে, বাবা একবার এক ঘুঁষি মেরে হাসপাতালের কাচের জানলার দু-সার কাচ ফাটিয়ে দিয়েছিল।

তিতু নিজের চোখে দেখেছে, বাবা একবার মাকে পাঁজা-কোলা করে বুকের কাছে তুলে এমন দোল দিয়েছিল যে মা প্রথমটায় হাত পা ছুঁড়ছিল, ছাড়ো ছাড়ো করছিল, হাসছিল বটে, কিন্তু শেষে মুখ শুকিয়ে আমসি। বমি করে ফেলেছিল পরে।

তবু মা আর বাবার মিল ছিল না। শেষের দিকে, রোজ ঝগড়া, রোজ। মারামারি করত দুজনে। মা কাঁদত, মা যা-তা বলত। বাবা চেঁচাত। মার মুখে পায়ের চটি ছুঁড়ে মেরেছিল একবার বাবা। তিতু দেখেছে। তিতুর মনে আছে আজও।

ভাল লাগত না এ-সব। তবু তিতু মা বাবার মধ্যেই তখন ছিল। আজ বুঝতে পারে, সে এক আপনার জিনিস ছিল। অন্য এক রকম আরামও ছিল তাতে।

এখন তিতু দূরে—অনেক দূরে পড়ে গেছে। বাবার শোওয়ার ঘর থেকে দূরে, বাবার কথা শোনার সুখ থেকে দূরে, বাবার চোখে পড়ার বাইরে।

মাসি এ-সবই করেছে। এ-বাড়িতে যা কিছু হচ্ছে মা মরে যাবার পর সবই মাসি করছে আঙুল নেড়ে নেড়ে।

এই ঘর মাসি তাকে দিয়েছে। হাসপাতালের রাস্তায় সেই ছোট কোয়ার্টারে মা মারা গেল। বাবা মাসিকে বিয়ে করল। বাবা আরও বড় চাকরি পেল। এই নতুন বাংলোয় তাদের চলে আসতে হল তারপরই।

এখানে এসে মাসি তিতুকে একেবারে পাশের এই ঘরটা দিল। লোহার স্প্রিং দেওয়া ওই খাট, টেবিল, ড্রয়ার, চেয়ার —এ-ঘরের সমস্তই এখানে ছিল। আরও ক'টা কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল, হ্যাট-র‍্যাক, কিছু ফুলের টব এখানে পড়ে ছিল। এ-সব কোম্পানীর জিনিস। যে যখন আসে পায়, যখন চলে যায় রেখে দিয়ে যায়।....তিতুরাও পেয়েছ। মাসি তার অর্ধেকই তিতুর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তিতুর জন্যে, তিতুর দরকার বলে কিছু হয় নি—কিছু আসেনি। লোহার খাটটা তাই বেয়াড়া রকম বড়, স্প্রিং ঝুলে গেছে। ড্রয়ার দেওয়া দেরাজটাও তাই উঁচু, পালিশ চটা। আর টেবিল! টেবিল নয়, যেন মাঠ। এত বড়। এক কোণা থেকে আর-এক কোণা পর্যন্ত হাতীর মতন পড়ে আছে। তিতুর মতন দুটো মানুষ মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে পারে।

বইপত্র এটা-ওটা রেখেও তিতু টেবিলটার সিকি ভাগ ভরতে পারে না। ফাঁকা থেকে যায় অতখানি জায়গা। আর উঁচু কি কম! বেশ উঁচু। চেয়ারে বসে তিতু যখন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তখন তিতুর বুকের ওপর গলা ছুঁয়ে যায় টেবিলের কিনারা।

এত প্রকাণ্ড এক টেবিল সামনে নিয়ে গোবদা বেঁটে চেয়ারে বসে তিতু যখন পড়াশোনা করে—তখন তিতুরই মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত লাগে। এই বড় ঘর, আকাশ-উঁচু সিলিং, লম্বা লম্বা দরজা জানলা, খেলার মাঠের মতন এক টেবিল—এ-সমস্তর মধ্যে তিতু হারিয়ে গেছে। তাকে চোখে পড়বে না। যেন এত বড় ঘরের মধ্যে সে একটা ছোট্ট টুলের মতন একপাশে পড়ে আছে।

কী বিচ্ছিরি! তিতুর ভাল লাগে না। পছন্দ হয় না। বেয়াড়া বেমানান লাগে। তাকে জোর করে এই ঘরে পুরে দিয়েছে মাসি।

খুবই অসহায়, একা বোধ করে তিতু। কত সময় তার মনে হয়, সে নেই। কত সময় তার মনে হয়, এই ঘর খাট বিছানা টেবিলের সঙ্গে তার এতটুকুও সম্পর্ক নেই। কিছুই তার নিজের নয়, নিজের মতন নয়।

এই ঘরের সঙ্গে তিতুর ভাব নেই। তিতু ভালবাসে না কোনো জিনিসটাই।·· মাসি তাকে যত খারাপ বিচ্ছিরিগুলো দিয়েছে। আর নিজে ভালো জিনিসগুলো নিয়েছে।

মাসি আর বাবা যে সুন্দর খাটে শোয়—তা নতুন কিনে আনা। মাসিদের ঘরের ড্রেসিংটেবিল আলমারি তাও নতুন। ড্রয়িংরুমের সোফা কোচ, কাচের ছোট্ট বুককেস,

জাপানী ছাতার মতন নকশা করা লম্বা সুন্দর ল্যাম্প—সবই পছন্দ করে কিনে এনেছে মাসি। ডাইনিংরুমের হাতল-হীন চেয়ার, রেফরিজারেটার—মাসি তাও কিনে আনিয়েছে। মাসি সব নিয়ে নিয়েছে। যা ভালো, যা সুন্দর।

মাসি বাবাকেও নিয়ে নিয়েছে।

বাবাকে তিতু ভালবাসে না আর। বাবাও তিতুকে ভালবাসে না। মা যখন বেঁচে ছিল, তিতু বাবাকে তবু ভালবাসত। মা বাবা ঝগড়া করত, তবু তিতু বাবাকে খানিকটা ভালবাসত।

বাবা এখন বড়লোক হয়ে গেছে। মল্লিক সাহেব। হাসপাতালের কাছে থাকার সময় লোকে ডাকত, হেমবাবু। এখন কেউ ডাকতে এলে বলে, মল্লিক সাহেব। বাবা তখন ছিল চার্জম্যান। এখন যেন কি? ফোরম্যান। সব চেয়ে বড় ফোরম্যান। মল্লিক সাহেব।

হস্‌পিটাল রোডের কোয়ার্টারে থাকার সময় তাদের ডাইনিংরুম, রেফরিজারেটার, এত সুন্দর খাট টেবিল সোফা কিছুই ছিল না। বেতের চেয়ার, মার হাতে-তৈরি গদি। আসন পেতে কাঁসার থালায় মা ভাত বেড়ে দিত। চা চাইলে পেয়ালা হাতে করে এগিয়ে দিত। এখন আর তা নয়। ডাইনিংটেবিলে বসে ভাত খেতে হয়, চিনে মাটির প্লেটে। বাবা আর মাসি হাত দিয়ে ভাত মাছ মাংস কিছুই ছোঁয় না। কাঁটা চামচেতে খায়। ট্রে আর চায়ের কেটলি, দুধ চিনির পট্ ছাড়া চা এগিয়ে দেয় না কেউ। জল খেতে চাইলেও—সাদা ডিশের ওপর কাচের গ্লাস ধরে এগিয়ে দিতে হয়।

মাসির এ-সব ব্যাপারে খুব চোখ। একটু যদি ভুলচুক হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধমক। মধুকে। তিতুও যদি ঠিক মতন কিছু করতে না পারে, মাসি মারে, মাসি শাস্তি দেয়। বলে, জংলী অসভ্য, ছোটোলোক কোথাকার!

মা বলত, তিতু সোনা। লক্ষ্মী ছেলে।

বাবাও তখন বলত প্রায়, তিতুটার খুব বুদ্ধিশুদ্ধি হবে। ধারালো ছেলে।

বাবা এখন বলে, হোপ্‌লেস্‌···রট্‌ন্‌। গাধা একটা।

তিতুর কান্না পায়। তিতু কাঁদে। তার ঘরে বসে।

দুই.

আজ সকাল থেকেই গরম বোঝা যাচ্ছিল। অন্যদিনের চেয়ে বেশী। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। বেলা বাড়বার আগেই বাতাস তেতে উঠল। লুয়ের মতন গরম হাওয়ার ঝাপটা বয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

তিতুদের বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাইরের রোদ তেতে ওঠার আগেই। পরদা কোনোটাই এলোমেলো করে না রেখে পুরোপুরি টানা, রোদের ঝলসানো আলোটুকুও যাতে ঘরে না ঢোকে। তাত না আসতে পারে।

ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া ভাব থাকলেও গরমকে তাড়ানো যায় নি। দুপুর থেকে এই ঘরও মনে হচ্ছিল গরম। সকাল থেকে না-থামা পাখা ঘরের বাতাসকে শুক্‌নো, আগুন করে তুলেছে। কেমন এক ধরনের গন্ধও ভরে উঠেছে ঘরে। গন্ধটা

ভাল না। তিতুর ভাল লাগছিল না। কষ্টই হচ্ছিল। চোখ জ্বালা করছিল। হাতের তালু, গাল, গলা খসখস করছিল।

একবার কি ভেবে তিতু ফ্যানটা আরও জোর করে দিয়েছিল। যতটা জোর করা সম্ভব। উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডে ঝোলানো ভারি বড় পাখাটা ভীষণ ত্বলতে লাগল। পাখার মাথাটা কাঁপতে শুরু করল থর থর করে। একটু পরে যেন পাখার চাপা রাগ ফেটে পড়ল। বিশ্রী একটা আওয়াজ শুরু করল। তিতু একটুক্ষণ সেই পাখার থর থর কাঁপুনি, সাদা মোটা বিরাট মুণ্ডুটার খেপাটে রোখ, ব্লেডের সোঁ সোঁ পাক খাওয়া আর তিতুর চেয়ে দেড়গুণ লম্বা লোহার রডের দোলন দেখল। তার ভয়ই হচ্ছিল। অত বড় ভারি পাখাটা যদি মাথার ওপর থেকে ছিটকে পড়ে সব সমেত—?

ভয় পেয়ে তিতু পাখা আবার কমিয়ে দিল। শব্দ আর কাঁপুনি বন্ধ হল। স্বস্তি পেল তিতু।

তুপুরটা কি আর শেষ হবে না? ক'টা বাজল? তিতুর ঘরে দেরাজের মাথায় একটা ঘড়ি আছে। জাজ ঘড়ি। তিতু তাকে চালিয়ে রেখেছে। দম দিয়ে দিয়ে। কাঁটার দাগগুলো আধমোছা। এই ঘড়িটা পুরনো বাড়িতে ছিল। তিতুদের ঘরে।

ঘড়িটা তার খেয়াল মতন চলে। তিতু ছাড়া আর কারুর পক্ষে ওই ঘড়ির সময় বুঝে নেওয়া সম্ভব নয়। কারুর অবশ্য সে-গরজ নেই। তবু তিতুর এক অদ্ভুত রকম আনন্দ আছে এই ঘড়ির সময় বোঝা নিয়ে। তিতুর ধারণা, পুরনো বাড়ির ঘড়িটাই শুধু তার দখলে এসেছে। বশ মেনেছে। ভাব রেখেছে।

ঘড়ি দেখল তিতু। তিনটে বাজে। কাঁটা পাঁচের ঘর ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু তিতু বুঝতে পারল তিনটেই হবে।

সেই ছায়াছায়া ঘরে, গরম বাতাসের ছেঁকা খেতে খেতে তিতু জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। জানলাটা উঁচু। তিতুর মাথায় মাথায় জানলার ধার ছুঁয়ে যায়। তাও নীচের অর্ধেকটা পরদা ঢাকা। উঁচু হয়ে তাকালে ওপরের কাচ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। বাইরে নীচু ছাদের টানা ঢাকা বারান্দা।

আলোর আভা দেখে তিতু বুঝল, বাইরে রোদটা কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। ঠিক আগের মতন ঘরে রোদ আর ঝাঁঝ যেন নেই।

পড়ার টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে এনে তিতু এবার উঠে দাঁড়াল। জানলার পরদা সরিয়ে দিল।

এখানে মাঝে মাঝে এমনি হয়। কারখানার চিমনি দিয়ে যখন গলগল করে কালো জমাট ধোঁয়া উঠে বাতাসে ছড়িয়ে যায়, তখন সেই ধোঁয়া কখনও কখনও সূর্যের মুখ আড়াল করে ফেলে। রোদটা ঘোলাটে হয়ে যায়—মেঘলা মেঘলা ভাব আসে।

হয়ত তাই; কারখানার ধোঁয়া এদিকে ভেসে আসছে। বাবা এখন কারখানায়। মাসি নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে তার ঘরে। মাসির ঘরের জানলায় দরজায় বাইরে থেকে খসের পরদা ঝুলোনো হয়েছে ক'দিন হল। মালি তাতে পিচকিরি দিয়ে জল দেয়। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডা কি না সত্যি তা বলে তিতু দেখতে যায়নি। মাসিদের ঘরে তিতুর যাওয়া বন্ধ। না ডাকলে কিংবা খুব দরকার না

পড়লে তিতু সে-ঘরে যাবে না—মাসি বলে দিয়েছে। দরকার পড়লেও সরাসরি যেতে পারবে না। ড্রয়িংরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাসির ঘরের দরজার কাছ থেকে ডাকতে হবে। যদি ভেতর থেকে মাসি আসতে বলে—তবেই যেতে পারবে।

খসের পরদা আসার পর থেকে তিতু ও-ঘরে যায় নি। কোনো দরকার পড়েনি তার। তবে তিতু জানে, ভিজে খসের পরদায় ঘর ঠাণ্ডা হয়। তিতু বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিজে খসের গন্ধ শুঁকেছে। খুব সুন্দর। খু-উব—।

জানলার শার্সি খুলে ফেলল তিতু। গরম এক ঝলক বাতাস এল। ঘরের দম-বন্ধ বাতাসের চেয়ে এই টাটকা হাওয়া তিতুর ভাল লাগল। বাইরে কটকটে রোদ আর একটুও নেই। ধোঁয়ার মতন একরকম রঙ হয়ে এসেছে। বাগান আর ঘাস আর উঁচু মাঠের মতন জায়গা—সমস্তটার উপরই ছায়া পড়েছে। ঘুঘু ডাকছে। একটানা। বাগানের ঘাসে শালিক উড়ে উড়ে বসছে। বারান্দার কোথায় যেন ক'টা চড়ুই ফরফর করে উড়ছে। ক'টা কাকও সমানে ডেকে চলেছে নিম গাছে কিংবা শিশু গাছে বসে।

তিতু বাংলোর এই পিছন দিকের বাগানের যতখানি দেখতে পেল তাতে তার মনে হল, বাইরে কেমন একটা গুমোট ভাব হয়ে এসেছে। এখান থেকে আকাশ ভাল করে দেখা যায় না। চওড়া বারান্দার ছাদে চোখ আড়াল পড়ে। উঁচু মাঠের মাথার ওপর থেকে টাল খেয়ে যাওয়া আকাশ অবশ্য দেখা যায়, এখান থেকেই। কিন্তু তাও স্পষ্ট নয়। উঁচু মাঠের ওপর একরাশ গাছ; শিশু নিম হরিতকী জাম। উত্তরের দিকে একটা কাঠচাঁপাও গা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এত গাছের সারি আর পাতার ফাঁক থেকে পুরোপুরি আকাশ দেখা যায় না। আধখাপচা চোখে পড়ে।

তিতু ভাল করে আকাশ দেখতে পেল না। মনে হল, আকাশের তলায় জমাট ধোঁয়ার আড়াল পড়েছে খুব। না, কারখানার চিমনির মুখের ধোঁয়া নয়। তিতু বুঝতে পারল। সে-ধোঁয়া উড়ে যায়। এতক্ষণ থাকে না।

মেঘলা হচ্ছে বাইরে। বুঝতে পারল তিতু।

ঘরের মধ্যে তাকাল। দেওয়ালের গায়ে ছায়া আরও জমাট হয়েছে; কোণে কোণে অন্ধকার জড়িয়ে গেছে। মেঝের ওপর আর একফোঁটাও আলো আলো ভাব নেই।

তিতুর মনে হল, বাইরে থেকে আর বাতাস আসছে না। গরম জ্বালা জ্বালা শুকনো ভাবটা আছে। আর কিছু না।

জল তেষ্টা পাচ্ছিল তিতুর। অনেকক্ষণ থেকেই জিবের আর গলার মধ্যে তেষ্টার ইচ্ছেটা জমছিল। এবার বেশ শুকনো লাগছে। ভিজে ঠোঁট দিয়ে জিব ভিজিয়ে তিতু মনে মনে একটু হাসল। কেন কে জানে!

চেয়ার থেকে নেমে পড়ল তিতু। একবার ভাবল, ঠাণ্ডা জল খাবে না এমনি জল। ঠাণ্ডা জল খেতে হলে রেফরিজা-রেটার খুলতে হবে। (রেফরি....তিতুর খেয়াল হল, মজা লাগল। মাসি বলে রিফরি...'রে' নয় 'রি'....বাবা বলেছে, রি বলবে....বার বার ফ্রিজ্‌ করার এই মেশিন...রি—রি। তিতু বলে না। 'রে'-টা তার ভাল লাগে।) খোলা কিছু না। কিন্তু বন্ধ করা মুশকিল। তিতু কিছুতেই প্রথমবারে ভাল করে বন্ধ করতে পারে না। মনে হয় বন্ধ

হয়েছে। অথচ বন্ধ হয় না। চেপে থাকে। রেফরি-জারেটারের ডালাটা বড় ভারি; তিতুর গায়ে অত জোর নেই। বেশ কষ্টই হয় তিতুর। তবু, তিতু মাঝে মাঝে খোলে, ঠাণ্ডা জল খাবার লোভে। রেফরিজারেটারের মধ্যে ছিপি আঁটা জলের বোতল রেখে দেয় মধু। বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে সেই জল। বোতলের গায় বিন্দু বিন্দু জল জমে যায়। শিশিরের মতন, ভিজে কুয়াশা যেন।

ঠাণ্ডা জল খেলে তিতুর গলায় ব্যথা হয়ে যায়। বোতলের জলের সঙ্গে খানিকটা কলের জল মিশিয়ে নিলে আর কিছু হয় না।

তিতু ডাইনিংরুমে গিয়ে রেফরিজারেটারের কাছে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তার লোভ যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল তিতু। না, ঠাণ্ডা জল নয়, তিতুর লোভ ডালা-খোলা রেফরিজারেটার। ভেতরের সেই আলো-জ্বলা থাক-কাটা সুন্দর চেহারা। তিতুর খুব ভাল লাগে। অদ্ভুত আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটছে ভেতরে, বাইরে থেকে কে বুঝবে। সাদা দুধের মতন মোটা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ভেতরটা যেন কী—, কী যেন! তিতু বোঝে না; তবু ভাল লাগে।

মুশকিল এই, রেফরিজারেটারের ডালা খুলে সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিতু পারে না। কনকনে একটা হাওয়া বাইরে এসে বুকে মুখে ধাক্কা মারে। তিতুর বুকের মধ্যে কেমন করে যেন।

ডালা খুলে তিতু ছোট মতন বোতল বের করে নিল। মাসি কিছু সব্জি রেখে দিয়েছে, মাখনের টিন, সন্দেশের প্লেট।

ছোট মিটপ্যানে করে মুরগির কাঁচা মাংস খানিকটা। ওটা কি? আইসক্রীম তৈরী করছে নাকি মাসি?

তিতুর চোখ এক পলক এদিক ওদিক হয়ে আলোর দিকে পড়ল। আলোটা যে কোথায় জ্বলে তিতু বুঝতে পারে না। কোথাও নিশ্চয়। মাথার দিকে হতে পারে। পাশেও হতে পারে।

মানুষের শরীরের ভেতরটা নাকি ভাল না। হাড় মাংস নাড়ি-ভুঁড়ি ফুসফুস……। তিতুর মনে পড়ল স্বাস্থ্যবইয়ের কথা। মনে পড়ল ক্লাসে হাইজিন টিচার জিতেনবাবুর কথা। জিতেনবাবু ক্লাসে মস্ত বড় এক ছবি নিয়ে এসে সে-দিনও পড়িয়েছেন। ম্যাপের মতন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ছবিটা। সেটা মানুষ না। মানুষ নয়। মানুষের হাড় আর ফুসফুস, যকৃত, রক্তবাহী ধমনীর ছবি। তিতুর ভাল লাগে নি।

তিতুর শরীরের 'ভেতরটা কি ওই রকম? তিতু মাথা নাড়ল। ভাবতে ভাল লাগল না। রেফরিজারেটারের মতন মানুষের শরীরের ভেতরটা কেন সুন্দর হয় না! কেন অমন সুন্দর বাতি জ্বলে না!

জ্বলে। সকলের নয়। মার মধ্যে জ্বলত। সব সময়। রেফরিজারেটারের বাতি সব সময় জ্বলে না! ডালা বন্ধ করলেই নিভে যায়। তিতুর বিশ্বাস মার শরীরের মধ্যে ওই রকম সুন্দর বাতি সব সময় জ্বলত। তিতু চোখ বন্ধ করে মার কথা ভাবলে অনায়াসেই তা বুঝতে পারে। বাবার জ্বলে না, মাসিরও না।

তিতুর মুখ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। রেফরিজারেটারের ডালা বন্ধ করে দিল তিতু। বার কয় চেষ্টার পর।

ডাইনিংরুমের পাশেই ছোট্ট প্যানট্রি। প্যানট্রির কল খুলে গ্লাসে জল ভরল তিতু। বোতলের ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে নিল। পুরো গ্লাস করল। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। জলের বোতলটা হাতে করে তিতু নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরে পা দিয়ে তিতু অবাক। হঠাৎ যেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ে ঘন কালো ছায়া। কোণে কোণে জমাট অন্ধকার। সিলিংয়ের মাথার তলায় কালো বাতাস যেন থমথম করছে। টেবিল খাট দেরাজ আলনা সব কেমন আবছা অস্পষ্ট। মেঝের ওপর ভরাট সন্ধ্যের মতন কালচে ভাব।

চোখের পলকে পলকে এই অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও ঘন হয়ে আসছিল। তিতু জানলার পাশে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল।

বাইরেটা থম থম করছে। হু হু করে অন্ধকার আসছে। বাগানে গাছগুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। পাখিরা ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। কাক ডাকছে। ওরা কি ভয় পেয়েছে?...তিতু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই—বুঝতে পারছে সব। বাতাস বন্ধ। আকাশে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। ডেকে ডেকে মিলিয়ে গেল। শব্দটা বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

বাগানে মালি আর মালির মেয়ে বিন্দুকে দেখতে পেল তিতু। মালি গাছের ছায়ায় বেঁধে-রাখা গরুটাকে উঁচু মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুর ঘরে। বাছুরটা মাঠময় ছুটছে। বিন্দু তার কাপড় শুকোতে দিয়েছিল মাঠে। কাপড় তুলে নিচ্ছে। বিন্দুর দিশী কুকুরটা আকাশের দিকে মুখ করে ঘেউ ঘেউ করছে।

দেখতে দেখতে বাইরেটা আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠল। কালো, কঠিন, ভয়ংকর ; থমথমে। শেষ কাকটাও ভয়-পাওয়া ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল নীচু দিয়ে। ডালিম গাছের পাতার ওপর সাপের খোলসের মতন কী যেন ফেলে দিয়ে গেছে। গাছটা কাছে—খুব কাছে। তিতু অবাক হয়ে ডালিম পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু জোরে হাওয়া দিলেই সাপের খোলসটা পড়ে যায়। কিন্তু হাওয়া বন্ধ ; ঠাস। ডালগুলো নড়ছে না, পাতা কাঁপছে না একটুও।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। কারখানার চিমনি দিয়ে কাঁচা কয়লার ভূত-কালো গলগলে ধোঁয়া বেরুলে যেমন দেখায়—আকাশটা তেমনিই দেখাচ্ছিল। আকাশের তলায় ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। তারও তলায় বাতাস যেন ময়লা ছাই-রঙে ভরা। সব শব্দ থেমে গেছে। পাখির ডাক নেই, কুকুরটা পালিয়েছে। মালি গরুর ঘর বন্ধ করে উঁচু মাঠ থেকে নেমে আসছে। বিন্দু চলে গেছে।

আকাশ থেকে আগুনের একটা আভা লহমার জন্যে মাঠ আর গাছের ওপর দিয়ে চমকে গেল। চোখ বুজে ফেলল তিতু। মাথার ওপর সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক এক শব্দ। আকাশ ভেঙে মেঘ ডেকে উঠল। তিতুর ঘর কেঁপে উঠেছে। দূরে আরও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সমস্ত আকাশ ভরে মেঘের ডাক গুড়গুড় ভাসছে।

তিতুর চোখ আচমকা কোথায় যেন আটকে গেল। পাতা নড়ছে না। বাইরে সেই অদ্ভুত গুমোট, ভীষণ থমথমে ভাবটা আরও কঠিন, ভয়ংকর, অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিতু

অনুভব করতে পারল, নিশ্বাস টানার মতন বাতাস যেন পাচ্ছে না। সমস্ত বাইরেটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জানলার দিকে। তিতুর গলা ঠিপে ধরবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না, বাগানের ঘাস শক্ত হয়ে উঠেছে। তিতু ফাঁকার মধ্যে তাকিয়ে আছে—কিছু দেখছে না আর, দেখতে পাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক পাথর। হাত পা নড়াবার মতন ইচ্ছেটুকুও কে যেন কেড়ে নিয়েছে।

সমস্ত মুখ কাগজের মতন শাদা হয়ে গেছে তিতুর। ভয়ে চোখের গর্তে মণি দুটো নিভে গেছে। তিতুর নিশ্বাস বন্ধ। গলা আটকে আসছে। এবার তিতু মরবে।

আর একটু হলেই তিতু দম বন্ধ হয়ে মরত। নিশ্চয় মারা পড়ত। কিন্তু অমন দুঃসহ ভয়ংকর নির্মম মৃত্যু-আবহাওয়া দু'পলকের বেশি থাকল না। তিতুর মনে হচ্ছিল—কতক্ষণ—কত সময়ের যেন! অথচ সেই নিষ্ঠুর জড়তা মুহূর্তের।

হঠাৎ হাওয়া এল এক দমক। কে যেন বিরাট মুঠো খুলে হাওয়াটাকে ছুঁড়ে মারল ডালিম গাছের ডালে। ফুরোতে না ফুরোতে আবার। এবার আরও জোরে। তারপর এক পাল আগলহীন বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডালিম গাছের ডালপাতা থেকে সাপের খোলসটা পড়তে না পড়তেই আর-এক ফুঁয়ে উড়ে গেল।

তিতু নিশ্বাস নিল। অল্প করে। এমনি ছোট ছোট শ্বাস বার দুই। তারপরে বুক ভরে নিশ্বাস টানল।

বাইরে ঝড় এসে গেছে। অসাড় থমথমে গাছগুলো আচমকা বাতাসের দাপটে ছটফট করে উঠল। চেষ্টা করল

শান্ত থাকতে। পারল না। ডালপালা থরথর করে কাঁপল। তারপর অশান্ত, অস্থির হয়ে উঠল।

ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সোঁ সোঁ শব্দ। বাগানের ছোট ছোট ফুলের গাছ বিহ্বল। করবীর ঝোপে ডালপাতা মাটিতে নুয়ে পড়ছে। ডালিম গাছ দিশেহারা। নিম জাম শিশু গাছের মাথাগুলো দিক পাচ্ছে না, হেলে দুলে বেঁকে নুয়ে ছটফট করছে। গাছের পাতায় শব্দ উঠছে, কাতরানির শব্দ। কাঠচাঁপার একটা ডাল ভেঙে পড়ল। শুকনো পাতা উড়ে গেল। খড়কুটো ধুলো বালি উড়ছে। মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকে গেল আবার।

তিতুর স্বস্তি ফিরে এসেছে। আবার সে স্বাভাবিক। একটু আগে মরতে বসেছিল, এখন বাঁচার সুখ পাচ্ছে।

ঝড় বাড়ল, ভয়ংকর হল। তিতুর আর ভয় নেই। ধুলো বালি আসছিল বলে—কাচের জানলা বন্ধ করে দিল। এবার ঝড়ের দমকায় ধুলোয় বালিতে বাগানটা ঘোলাটে হয়ে এসেছে। নদীর রাস্তার যত লাল ধুলো উড়ে আসছে। আর যত কয়লার গুঁড়ো।

জানলা বন্ধ করবার আগে তিতু এক মুঠো ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছিল গালে।

একটি জানলাই খুলেছিল তিতু। বন্ধ করে দিয়ে, কাচের গায় কপাল ঠোঁট নাক টিপে ধরে বাইরের ঝড় দেখতে লাগল।

কোনো কোনো বিশেষ সময় আছে তিতুর কাছে যা অসহ্য। এই ঝড় ভাল। কিন্তু ঝড়ের আগে যা হয়েছিল—তা ভীষণ। তিতু ভয় পেয়েছিল। খুব ভয়।

বরাবরই এই রকম হয় তিতুর সাংঘাতিক কিছু হবে,

হতে যাচ্ছে দেখলেই তিতুর ভয়। থমথমে গুমোট কঠিন আবহাওয়া তার কাছে অসহ্য। বাইরে এবং বাড়িতেও।...

......বাবা আর মা যখন কথাকাটি করে ঝগড়া করত, বাবা মারতে উঠত মাকে, মা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খারাপ কিছু একটা করে বসত—তখন তিতুর ভাল লাগত না, কষ্ট হত, রাগ হত, ভয়ও হত—তবে সে ভয় অতটা নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি ভয় হত—মা আর বাবার ঝগড়ার আগে যখন চুপ করে থাকত দু-জনেই। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলত না, কেউ কারুর দিকে তাকাত না; শক্ত রুক্ষ ঝাঁঝালো মুখে মা গুম হয়ে থাকত, বাবাও চুপ—; কর্কশ গলায় দু একটা হুকুম করত দরকার পড়লে, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব করত যেন সে-বাড়িতে মা নেই। সমস্ত বাড়িটা থমথম করত, আবহাওয়া গুমোট হয়ে উঠত। বাবার ঘরে মা শুত না। বাবা মদ খেত।......তিতু দেখত, বুঝত, ভাবত আর ভয়ে ভয়ে থাকত।...তারপর আচমকা এক সময় সব গুমোট কেটে গিয়ে বাড়িটা যেন নানারকম শব্দে চিৎকারে ভেঙে পড়ত। বাবা যে কি বলত আর কি না বলত, মার গলায় কান্না জড়িয়ে থাকত, বাবা গ্লাস কাপ ভাঙত, মা বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, বাবা মার হাত মুচড়ে দিত, ঠেলে দিত জোরে—মা ছিটকে পড়ত। কখনওবা মাকে টপ্ করে কোলে তুলে বাবা নিজের ঘরে চলে যেত। দরজা বন্ধ করে দিত। তিতু আর কিছুই দেখতে পেত না। মার কান্না অনেকক্ষণ অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেত। তারপর চুপচাপ। আর শব্দ আসত না বাবার ঘর থেকে। রাত বাড়ত। হঠাৎ মা দরজা খুলে বেরিয়ে আসত। তিতুর ঘরে আলো

নিভিয়ে দিত। দেখত তিতু ঘুমিয়েছে কি না। তিতু ঘুমের ভান করে থাকত। মা আলনার কাছে সরে গিয়ে কাপড় ছাড়ত। তারপর আবার চলে যেত বাবার ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে যেত। তিতু জানত, সকালে চোখ খুললেই দেখতে পাবে—মা তার পাশে শুয়ে রয়েছে। আর মা-বাবার ঝগড়াঝাটির পর—ক'টা দিন তাদের খুব ভাল কাটত। মাকে বেশ হাসিখুশী লাগত। বাবাও যেন হাসি ঠাট্টা করত। তিতুর সঙ্গে কথা বলত। গল্পও করত টুকটাক। যতদিন না আর একটা ঝগড়া বেঁধে উঠত ততদিন বাড়িটা বেশ লাগত।

একবারই শুধু এই ঝগড়া থামল না। গুমোট ভাব দিনের পর দিন ফেনিয়ে উঠল। মা সেবার লোহার মতন শক্ত। কথা একেবারেই বলত না। কী যে ভাবত! চোখের তারায় যেন সব সময় আঁচ টকটক করত। বাবা সেবারে চুপচাপ। মাথা তুলত না, ঘরে বেশিক্ষণ থকত না, কথা বলত না কারুর সঙ্গে। তিতুর মনে হত বাবা যেন ভয়ে ভয়ে আছে।

পাঁচ না ছয় না সাত দিন—তিতুর মনে নেই, তবে বেশ ক'দিন ধরে বাড়ির থমথমে ভাবটা আস্তে আস্তে ভীষণ হয়ে উঠল। তিতুর মনে হত, বাড়িটার যেন জ্বর হয়েছে। সেই জ্বর বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত বেঘোর বেহুঁশ জ্বর।

সেই বেহুঁশ অবস্থার মধ্যে মা একদিন বাবাকে কী যেন একটা কথা বলল।

সে-দিনের কথা তিতুর মনে জট পাকিয়ে গেছে। মনে পড়ে না। অথচ পড়ে (...তিতুর ঘর অন্ধকার। বেশ রাতও হয়েছিল। তিতু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে

গিয়েছিল কেন যেন। পাশে মা নেই। বাবার ঘরে ছোট বাতিটা জ্বলছে। দরজা খোলা। পরদা ঝুলছে। তিতু মার গলা শুনতে পেল স্পষ্ট। মা বেশ জোরে আর স্পষ্ট করেই কথা বলছিল। 'তুমি আমার আরও সর্বনাশ করবে, তা হবে না।'

'তুমিইবা আমার কি কমটা করেছ?' বাবার ভারি কঠিন রুক্ষ গলা।

'করাই উচিত ছিল।' মা থামল একটু। তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলছে এমনভাবে বলল, 'তোমার মতন লোকদের জব্দ করতে হলে তাই করা উচিত।....আমি যেমন জ্বলে পুড়ে মরছি, তুমিও তেমনি মরতে।'

'থাম থাম; থিয়েটার করো না।' বাবা ধমকে উঠল। অধৈর্য অস্থির গলা। তিতু চোখ বুজে বাবার চেহারা দেখতে পাচ্ছিল মনে মনে। সামান্য যেন শব্দ হল। বাবা হয়ত খাট থেকে উঠে মার হাত চেপে ধরেছে। তিতু বালিশ থেকে মাথা তুলে ঘাড় পিঠ উঁচু করল খানিক। দরজার গায়ে সামান্য আলো। ও-ঘরের। কোন রকম ছায়া দেখতে পেল না তিতু। 'থিয়েটার তুমিই করেছিলে।' মার গলা ছুরির মতন ধারালো লাগছিল, 'জোচ্চোর,...পশু!'

বাবা এবার মাকে সত্যিই ধরে ফেলেছে। পরদার গায়ে আলো যেন আরও কমে এল। ও-ঘরে একটা ঝটপট শব্দ হচ্ছে। বাবা কি মাকে মারছে? তিতু সোজা হয়ে উঠে বসল।

'তুমি নিজে কি? জোচ্চোরের অধম'—বাবা যেন মাকে দু'হাতের মধ্যে টিপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল চিৎকার করে, 'নার্স না আর কিছু! ওই পোশাক চাপিয়ে

কি করতে ভেতরে ভেতরে সব আমার জানা আছে। মাগি কুকুর কোথাকার—!'

মা বাবার গায়ে কামড়ে দিয়েছে। বাবা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। বাবা মাকে এবার চড়চাপড় লাথি মারছে। তিতু বুঝতে পারল, তিতু সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বাবা বলছে, 'বিয়ে করবার বেলায় আমি, আর ছেলে···ওই ধবধবে ফরসা রোগা মতন ছেলেটা তোমার পেটে···'

তিতু আর শুনতে পেল না। মা যেন বাবার বুকের ওপর ঝাঁপ খেয়ে পায়ে পা জড়িয়ে ছিটকে পড়ল। ভারি একটা শব্দ। ছোট টেবিলের কোথায় লেগে সব উলটে পড়েছে। বাতি ভেঙে গেছে। নিভে গেছে। ও-ঘর অন্ধকার।

তিতু ভয়ে কেঁদে উঠল। জোরে। ভীষণ জোরে। মা অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। 'জানোয়ার কোথাকার—ছোটলোক। মাতাল। শয়তান।' মা গলার আর শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করছিল, 'আমি ধরিয়ে দেব তোমায়। পুলিসে তোমাদের ধরুক। দেখ আমি কি করি—মরবার আগে আমি এই নোঙরামি···'

তিতু কাঁদছিল। মা এ-ঘরে এসে পড়ল। বাতি জ্বালল না। মা হাঁপাচ্ছে। কী গরম গা! থর থর করে কাঁপছে। যেন অনেক জ্বর মার। অনেক জ্বর।

তিতুকে বুকে জড়িয়ে বিছানায় বসে থাকল খানিক মা। তিতুকে ভীষণ জোরে চেপে রেখেছিল। মার গরম নিশ্বাস তিতুর গালে লাগছিল। মার চুল তিতুর গলায় খস খস করছিল। তিতুর বুক মার বুকের ধক্ ধক্ শব্দ পাচ্ছিল।

মার চোখের জল তিতুর গালে কপালে লাগল।

ঠোঁটে জিবে ঠেকল। গরম, নোনা। তিতু মার অসহ্য কষ্ট আরও যেন বেশি করে বুঝতে পারল। তিতুও কাঁদল।··· তারপর মার পাশে বুকের তলায় মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল কখন।

ভোরে বাবার বিশ্রী চিৎকারে তিতু চোখ খুলে দেখে মা পাশে নেই। মা ঘরে নেই, মা বারান্দায় নেই। মা রান্নাঘরের পাশে পিয়ারা গাছের ডালে ঝুলছে। গলায় দড়ি বেঁধে। সকালের আলো আর বাতাস এসেছে। কারখানার ভোঁ বাজছে। পেয়ারাতলায় থোকা থোকা দোপাটি ফুটেছে। পাশের বাড়ির দু-এক জনের মুখ উঁকি দিচ্ছে। আর বাবা তিতুর দিকের চেয়ে হাত নেড়ে বলছে ঘরে চলে যেতে।···)

এত কথা তিতুর সত্যিই মনে নেই। সেই রাত—সেই বাবা-মার ঝগড়া তিতু তখন শুনেছিল, তার কানে গিয়েছিল। তিতু বোঝে নি। দু চারটে টুকরো কথা কি শব্দ মনে আছে। ভুলেও গেছে কতক। তবু সেদিন ছ' বছরের তিতু তার অনুভূতির কোনো আশ্চর্য গুণে এবং তীব্রতায় তার বোধের বাইরেও অনেক কিছু যেন বুঝেছিল। মার যে খু-উব কষ্ট ছিল, তিতু আজকাল সেটুকুই বুঝতে পারে।

তিতুর খেয়াল হল—বাইরে আর উদাম ঝড় বইছে না ; বৃষ্টি নামল। টপ্ টপ্ করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। জাম পড়ার মত অনেকটা যেন। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আছে। জলের ঝাপটা এল আবার। গাছে লতা-পাতায় ঘাসে যেন আছড়ে পড়েই আবার আর এক দমকায় মাটি থেকে পিছলে ওপরে উঠে গেল। নিম গাছের পাতার ফাঁক

দিয়ে হঠাৎ সাদা বৃষ্টিকে হাওয়ার মতন ছুটে আসতে দেখল তিতু। পলকে জলের ফোঁটা বারান্দায় উঠে এল।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। সাদা হয়ে গেল মাঠ। জলের ঘন চাদর দুলছে বাতাসে। নিমের ঝাঁকড়া মাথা জলে ভিজে দুলতে লাগল। ডালিম গাছ ভিজে থৈ থৈ। মেঘ ডাকছে। বাতাসের দমকা আসছে।

জানলা খুলে ফেলল তিতু। ঠাণ্ডা বাতাস—মাটির সোঁদা গন্ধ, ঘাসের ভিজে ভিজে হাত মাঠ থেকে চুপ করে জানালার কাছে উঠে এল।

আর তিতু কিছু বোঝবার আগেই টুপ টাপ ফট ফট শব্দ। বারান্দায় এসে ছিটকে পড়ছে, মাঠে বাগানে। কেউ যেন ওপর থেকে সাদা বাতাসা ছুঁড়ছে। বৃষ্টিটা ভীষণ জোর, হাওয়াও খুব। শিল পড়ছে। শিল। তিতু বুঝতে পারল শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

মাঠ সাদা, ঘাস সাদা। বারান্দার ওপর শিলগুলো গলে গলে জল হয়ে যাচ্ছে। বিন্দু মাঠে নেমে এসেছে। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। ছুটোছুটি করছে বিন্দু, শিল কোড়াচ্ছে, মুখে পুরছে, বাটিতে রাখছে। বিন্দুর মাথায় গায় হাতের পাশ দিয়ে পায়ের গোড়ালিতে শেষ ঝাঁক শিল পড়ে থেমে গেল। ক্বচিৎ আর একটা দুটো। ঝর ঝর করে বৃষ্টিই পড়ছে শুধু। শিশু জাম কাঠচাঁপা ভিজছে। বাতাস মাঝে মাঝে আলুথালু হয়ে বয়ে যাচ্ছে। বিন্দু ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

তিতুর চোখের সামনে বৃষ্টির জলে সব শিল গলে গেল। বারান্দার সিমেণ্টে জলের বড় বড় ফোঁটা হয়ে থাকল। তিতু তবু উঠতে পারল না। দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যেতে

সাহস হল না। বাইরের বৃষ্টি, গাছ, মাটি, ঘাস, পাতা তিতুকে কী ভীষণ যে টানছিল! তবু তিতু জানলার পাশে চেয়ারে বসে থাকল, উদাস ম্লান ক্ষুব্ধ মন নিয়ে। অদ্ভুত এক কান্নার ব্যথা বুকে করে!

তিতু মনে মনে দেখতে পাচ্ছিল—মাসি—মাসিকে। মাসি তার ঘরের দরজা বা জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাসি ঠাণ্ডা বাতাস খাচ্ছে।

সব শিল যখন গলে বৃষ্টির জলে মিশে গেছে, বিন্দু তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে—তখন চোখাচোখি হল। বিন্দু হাসল। মুখ নেড়ে কি বলল। ডাকল হাতছানি দিয়ে।

তিতুর যে কি হল, জানলার কাছ থেকে টপ্ করে নেমে পড়ল। দরজা খুলল। ভিজে বাতাস ঢুকল হু হু করে। তিতু এক পলক দাঁড়াল। ঘরের চারপাশে চাইল, উত্তরের দরজার দিকে। এক পা এগিয়ে বারান্দার এ-পাশ ও-পাশ দেখল। কেউ নেই, কেউ না।

ভিজে বারান্দা দিয়ে তিতু দক্ষিণের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। পাতাবাহারের ফুলের টব টপকে বারান্দার ধারে। তারপর এক লাফ দিয়ে মাটিতে। ঘাসে।

বিন্দুর ঘর সামনে। কুলগাছের তলায়। গ্যারেজের পাশে।

বৃষ্টির ছাটে ভিজতে ভিজতে তিতু ছুটল।

তিন.

রাত হয়েছে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমে আছে এখনও। সারারাতই থাকবে হয়ত। বৃষ্টি নেই।

ঝিরঝিরে এক পশলা আবার হয়েছিল, খানিকটা আগে; এখন থেমে গেছে। ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া; লতাপাতার গন্ধ মেশানো। বাগানের ঘাস জলে সপ্‌সপ্‌, কাঁকরের দু'হাত চওড়া রাস্তা নরম ঠাণ্ডা। কাদা কাদা।

বাগানের করবীর ঝোপ, উঁচু মাঠের গাছপালা কিছুই আর দেখা যায় না; ঘন-বুনোট অন্ধকারের মধ্যে আরও একটু ঘনত্বের আভাস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝিঁ ঝিঁ রব। ব্যাঙ ডাকছে। ক'টা জোনাকি উড়ে এসেছে বারান্দায়।

বারান্দা অন্ধকার। তিতু পিঠ-হেলানো চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। বারান্দার সিঁড়ির কাছে বাইরের বাতিটা জ্বলছে। সারারাত ধরে জ্বলবে। সামান্য একটু আলো সামনেটায়। ভিজে ঘাসের সবুজ একটু রঙের সঙ্গে অন্ধকার মিশে শ্যাওলা শ্যাওলা দেখায়।

আটটা বাজার পর তিতু ঘর থেকে উঠে এসেছে। তার আগে পর্যন্ত টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ইংরেজি পড়ছিল। পড়া শেষ করেই উঠেছে।

অন্যদিন, আজকাল এই গরম কালে, আটটা বাজলেও মনে হয় না রাত হয়ে আসছে—বা হয়ে গেল। সন্ধ্যেই মনে হয়। মনে হয় আরও খানিকক্ষণ পরে সত্যিকারের রাত শুরু হবে। আজ আটটা বাজতেই মনে হল, রাত হয়েছে। বাইরের আবহাওয়া শান্ত, স্তব্ধ, ঘন। অন্ধকার গাঢ়। ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা।

তিতুর মন বসছিল না আর পড়ায়। উঠে পড়ল। খিদে পেয়েছে। মাসি বাড়ি নেই, বাবাও না। মধু খেতে দিতে পারত। তিতু বলেছিল মধুকে। মধু বলল, মেম-

সাহেব বলেছেন তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত সবুর করতে।... তিতুর খিদে পেয়েছিল, তবু সবুর না করে উপায় নেই। মাসি যখন বলে গেছে—তখন আর কথা কি! মেমসাহেবকে ভয় পায় মধু, তিতু মাসিকে ভয় পায়।

রোজই তিতু আটটার সময় খায় না; কোনোদিন ন'টা, কোনোদিন সাড়ে ন'টাও বাজে। ঠিক নেই কিছু। মাসি ডাকলে তবে খাবার টেবিলে উঠে যায়। মাসি না থাকলে —মাসির হুকুম মতন মধু ডাকে।...আজ তিতুর খিদে পেয়েছিল, আজ আটটার সময়ই বেশ রাত রাত মনে হচ্ছিল। আর—? আর আজ তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে যেতে ইচ্ছে করছিল তিতুর।

তিতু আজকের রাত্রের খানিকটা সুখ কল্পনা করে নিয়েছিল। ঘর আজ ঠাণ্ডা। বাইরে জলো আকাশের কোথাও গুড়গুড় করে মেঘ ডাকবে, বিদ্যুতের চমকানি আসবে কাচ গলে। তিতু ঘুমোবে। তিতু ঘুম ঘুম চোখে স্বপ্ন দেখবে। মা-র কথা ভাববে তিতু। মার ছবি বালিশের তলায় নিয়ে শুয়ে থাকবে।

কথাটা ভাবতেই তিতুর মনে সুখের রোমাঞ্চ লেগেছিল। কে যেন বলেছিল তিতুকে, রাত্রে শুয়ে শুয়ে একমনে যার কথা ভাবা যায়—তাকে স্বপ্ন দেখে মানুষ। কেন? কেন আর কি—দেখবেই ত! মারা যাবার পর মানুষ বাতাস হয়ে যায়। বাতাসে থাকে। তবু তারা সব বুঝতে পারে, জানতে পারে। কেউ ডাকলে বোঝে। তাইত আসে।

মা যে বাতাস হয়ে আছে তিতু জানে। মার ছবি মাথার তলায় নিয়ে শুয়ে—তিতু মাকে স্বপ্নেও দেখেছে।

একটা জিনিসই শুধু তিতুর মাথায় ঢুকত না। বাতাসের সঙ্গে মা কি করে মিশে আছে? ধুলোবালির মতন? লক্ষ লক্ষ বীজাণুর মতন? ভাবলে অবাক হয়ে যায় তিতু, খারাপ লাগে, ভীষণ খারাপ। নীচের দিকে সব বাতাসই মলিন, ময়লা। অনেক উঁচুতে বিশুদ্ধ বায়ু আছে। তিতু তার বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছে। কিন্তু অত উঁচু বিশুদ্ধ বায়ুস্তরে থাকলে এত নীচে নেমে আসতে কি মার কষ্ট হয় না! হয়, খুব কষ্ট হয়।

তিতুর মনে আছে, মা মারা যাবার আগে—অনেক আগে থেকেই বলত, তিতু বড় হয়ে তুইও আমায় কষ্ট দিবি ত, দিবি না?

না—না—না। মাথা নাড়ত তিতু। কষ্ট দেবে না মাকে। কিছুতেই দেবে না।

দেয় না তিতু। নয়ত রোজই সে মার ছবি মাথার তলায় নিয়ে শুতে পারত। তিতু কি তাই শোয়? না। অত উঁচু থেকে আসতে মার কষ্ট হবে বলে, তিতু ইচ্ছে থাকলেও ছবিটা নেয় না।

আজকের কথা আলাদা। আজ এমন রাত্তিরে মা আসুক। মেঘ বৃষ্টি ঝড়ে নীচের বাতাস আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে—মা আসতে পারে। আজ ওপরের অনেক উঁচুর—ওই মেঘের কাছে বাতাসে বাজ জ্বলছে পুড়ছে, অন্ধকারে থমথম করছে। আজ অত উঁচু থেকে মা নীচুতে নেমে আসুক। খুব বাতাস আজ, ঝড়ো হাওয়া—মার কোনো কষ্ট হবে না।

ছবিটা আগেই তিতু তার নিজের ঘরের দেওয়াল থেকে

খুলে বিছানায় রেখে দিয়েছে। বালিশের তলায়।…এই ছবিটা বেশ; সুন্দর। ছোট খুব। তা হোক। তবু এই ছবিতে তারা তিন জনেই আছে। মা, বাবা আর তিতু। মা চেয়ারে বসে, তিতু মার কোলের পাশে দাঁড়িয়ে, মার হাঁটুতে একটা হাত রেখে; বাবা মার পিছনে দাঁড়িয়ে। মার মাথা বাবাব পেটের কাছে, তিতুর মাথা মার বুকের তলায়।

মার মুখে হাসি। না হাসি নয়, খুশী। মার মাথায় একটুখানি ঘোমটা। মার একটা হাত তিতুর কাঁধের পাশ দিয়ে নেমে কোমরের কাছে পড়েছে। তিতুকে টেনে রেখেছে কাছে। বাবা সোজা দাঁড়িয়ে। বাবার মুখে মজা মজা ভাব মাখানো। কী লম্বা চেহারা বাবার! এখনকার মতন এতোটা মোটাও নয়। বাবার একটা হাত মার কাঁধে—চেয়ারের ওপর। বাবা ফুল প্যান্ট আর শার্ট পরে আছে। তিতুর গায়ে সাহেবদের ছেলের মতন জামা। কোমরের ওপর থেকে গ্যালিস—কাঁচির মতন কাটাকুটি হয়ে কাঁধের দু-পাশ টপকে পিঠে নেমে গেছে। গায়ে আঁশ ওঠা গেঞ্জি। মাথা ভর্তি চুল। তিতুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দাঁত বন্ধ রাখতে গিয়ে ঠোঁট থুতনি কেমন হয়ে গেছে। বোকা বোকা। তিতুর নিজেরই এখন হাসি পায় সেই ছবি দেখলে।

পুরনো বাড়িতে ছবিটা বাবার ঘরে ছিল। বেশ উঁচুতে টাঙানো। তিতু দেখতে পেত না। এ-বাড়িতে আসার সময় আরও দু-চার খানা ছবির সঙ্গে এখানে এল। ঘর সাজাবার সময় মাসি ড্রইংরুমে জায়গা করতে পারল না। ডাইনিংরুমে ঝুলিয়ে দিল। বাবাই একদিন কি ভেবে ছবিটাকে তিতুর

ঘরে দিয়ে দিতে বললে। বাবা না বললে, ডাইনিংরুমেই ছবিটা ঝুলত। কেউই ফিরে তাকাত না, দেখত না। এমন কি তিতুরও নজর পৌঁছত না। ভাগ্যিস বাবা তিতুর কথা খেয়াল করেছিল। মাসির অবজ্ঞা উপেক্ষা থেকে বাবা ছবিটা বাঁচিয়েছিল বলে তিতু খুশী হয়েছিল। কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল।

এখন, ওই পুরনো ঘড়িটার মতন এই ছবির সম্পূর্ণ অধিকার তিতুর এই-বোধ তাকে খুশী করে, গর্বিত করে, সুখী করে। আমার মা, আমি আর আমার বাবা—ছবিটা দেখলেই তিতুর মনে এইরকম একটা সন্দেহাতীত দখল-দারীর ভাব আসে, আর সেই মনোভাব তিতু পছন্দ করে খুব, ভালবাসে। আনন্দ পায়।

তিতুর কানে গেল গাড়ির শব্দ। রাস্তায় হর্ন দিচ্ছে। বাবা আর মাসি ফিরল। গেট বন্ধ। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে হর্ন টিপছে বাবা। মালি বা মধু কেউ গিয়ে গেটটা খুলবে।

ঘন ঘন বাজতে লাগল হর্ন। যেন বাবা বিরক্ত, অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

তিতু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বুঝতে পারল না, কেন কি জন্যে তার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে বাবা আর মাসিকে একসঙ্গে দেখতে, একসঙ্গে ওদের গাড়ি থেকে নেমে আসা দেখতে। বুঝল না, সে-রকম কোনো ভাবনাও তার মাথায় এল না। বরং তিতু যখন ডাইনিংরুমের মধ্যে দিয়ে সামনের বারান্দার দিকে যাচ্ছিল—তখন ভাবছিল, গেট খুলে দিতে এত দেরি করছে কেন মালি বা মধু?

সামনের বারান্দা পেছন-বারান্দার মতন লম্বা চওড়া নয়। ছোট। ড্রয়িংরুম আর ডাইনিংরুমের দরজা জুড়ে সামনের দিকেই অল্প বারান্দা। একপাশে টবে পাতা-বাহার আর লতানো একটা গাছ। বারান্দার মাঝখানে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া কালো রঙের একটা র‍্যাক; আর্শি লাগানো, আঁকাশি আঁটা। টুপি খুলে রাখার জন্যে।

তিতু ডাইনিংরুমের দরজার পরদা অল্প একটু সরিয়ে গা-আড়াল দিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা সোজা এসেই বাঁ দিকে ঘুরে গেল। বারান্দার কাছে দাঁড়াল না। সোজা গ্যারেজে চলে গেল।

এ-রকম সাধারণত হয় না। বারান্দার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাসিকে নামিয়ে দেয় বাবা; তারপর গ্যারেজে গাড়ি রাখতে যায়। মাসি দাঁড়িয়ে থাকে, বাবা না আসা পর্যন্ত। আজ মাসিকে নামাল না বাবা। বেশ জোরে ছুটে এসেই বাঁক নিয়ে গ্যারেজে চলে গেল। চাকা আর ব্রেকের বিশ্রী শব্দ শুনতে পেল তিতু। সামান্য অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পরদার আড়ালে। গ্যারেজের মধ্যে গাড়ির ইঞ্জিনটা বার দুই গর্জন তুলে থেমে গেল।

খানিক পরে বাবার গলা শুনতে পেল তিতু। বাবা আসছে। পরদার আড়াল থেকে কাচের আধ-ভেজান দরজা দিয়ে তিতু দেখল, মাসি সামনের সিঁড়িতে এসে পড়েছে। খুব সেজেছে মাসি। নীল রঙের সিল্কের শাড়ি; সেই রঙেরই ব্লাউজ। আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে। মাসির মুখ যতটা ধবধবে ততটা লাল। ঠোঁট টকটকে। মাসির হাতে

ব্যাগ। সোনা চকচক করছে গলায় হাতে অনেকটা জায়গা জুড়ে। মাথার খোঁপাটা গোল। চাকার মতন।

মাসি সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই বাবা পিছু থেকে যেন ছুটে এসে মাসির হাত চেপে ধরল। একটু দাঁড়াল মাসি, তারপর পা তুলল দ্বিতীয় সিঁড়িতে।

বাবা কি বলল। তিতু শুনতে পেল না। বাবার গায়ে শার্ট নেই। সেই সুন্দর কলার-তোলা সাদা ধবধবে গেঞ্জিটা আছে। পরনে সাটিনের মোলায়েম সুন্দর ট্রাউজার। বাবার বাঁ হাতে গাড়ির চাবিটা ঝুলছে···চোখ দুটো বাবার কেমন যে! মাথার চুল একটু উস্কোখুস্কো।

মাসিকে বাবা আর এগুতে দিল না। বাবার দিকেই ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে নিল। মাসি বাবার কাঁধের পাশে টলে পড়ল। কাঁধ থেকে আঁচল খসে পায়ের কাছে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ল।

মাসি যেন কি বললে। রাগ করেই। রাগের চিহ্ন মাসির মুখে দেখতে পেল তিতু।

বাবা হাত ছেড়ে দিল। সিঁড়ির ওপর থেকে লুটনো আঁচল হাত বাড়িয়ে তুলতে তুলতেই মাসি বারান্দায় উঠে এল। বাবা দাঁড়িয়ে।

বারান্দা দিয়ে মাসি যখন ড্রইংরুমের দরজার কাছে চলে গেল, তিতুর খেয়াল হল—মাসির পেটের কাছটায় খোলা।

বাবাও পিছু পিছু যাচ্ছে। বাবার মুখের ভাব ভাল দেখাচ্ছিল না।

ড্রয়িংরুমের দরজা খোলার শব্দ হতেই তিতু সরে এল। চোখের আড়ালে চলে গেল মাসিদের।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে টেবিলের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল তিতু। মাসি না-ডাকা পর্যন্ত খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে পারবে না।

টেবিলের ওপর অংকের রাফ খাতার মলাটে লেখা নামটা দেখছিল তিতু। নিজেরই নাম। একদৃষ্টে অথচ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিতুর চোখে অত চেনা জিনিসও কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছিল।

খাবার টেবিলে এসে বসল তিতু। মাসি ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিতুর মুখোমুখি। বেড়িয়ে ফেরার পর শাড়ি জামা বদলে নিয়েছে। এখন পাতলা সাদায়-সবুজে চেক কাটা শাড়ি, গায়ে বেগুনী রঙের ব্লাউজ। হাতের ঘড়ি খুলে রেখেছে। আরও যেন কিছু। তিতু বুঝতে পারল না। তখন মাসির হাতে সোনা চক্‌চক্ করছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে, এখন কেমন খালি খালি দেখাচ্ছে। তিতুর সে রকম মনে হল। হাতে বালা ছাড়া আর কিছুই নেই এখন।

তিতু চেয়ার টেনে বসতে বসতে যতটুকু পারল মাসিকে দেখে নিল। তারপর আর চোখ তুলল না। টেবিলের ওপর তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় উলটে রাখা ডিশ সোজা করে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত্রে তিতু রুটি খায়। এ-বাড়ির সকলেই। মাসি তিতুর ডিশে দুটো ছোট ছোট রুটি দিল প্রথমে। মাসির নখে পাকা আপেলের মতন রঙ লাগানো। রঙটা তিতু দেখল। মাসি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল? কোথায়?

হালদার সাহেবদের বাড়ি ? ইঞ্জিনিয়ারদের বাংলোয় ? ক্লাবে সিনেমা দেখতে ?

ছোট চ্যাপটা ধরনের ছড়ানো-কানা চিনেমাটির বাটিতে ডাল দিল মাসি, বোট্ল থেকে, মুগের ডাল। চামচে করে খানিকটা তরকারী তিতুর প্লেটে তুলে দিচ্ছিল মাসি। মাসির আঙুলগুলো বেশ লম্বা লম্বা। আংটিটাও চোখে পড়ল তিতুর। মনে হল এই আংটি নতুন। তিতু এর আগে দেখেছে কি ? বোধ হয় না।

তিতু খাওয়া শুরু করল। ধীরে ধীরে। ছোট ছোট করে রুটির টুকরো ছিঁড়ে। খাবার সময় মুখের শব্দ হলে মাসি চটে যায়। বলে, অসভ্য ছোটলোকদের মতন খাওয়া…, গরুর মতন শব্দ করে। একটু তাড়াতাড়ি চিবুতে গেলেই তিতুর মুখে শব্দ হয়। কারই বা না হয়! মাসির হয় না। মাসি শব্দ হবে বলে চিবোয় না বোধ হয়। জিব দিয়ে কি-এক কায়দা করে গলার মধ্যে টেনে নেয়, ঠোঁট বন্ধ করে গিলে ফেলে।

তিতু অল্প অল্প করে অস্বস্তির সঙ্গে খেতে লাগল। মাসি সামনে না থাকলে এতক্ষণে দুটো রুটি প্রায় শেষ হয়ে যেত তার। খাওয়ার সময় মাসি না থাকলেই তিতু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু এই সময়টা বেশিরভাগ দিনই মাসি থাকবে টেবিলের সামনে। নিজের হাতে খেতে দেবে। তিতু বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিতুকে জব্দ করার জন্যে, মজা দেখার জন্যে মাসি ঠিক এ-সময় কাছে থাকবেই।

নোনতা নোনতা লাগল তিতুর। তরকারি বা ডাল কিসে

যে নুন বেশি হয়েছে বুঝতে পারল না তিতু। জিবের আগা দিয়ে খুব সাবধানে ঠোঁট চেটে নিল নুনের ভাবটা কাটাতে।

মধু মাংস নিয়ে এসেছিল; রেখে দিয়ে চলে গেল। তিতু জলের গ্লাস নিল হাত বাড়িয়ে। মুখে তুলছে, বাবার চেহারা চোখে পড়ল। ড্রয়িংরুমের দরজা পেরিয়ে বাবা এই ঘরে পা দিয়েছে।

স্লিপারের শব্দ মাসির কানে গিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাসি। বাবা আস্তে আস্তে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। বাবা সব সময় টেবিলের কোণায় বসে। বরাবর। তিতু আর একবার পলকের জন্যে বাবার দিকে চেয়ে দেখল। বাবা পোশাক বদলায় নি। মুখে বিরক্তি। খুব গম্ভীর। যেন কিছু ভাবছে।

মাসি বাবার দিকে চাইল। খুশী হল না। বরং কপাল একটু কুঁচকে উঠল। চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, মাসি খুবই অপছন্দ করছে বাবার এভাবে এসে দাঁড়ানো।

বাবা দাঁড়িয়ে থাকল না। টেনে যেন ছুঁড়ে ফেলছে এমন ভাবে টানল চেয়ারটা। শব্দ হল। বাবা বসল।

'তোমায় খানিক দেরি করতে বললাম যে!' মাসি বিরক্ত গলায় বললে। আড়চোখে তাকাল কফির পেয়ালার দিকে। এইমাত্র মধু দিয়ে গেছে।

তিতু বাবার দিকে আর একবার চাইল। চোখ দুটো বেশ লালচে বাবার। মুখের ভাবটাও অন্য রকম। তাত লেগে যেন ঝলসে উঠেছে।

তিতুর প্লেটে মাসি কয়েক টুকরো মাংস আলু ঝোল তুলে দিল। রুটি দিল আরও দুখানা।

বাবা নিজেই হাত বাড়িয়ে রুটি রাখা প্লেট থেকে খান কয়েক রুটি নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে দু-হাতে, ছিঁড়ে নিজের ডিশে রাখছে।

মাসি বাবার প্লেটের দিকে ভাজা আর তরকারির পাত্র এগিয়ে দিল। বাবা ছুঁল না।

'খাবে না?' মাসি শুধলো।

'না।' ইশারায় মাংস দিতে বলল বাবা।

বাবার প্লেটে মাংস তুলে দিতে দিতে মাসি বিড় বিড় করে বলল, 'আগে কফি খেয়ে নেওয়াই উচিত ছিল তোমার।'

'কেন?' বাবা কাঁটা দিয়ে রুটির টুকরো মাংসের ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরল। গলার স্বরটা রুক্ষ।

মাসি জবাব দিল না। চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের খাবার গুছিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

টেবিলে তিনজনেই চুপ। তিতুর অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। বাবা আর মাসির মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। বাবা রেগে গেছে। মাসিও বিরক্ত। বাবা যে মদ খেয়েছে তিতু জানে। মদ খেলে বাবার চোখ লালচে হয়ে যায়। গলা একটু ভেঙে আসে। মুখ চকচক করে। আর বাবা প্রায়ই মদ খায়।

তিতুর বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড়ের ওপর মাসি বড় চামচের ডগা দিয়ে মারল। জোরে, বেশ জোরে। খট্ করে শব্দও হল। তিতু চমকে উঠল। বেশ লেগেছে তার।

মাসির দিকে চাইল তিতু। কিছু বুঝতে পারল না। মাসি তখনও ঝুঁকে রয়েছে। বাঁ হাতে চামচ। উঁচু করেই ধরে আছে। এখুনি আবার হয়ত মারবে।

তিতু ভাবল হয়ত একটা মাছি, কানামাছি তার হাতের ওপর এসে বসেছে।

'হাত নামাও টেবল থেকে।' মাসি শাসনের গলায় বলল, 'অসভ্য কোথাকার!'

তিতু হাত নামিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

মাসি চামচ রেখে দিল। চোখের বিরক্তি বা গলার রুক্ষতা গেল না। 'তোমায় কতদিন না বলেছি টেবলের ওপর শুয়ে পড়ে হাতে ভর দিয়ে খাবে না। ঘুমোবার জায়গা নয় এটা।' তিতুর দিকে চেয়ে চেয়ে মাসি ধমক শেষ করল। তারপর বাবার দিকে চাইল। অসহিষ্ণু অধৈর্য ভাবে বলল, 'এই জানোয়ারকে মানুষ করা সভ্য করা আমার সাধ্য নয়। আমি পারব না।'

তিতুর হাত আর নড়ছে না। প্লেটের মধ্যে ক'টা আঙুল ডুবে রয়েছে। ভয় করছিল তিতুর। কান্না আসছিল। কাঠ হয়ে বসে থাকল ও।

'আমি তোমায় অনেকবার বলেছি।' মাসি বাবাকেও ধমকে কথা বলছিল যেন, 'ওকে একটা বোর্ডিং-ফোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দাও। এ-বাড়িতে থাকার উপযুক্ত ও নয়। ছোট লোকদের সঙ্গে মিশুক, তাদের সঙ্গে খাক দাক ঘুমুক। কেন রেখেছ ওকে এখানে?'

তিতু মাসির দিকে তাকাল না। তবু মাসির মুখের ভাবটা মনে মনে দেখতে পেল। মাসির চোখ আগুন, দাঁত ঝকঝক করছে, শক্ত—মাংস টেনে ছেঁড়ার সময় যেরকম ধারালো আর শক্ত দেখায় দাঁত তেমনই। মাসির কপাল গাল কুঁচকে উঠেছে। রাগে ঘেন্নায় বিতৃষ্ণায়।

বাবা কোনো জবাব দিল না। তিতুর দিকে তাকাল কি না তাও বোঝা গেল না।

একটু অপেক্ষা করে মাসি এবার বললে, আরও ঝাঁঝালো, তেঁতো গলায়, 'আমি আজ ওর খাওয়া বন্ধ করব ভেবেছিলাম। ওর কিছু শিক্ষা দরকার।' মাসি মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থামল। তিতুকে একবার দেখে নিল। বাবার দিকে গলা বাড়িয়ে বলল আবার, 'আমার কেউ নয়—তোমার ছেলে, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। জিগ্যেস করো ওকে, কি করেছে আজ?'

তিতু সোজা শক্ত হয়ে বসে। নীচু মুখ। চোখ টেবল-ক্লথের দিকে। সাদা কোথাও কোন দাগ নেই। তিতু মনে মনে হাতড়াচ্ছে। যেন স্কুল যাবার সময় একটা দরকারী বই কি খাতা অথবা পেনসিলটা খুঁজছে তাড়াহুড়ো করে। পাচ্ছে না। তিতু অবাক; ভীষণ অবাক। কি করেছে তিতু? কি?

বাবা কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মাসি অপেক্ষা করে থাকল অল্পক্ষণ। তারপর চিকন গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'বোবা হয়ে গেছ নাকি?'

'তুমিই বলো।' সামান্য জড়ানো গলায় বাবা বলল।

'আমি—?' মাসি ঝোঁক দিয়ে মাথা নাড়ল। 'আমার চেয়ে তোমার ছেলের কথা মিষ্টি লাগত।······বেশ, আমি বলছি। আমার ছেলে হলে আমি সহ্য করতাম না। ······কি করেছে তোমার ছেলে জানো? নোংরা, বিশ্রী ব্যাপার। আগ্‌লি—! ওর স্বভাব চরিত্র এই বয়সেই নষ্ট হতে বসেছে।' মাসি তিতুকে এক নজর দেখে নিল, 'বিকেলে বৃষ্টি পড়ছে

তখন ও, তোমার ছেলে, বিন্দুর ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভিজে—সব ভিজে, স-মস্ত। কাপড় ছাড়ছে। তোমার ছেলে সেখানে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে।···দাঁড়াও দাঁড়াও এতেও শেষ নয়; ওই মালির মেয়েটার বাটি থেকে মুঠো করে নিয়ে রাস্তার ধুলো-ময়লার শিল খাচ্ছে। পাশাপাশি বসে। আমি দেখলাম। ডাকতে পর্যন্ত লজ্জা করছিল।'

তিতুর মনে পড়ল ঘটনাটা। হ্যাঁ, বিন্দুর বাটি থেকে শিল নিয়ে সে খেয়েছে। তিতু তার অপরাধ বুঝতে পারল। বিন্দুর বাটি থেকে শিল নিয়ে খাওয়া দোষ, আগে বোঝে নি। এখন বুঝতে পারল। শাস্তিটা এবার কি ধরনের হবে, হতে পারে—তিতু ভাববার চেষ্টা করল। বাবা তাকে মারবে? তিতু অস্পষ্টভাবে বাবার অতবড় চেহারা, শক্ত শক্ত হাত, গায়ের জোর, আর লালচে চোখ দুটোর কথা ভাবতে ভাবতে ভীত এবং অসহায় হচ্ছিল।

'এখন বলো এই ছেলের কি করা উচিত?' মাসি বলল।

জবাব নেই বাবার মুখে। প্লেটের কানায় কাঁটা বা ছুরি লেগে ঠুং করে শব্দ হল। তিতু সাহস করে ঘাড় ঘুরোতে পারল না। অপেক্ষা করতে লাগল বাবা কখন চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়, তিতুর কাছে এগিয়ে আসে।

আশ্চর্য, বাবা উঠে দাঁড়াল না। বরং হঠাৎ কেমন ভাবে হাসল। খুব জোরে নয়, ধীরে টেনে টেনে। গলার হাসি ফুরিয়ে যাবার পরও বিশ্রী একটা শব্দ আঠার মতন লেগে থাকল। 'ওর দোষ কি! একলা ওর দোষই বা কেন! এই রকম হবে।···একে রক্ত বলে····রক্তের দোষ····মা, মাসি—'

'রাস্তার কুলি-টুলি ইতর মানুষের মতন কথা বলো না,' মাসি আচমকা যেন ফেটে পড়ল, 'ভদ্র ভাবে কথা বলো।'

'সত্যি কথা—'

'থামো, সত্যি কথা শুনোতে হবে না।' মাসি কথার ঝাপটা মেরে বাবাকে থামিয়ে দিল। 'আমি জানি। আমার কিছু অজানা নেই।...মদ খেলে যাদের মুখের লাগাম থাকে না তারা মদ খায় কেন? কি দরকার কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট করার?' মাসি জলের গ্লাস এক চুমুকে নিঃশেষ করল। গ্লাসটা রাখল শব্দ করেই।

ভয় ছাড়াও তিতুর অন্য রকম লাগছিল, মুখ কান গলার মধ্যে কি এক অস্বস্তি। আর একটুও বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। উঠে পালিয়ে যেতে পারলে তিতু বাঁচে। ওঠার সাহসও পাচ্ছে না। কপাল ভিজে ভিজে লাগছে। জল তেষ্টা পাচ্ছে। তবু শক্ত কাঠ হয়ে বসে থাকল তিতু।

বাবা উঠল। চেয়ারের পায়া ঘষড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেল তিতু। এবার বাবা তার দিকে এগিয়ে আসবে। মারবে তিতুকে। ভয়টা তিতুর বুক থেকে লাফ দিয়ে গলায় উঠে এল। তিতু অসহায়ের মতন তাকাল বাবার দিকে।

বাবা তিতুর দিকে এল না। মাসির দিকে এগিয়ে গেল। মাসির চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাসি একপাশের ঘাড় উঁচু করে দেখছে বাবাকে। রাগে মাসির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা প্রায় বোজা, ভুরু বেঁকে কুঁচকে গেছে। তিতুর হঠাৎ মার কথা মনে পড়ল। মা বাবাকে এই ভাবে দেখত।

মাসির কাঁধে হাত রাখল বাবা। না, হাত রাখল নয়,

চেপে ধরল। মাসির একখানা হাতও ধরে ফেলল বাবা। খপ করে। মাকে যেমন ধরত। তিতুর এবার অন্য রকম ভয় হল। মাসিও বাবার দিকে ভয় পেয়ে তাকিয়েছে।

তিতুর মনে আচমকা তৃপ্তির একটু যেন বাতাস এসে লাগল। তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। বিশ্রী রকম খুশী ভাবটা ধুয়ে গেল। হঠাৎ আবার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল তিতুর।

'ওঠো, ও-ঘরে চলো।' বাবা গম্ভীর থমথমে গলায় বলল। টানল মাসিকে।

'মানে, তুমি কি আমায় খেতে দেবে না?' মাসির চাপা রাগ আরও বিষিয়ে উঠেছে।

'ও পরে হবে। ঘরে বসেও তুমি খেতে পারবে।'

মাসি বাবার মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। 'কি শুরু করেছ? এখানে—' মাসির যেন খেয়াল ছিল না, তিতুর দিকে চোখ পড়তে খেয়াল হল; ধক্ করে জ্বলে উঠল মাসির চোখ। 'এখনও তুমি বসে আছ কেন? যাও—উঠে যাও এখান থেকে।'

তিতু চোখের পলকে উঠে পড়ল। উঠতে গিয়ে হাত লেগে জলের গ্লাস পড়ে গেল। ভাগ্যিস জল ছিল না। গ্লাসটা টেবিলে রেখে তিতু প্রায় এক দৌড়ে তার ঘরে পালিয়ে গেল।

ঘরে গিয়ে তিতু দাঁড়াল। তার পা নিজের থেকেই আটকে গেল। কান পড়ে থাকল পরদার ওপাশে।

'চাকর বাকর ছেলের সামনে তোমার এই নোঙরামি—', মাসির গলা, 'ছি ছি—ছি।' চোখ মুখ নাক কুঁচকে মাসি

জিবের মধ্যে ধিক্কারের যে-শব্দটা করল, তিতু তা শুনতে পেল, বুঝতে পারল। চাকর বাকর কেউ ছিল না; তবে এসে পড়তে পারত: তিতু ভাবল। মধু আসতে পারত।

'আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি চলে এলে কেন?' বাবা কর্কশ গলায় শুধোল।

'ও-সব বাজে কথার জবাব হয় না।'

'হয়, আলবৎ হয়।'

তিতুর পা যে কাঁপছে, হাতের আঙুলও চিন চিন জ্বালা করছে, তিতু এবার অনুভব করল। পা পা করে এগিয়ে চলল বাথরুমের দিকে হাত মুখ ধুতে।

'পাগলামি করো না।' মাসি বলল বাবাকে, 'ছাড়—আমার লাগছে। আমার কাঠের শরীর নয়।'

'জানি; মাংসের শরীর।...ওঠো, উঠে এসো।'

বাবার কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার ঠেলে ওঠার শব্দ হল। মাসি উঠল হয়ত। 'তুমি যাও, আমি আসছি একটু পরে।' মাসির গলার স্বর পরিষ্কার। ঝাঁঝ রুক্ষতা কিছুই নেই। যেন খুব সহজ গলায় কথা বলল মাসি। 'মধু টেবল পরিষ্কার করে দিয়ে যাক, আমি যাচ্ছি।'

বাবা আর কথা বলল না। চলে গেল। তিতু বাবার পায়ের স্লিপারের শব্দ শুনতে পেল।

চার.

অন্ধকারে বিছানায় বসে তিতু সব বুঝতে পারল। মধু তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার করে নিচ্ছে, মাসির হুকুম মতন। খুট খাট ঠুং ঠাং শব্দ; চলা ফেরা তোলা-তুলি চেয়ার

সরাবার। ডাইনিংরুমের দরজা জানলা সব বন্ধ করল মধু। একে একে। প্যানট্রির বেসিনে এঁটো প্লেট ডিস কাঁটা-চামচ ডুবিয়ে রাখল। পাউডার ছড়ালো। না, পরিষ্কার করল না আজ। কাল সকালে করবে। প্যানট্রির দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

মাসি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিল। এবার উঠল। চটির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তিতু। প্রথমে প্যানট্রিতে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল মাসি। বাতি নিভিয়ে ডাইনিং রুমে এল আবার। দরজা মধু বন্ধ করে দিয়েছে, তবু মাসি একবার করে দরজা ঠেলে দেখল। কাঠ আর কাচের পাল্লার খটখটে একরোখা আওয়াজ। দরজা ঠিকমতন বন্ধ আছে। বাতি নিভিয়ে দিল মাসি। সুইচ টেপার খুট্ করে শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে একরাশ অন্ধকার তিতুর ঘরের অন্ধকারে মিশে আরও ঘন হয়ে গেল।

আর সাড়া শব্দ নেই। ড্রইংরুমের দরজাও মাসি ঠিক একইভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখবে, বাতি নিভিয়ে দেবে, তারপর নিজের ঘরে ঢুকবে। তিতু জানে। মনে মনে তিতু মাসির প্রত্যেকটা পা ফেলা দেখতে পেল।

ঘন অন্ধকার আর গভীর নীরবতার মধ্যে খানিকটা সময় কাটল। তিতু শুয়ে থাকল চুপ করে। পাশ ফিরল না। মাথার ওপর পাখাটা খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে। দেখতে পাচ্ছে না তিতু।

মাসিকে কি বাবা মারবে? তিতু একমনে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে কথাটা ভাবছিল। বাবা ভীষণ রেগে আছে। বাবাকে নিষ্ঠুরের মতন দেখাচ্ছিল তখন। মাকে যখন মারত

বাবা তখন এই রকম দেখাত। সে-ছবি তিতুর মনে নেই। তবু তিতুর মনে ছবিটা তৈরী হয়ে উঠল এবং বাবার আজকের চেহারার সঙ্গে মিলে গেল।

মার জেদ ছিল, মা একগুঁয়ে ছিল খুব। মাসিও জেদি, একগুঁয়ে। মা বাবাকে আরও রাগিয়ে দিত চুপ করে থেকে, মাসি কথা বলে বাবাকে রাগিয়ে দেয়। মাসির ওপর বাবা আজকের মতন কোনোদিন রাগে নি। একটু আধটু রাগ হয়ত হয়েছে বাবার। বাবা অসন্তুষ্ট হয়েছে, অখুশী হয়েছে, পছন্দ করে নি, মুখ গোমড়া গম্ভীর হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের মতন মাসির হাত চেপে ধরেনি।...তিতুর মনে পড়ল, বেড়িয়ে ফেরার পরও সিঁড়িতে বাবা মাসিকে এই-ভাবে খামচে ধরেছিল। মাসি তাতে খুব রেগে বাবাকে কি যেন বলেছিল; তিতু শুনতে পায় নি।

আজ মাসি আর বাবা কি করবে? ঝগড়া, মারামারি? কি যে করবে ওরা তিতু কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছিল না। তিতুর উদ্বেগ বাড়ছিল। উৎকণ্ঠা আর ভয় বুক জুড়ে ভীষণ ভাবে চেপে বসছিল।

বিছানার ওপর ছটফট শুরু করল তিতু। খুব গরমে গা জ্বালা, চোখ করকর করলে যেমন সারা শরীর জুড়ে অস্বস্তি হয়—সেই রকম অস্বস্তি অনেকটা।...কি করছে মাসি? কি দোষ করেছে? কথার জবাব দেয়নি, তাচ্ছিল্য করেছে বাবাকে?—তাই কি এত রাগ বাবার?

আর বাবাও যে কেন মদ খায় তিতু বুঝতে পারে না। কি দরকার মদ খাবার? মদ খারাপ জিনিস। মদ খেলে মানুষের হুঁশ থাকে না, জ্ঞান হারায়; কি করছে কিছু বুঝতে

পারে না।···বাবা মদ খেত বলে মা রাগ করত, মা কষ্ট পেত। ঝগড়াঝাটি হত দুজনে ; বাবা মাকে বকত, ধমকাত ; গায়ে হাত তুলত মার। মদ খেত বলেই যে বাবা এ-রকম করত তিতুর তাতে সন্দেহ নেই।

ছোটবেলা থেকে তিতু বাবাকে মদ খেতে দেখেছে। দেখে অভ্যেস হয়ে গেছে, সয়ে গেছে চোখে। এখন আর আলাদা করে কিছু মনে হয় না তিতুর। কখনো সখনো তেমন কিছু ঘটলে তখন বাবার মদ খাওয়ার দোষটা চোখে পড়ে তিতুর। আজ যেমন পড়েছে।

তিতু ভাবছিল, বাবা আজ মদ খেয়েছে অনেকটা, বাবার হুঁশ নেই, মাসির সঙ্গে ঝগড়া করছে। হয়ত মাসিকে মারবে, ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে, হাত মুচড়ে দেবে। ঠিক যে কি করবে বাবা মাসিকে তিতু জানে না। হয়ত মাসিকে ঘরের বাইরে অন্ধকারে বের করে দিতে পারে। মাকে নিজের ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিত বাবা। মা তখন তিতুর ঘরে তিতুর খাটে এসে বসত।····মাসিকে ঠেলে বের করে দিলে····ঃ তিতু বাইরের অন্ধকার বারান্দা আর জলো হাওয়া গাছপালার শূন্যতা এবং স্তব্ধতা মনে মনে একবার দেখে নিল।

আবার একটু খুশীর ভাব আসছিল তিতুর। বাবার ঘর থেকে যদি বাবা তাড়িয়ে দেয়, অন্ধকারে বৃষ্টিতে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মাসিকে। কথাটা ভাবতে তিতুর মনের তলা থেকে অদ্ভুত এক খুশী ফুটে উঠল। বেশ হয়, ভালো হয়—মাসির সেই অসহায় অবস্থা অস্পষ্ট ভাবে ভাবতে গিয়ে তিতু যেন সায় দিচ্ছিল মনে মনে।

তিতুর ভাবনা এবার অন্যদিকে সরে এল। পাশ ফিরল তিতু। মাসি আর বাবার মধ্যে ঝগড়া লেগেছে, তিতু ভাবছিল ঃ ওরা দুজনে ঝগড়া-ঝাটি করছে। ওদের মধ্যে আর ভাব নেই। আগে তিতু বুঝতে পারে নি। কিছুদিন পরে মনে হচ্ছিল বাবা মাসির ওপর যেন একটু রাগ করেছে। মাঝে মাঝে বাবা মাসিকে গম্ভীর গলায় কথা বলত। মাসির কথা কানে তুলত না। ঠাট্টাও করত। দুজনে আলাদা ভাবে চা খেত। কখনও কখনও বাবা একলাই গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, মাসিকে সঙ্গে নেয় নি। · তিতু ঠিক বুঝত না। তার চোখের সামনে কতটুকুই বা ঘটত! কিন্তু এই ছোটখাট রাগারাগিও কেমন যেন লাগত। মাসি আর বাবার আগে যেমন গলায় গলায় ভাব ছিল, হাসাহাসি গল্প বেড়ানো—তেমন যে নেই আজকাল তিতু বুঝতে পারত। তিতু ভাবত, হয়ত বাবার মন কাজের ভাবনা নিয়ে খুব ব্যস্ত, হয়ত শরীর ভাল নয়, হয়ত মাসি এ-সব পছন্দ করে না—সভ্য সাহেবী বাড়িতে এমন কিছু করা বোধ হয় উচিত নয়।

আজ তিতুর চোখে পড়েছে। কি করে পড়ল—কেমন করেই বা তিতু ঠিক ঠিক জেনে ফেলল তা তিতু ভাবছে না। তিতু জানতে পেরেছে মাসি তিতুর নামে দোষ দেওয়ার পরও বাবা আজ কিছু বলল না, গ্রাহ্যই করল না কথাটা; আগে কখনও এমন হয়নি! বাবা মাসির কথা আর শোনে না। মাসি যা বলবে বাবা আর তা করবে না। তিতু যেন হঠাৎ এই সত্য আবিষ্কার করে ফেলে বেশ খুশী হল।

খুব আরাম লাগছিল তিতুর। মাসিকে জব্দ করা গেছে

এই রকম ভাব হচ্ছিল তিতুর মনে। ঠোঁটে মুখে একটু হাসি হাসি ভাব হল তিতুর।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল তিতু। চমকে উঠল। বাবার ঘর থেকে শব্দটা মাঝের ছুটো ফাঁকা ঘর পেরিয়ে এ-ঘরে এসে পৌঁছল। তিতুর বুকের মধ্যে ধপ্ করে ভয় লাফিয়ে পড়ল আবার। যেন অন্ধকার থেকে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়েছে। তিতু কান খাড়া করে থাকল। আর কোনো রকম শব্দ আসছে না। ঘরের পর ঘর থেকে শুধু অন্ধকার আর থমথমে অসাড় স্তব্ধতা ভেসে আসছে। তিতুর বুকের মধ্যে ধক্ ধক্; একটানা, দ্রুত।

তিতুর একবার মনে হল, বাবা মাসিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। পরেই আবার মনে হল, মাসি বাবাকে কিছু ছুঁড়ে মেরেছে। মাসি তা পারে। মাসি সব পারে। আবার এই ভাবনাকে ভুল অঙ্কের মতন খচ্ খচ্ করে কেটে ফেলল তিতু। না, বাবার সঙ্গে গায়ের জোরে মাসি পারতে পারে না। কিছুতেই না।...তবে ?....তাহলে ?...তিতুর মনে হল, বাবা মাসিকে বাইরে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কথাটা তিতুর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। সভ্য মুখস্থ করা জ্যামিতির থিয়োরেমের মতন ছবি আর প্রমাণটা যেন মনে মনে আওড়ে যেতে লাগল তিতু। ভুলতে পারছিল না।

মাসি কি করবে ? অন্ধকারে বৃষ্টিতে বাইরে বারান্দায় বসে থাকবে ? ভয় করবে না মাসির ? বৃষ্টি এলে ভিজবে যে! ঠাণ্ডা লাগবে মাসির, শীত করবে। তিতুর কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। সারা রাত ঠায় বসে থাকবে মাসি ?

খারাপ লাগছিল তিতুর। ওদের মডার্ন রীডারে একটা ইংরেজী গল্প আছে। তিতুর সেই গল্পের কথা কেমন করে যেন মনে পড়ল। 'দি হোমলেস বেগার'....ঝড় বৃষ্টি জলে শীতে এক ভিখিরি পথে পথে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল,—কেউ তাকে আশ্রয় দিচ্ছিল না; শেষে এক মুচি........।

গল্পটা তিতুর মনে এক ঝলক আলোর মতন ছিটকে পড়ল। ঘরের কোনো চাপা লুকোনো অন্ধকার কোণে আচমকা আলো এসে পড়লে যেমন নতুন নতুন দেখায়—তিতুর মনের একটা কোণও তেমনি দেখাচ্ছিল। মাসির ওপর রাগ কিংবা মাসির শাস্তিতে খুশী হবার ভাব নেই। বরং তিতুর বেশ ভাবনা আর কষ্ট হচ্ছিল।

মাসিদের ঘর থেকে আর কোনো রকম শব্দ আসছে না। তিতু খুব মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করল। কিছুই শুনতে পেল না। মাসি কি কাঁদছে? কে জানে! বাবা কি মাসিকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে—? তিতু কিছুই বুঝতে পারছে না।...একবার মনে হল দরজা খুলে তিতু বাইরেটা দেখে নেয়। অনেক হাঙ্গামা তাতে। ওপরের ছিটকিনি তিতু খুলতে পারে না। হাত যায় না। দরজার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে তবে খুলতে হবে।

আচমকা আবার একটা শব্দ শুনতে পেল তিতু। শব্দটা অন্য রকম। পাশের ঘরে কে যেন এসেছে। বাবা নয়। বাবার চটিতে অত হালকা আওয়াজ হয় না। মাসি—নিশ্চয় মাসি। বাতি জ্বলে উঠবে তিতু আশা করছিল। পরদার দিকে তাকিয়ে ছিল।....না, বাতি জ্বলল না। মাসির পায়ের শব্দ একটুক্ষণ থাকল, তারপর আবার মিলিয়ে গেল।

তিতু বুকের ধক্ ধক্ শব্দ এবার নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। ভাল লাগছে না তার। খারাপ কিছু একটা হবে, হবেই—তিতুর আর তাতে সন্দেহ নেই। সারা বাড়ি যখন নিস্তব্ধ, ঘর ভরা ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাইরে ঝোড়ো জলো হাওয়া, আকাশে থমথমে মেঘ, বাবা মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন, মাসির ওপর ভয়ঙ্কর রেগে গেছে—আর মাসিও জেদি এক-রোখা, বাবাকে আরও রাগিয়ে চটিয়ে তুলেছে, তখন—তখন—?

তিতুর মনের মধ্যে এবার অন্ধকার থেকে একটা ভারী কিছু যেন ছিটকে পড়ল। চমকে উঠল তিতু, কথাটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়তেই। বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল। ভয়ে তিতুর গলা কাঠ, শক্ত। নিশ্বাস ঘন, দ্রুত। তবে কি মার মতন মাসিও—?

খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল তিতু। নিজেকে আর নেহাত বাচ্চা ছোট ছেলে হিসেবে ভাবতে পারছিল না। হঠাৎ যেন সে অনেক—অনেকটা বড় হয়ে গেছে। বেশ বড়; ড্রিল স্যারের মতন, বিভূতিবাবুর মতন। তিতু চুপ করে শুয়ে শুয়ে মাসিকে মরতে দেখতে পারে না। এক-ধরনের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ তিতুকে খোঁচা দিচ্ছিল, ঠেলে দিচ্ছিল। মাসিকে বাঁচাতে হবে।

বড় মানুষের ন্যায়বোধ তিতুর ঘোলাটে ভাবনায় দপ দপ করছে। জটিল আরও নতুন অনুভূতি তাকে অস্থির করছিল। তিতু যে পুরুষ মানুষ, কাউকে বাঁচানো, মারামারি ঝগড়াঝাটি থামানো তার কর্তব্য ;······মনে মনে তিতু নিজেকে বললে, উচিত······এ কাজ আমার করা উচিত। স্কুলের মাঠে কানু

আর ললিতের ঝগড়া কি ভাবে বিভূতিবাবু থামিয়েছিলেন, সাঁতার শেখাত গিয়ে কি ভাবে ড্রিল স্যার নির্মলকে বাঁচিয়ে ছিলেন—সেই সব গল্প তিতুর মনে এসে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উত্তেজনায় বেহুঁশ হয়ে তিতু অন্ধকারে ডাইনিংরুমে এসে দাঁড়াল। এ ঘরে কেউ আছে বলে মনে হল না। ড্রয়িংরুমে অল্প চাপাপড়া আলোর ভাব রয়েছে। তবে কি মাসি ও-ঘরে বসে আছে?……তিতুর পা কাঁপছিল। আস্তে পায়ে তিতু ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। এ-ঘরেও বাতি জ্বলছে না। বাবার ঘরে বাতি জ্বলছে। পরদা এলেমেলো, পাশ দিয়ে একটু আলো এসে পড়েছে এ-ঘরে।

বাবার ঘর চুপ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘরে বাতি জ্বলছে। কিছু বুঝতে পারছিল না তিতু। বাবা কোথায় কি করছে? মাসি কোথায়, কি করছে?

সোফার পিঠ ধরে একটুক্ষণ দাঁড়য়ে থাকল তিতু। ও-ঘরে কেউ কথা বলছে না। কি হচ্ছে ও-ঘরে তিতু বুঝতে পারছে না। ঘরের দরজা যে কেন এখনও বন্ধ করেনি বাবা—তিতু বুঝতে পারছিল না। ড্রয়িংরুম ডাইনিংরুমের ভেতরের দরজা বন্ধ হয় না কোনদিন। কিন্তু বাবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় শোওয়ার আগে। আজ এখনও হয়নি। কেন? মাসি একটু আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বলেই না কি? মাসি কোথায়?

তিতু এবার শব্দ শুনতে পেল। খুব জোরে নয়, আস্তেও না। বাবার ঘরে বাথরুমের দরজা বন্ধ হল। বাথরুমের দরজার শব্দই আলাদা। লক্ করার আওয়াজটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট।

পা টিপে টিপে আরও একটু এগিয়ে গেল তিতু। কিছু না—তিতু শুধু জানতে চায়—বাবা আর মাসি দুজনেই ও-ঘরে আছে। ঝগড়া মারামারি করছে না। বাবা মাসির হাত কিংবা গলা টিপে ধরে নি। মাসি বাবাকে কিছু ছুঁড়ে মারছে না।

মাসিদের ঘর চুপ। যেন কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। তিতু একেবারে পরদা বরাবর কার্পেটের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। পরদার একটা পাশ খানিক কুঁচকে আছে, ফাঁক হয়ে আছে সামান্য। তিতু তাকাল। তাকিয়ে থাকল। ও-ঘরের উত্তরের দিকে দেওয়ালে মাসির ড্রেসিং টেবিল দেখা যাচ্ছে। লম্বা মতন কাচ। কাচের ওপর বাবার বিছানার একটুখানি ছবি। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বেঁটে গদিমোড়া টুল।

মাসির গলা শুনতে পেল আচমকা তিতু। কথা বলতে বলতে মাসি ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কেমন যেন লাগল তিতুর। মাসির গায়ে যেন জামা নেই, বুকের ওপর থেকে চওড়া দুধ-সাদা তোয়ালে পিঠে এসে পড়েছে। শাড়ি পরেনি এখনও ; শুধু সায়া। পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। মাসির মাথার ঝুঁটিবাঁধা চুলের গোড়ায় সাদা ফিতে বাঁধা। ঘাড়ের ওপর পিঠে এলোচুল ছড়িয়ে রয়েছে।......বসে পড়ল মাসি। ড্রেসিং টেবিল থেকে পাউডারের লম্বা কৌটোটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঘাড়ে পিঠে পাউডার ছড়াতে লাগল।

তিতু চোখ নামিয়ে সরে এল।

মাসি বলছে, কথা বলছে—তিতুর কানে গেল। তিতু দাঁড়াল।

কি বলল মাসি তিতু শুনতে পেল অস্পষ্টভাবে, বুঝতে পারল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাবা জবাব দিল কথার। কি বলল কে জানে! কথার শেষে খুব জোরে উঁচু গলায় হেসে উঠল বাবা।

বাবার গলার স্বরে তিতু বুঝতে পারল, বাবা আর অখুশী নয়; রাগ পড়ে গেছে। এক ফোঁটাও যেন আর অবশিষ্ট নেই। বরং কেমন খুব খুশী-হওয়া আহ্লাদে-গলা সুর বাবার গলায়।

কি যে হল তিতুর, কেন যে এমন হল—কে জানে! চোরের মতন চুপি পায়ে ড্রইংরুম থেকে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ডাইনিংরুমে এল। তারপর এক ছুটে নিজের ঘরে বিছানায়।

বিছানায় বসে তিতু হঠাৎ অনুভব করল, তার বুক যেন খালি হয়ে গেছে। কষ্ট হচ্ছে ভীষণ, কান্না পাচ্ছে, গলার কাছ পর্যন্ত কিসের এক দুঃখ এসে আটকে গেছে।

খানিকটা বসে থেকে তিতু বালিশের তলায় হাত বাড়াল। মার ছবি। চোখে দেখা যায় না। মনে দেখা যায় না। ছবির ওপরের কাচ তিতু হাতের আঙ্গুলে ঘষতে লাগল। টিপে টিপে রগড়ে রগড়ে। আর দমবন্ধ করা কান্না এবার ছুটে এল।

মা আজ আর আসবে না। স্বপ্নেও নয়। রাতটা নষ্ট হয়ে গেছে।

তিতু বালিশে মাথা রেখে পাশ ফিরে দাঁত দিয়ে বালিশের ঝালর কামড়ে কাঁদছিল।

পাঁচ.

'খেয়েছ কফি ?'

'অর্ধেকটা।'

'সবটা খেলেই পারতে।'

'ধ্যুর্—ব্ল্যাক কফি মানুষে খায়! ওআর্থলেস।' হেম টিপয়ের দিকে আড়চোখে তাকাল। কফির পেয়ালা প্রায় পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। দু' চুমুক খেয়েছিল; না খেলেও কিছু যেত আসত না। তপতীর ধারণা কড়া কালো তেঁতো কফি এক পেয়ালা খেলে নেশাটা কেটে যাবে হেমের। স্ত্রীর এই ছেলেমানুষী ধারণায় মনে মনে হেম কৌতুক বোধ করেছে। আজ এবং আগেও বহুবার। আজ হেম এমন কিছু বেশি মদ খায়নি যে ব্ল্যাক কফি খেয়ে ধাতে আসতে হবে। তেমন বেহুঁশ নেশা হেমের আজকাল কদাচিত হয়।......টিপয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল হেম সামান্য। কফির পেয়ালায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ল আঙুলের টোকা দিয়ে কৌতুক এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। সিগারেটটা আবার ঠোঁটে ছোঁয়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তপতীকে।

'আড্ডি সাহেবের বাংলোয় তোমরা ক'জন ছিলে ?'

'তিনজন........রায় আর আমি।' হেম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।

'অনেক খেয়েছ ?'

'অল্পই।........ভদ্রলোকের মতন।' হেম ঠোঁটে হাসল। এতক্ষণ একটু এলিয়ে শুয়েছিল বিছানায়, বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে। ছড়ানো পা গুটিয়ে প্রায় বসার মতন করে উঠে

বসল। কি ভেবে ঠাট্টা তামাশার গলায় বললে, 'তেমন জব্বর নেশা হলে আর বাড়ি ফিরতে হত না; এতক্ষণ হাসপাতালের বিছানায়।'

'তা একরকম সত্যি, যে ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলে—!'

'চালানোয় কোন দোষ হয়নি। হেম মাথা নাড়ল, হাত নাড়ল—'সে সব পারফেক্টলি ডান। দেখলে না, টানেলের মুখে রাস্তা সারাচ্ছে—অর্ধেকটা ব্লক···আর তার পাশেই অন্ধকারে এক রোলার···? ডেন্‌জারাস্‌····! টনটনে জ্ঞান না থাকলে ধাক্কা বাঁচানো ······' কথা আর শেষ করল না হেম; শুধু মাথা নেড়ে পরিণামটা বুঝিয়ে দিল।

অল্প একটু চুপচাপ। দুজনেই। তপতী নতুন করে কথাটা আর তুলতে চাইল না। হেম নিজেও জানে কী জোর আর বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে এসেছে আজ সে। কেন, তাও তার অজানা নয়। তপতীও বুঝেছে সব। এটা নেশা নয়। সবটাই শুধু আক্রোশ, রাগ, গায়ের জ্বালা। অবিশ্বাস, সন্দেহ, হিংসে।

হেমকে এক পেয়ালা ব্ল্যাক কফি খাইয়ে নেশা ঘুচিয়ে ধাতস্থ করা যায় না, তপতী তা জানে। হেম আজ তেমন নেশাও করেনি যে তটস্থ হতে হবে তপতীকে। সে-রকম কিছু না। সব জেনে শুনে বুঝেও তপতী আজকের বিশ্রী রকম কাণ্ডটার জন্যে হেমের নেশাকে দায়ী করছিল এটা নিছক ভাণ। অজিত দত্তর বাংলা থেকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার পর, গাড়িতে, এই বাড়িতে পা দিয়ে, ঘরে ঢুকে খাওয়ার টেবিলে যে সব কাণ্ড করেছে হেম—তার কোনোটাই নেশার জন্যে নয়। তপতী এমন ভাব দেখিয়েছে

যেন, স্বামীর বোধবুদ্ধি ব্যবহার কাণ্ডজ্ঞানের এই বর্বরতা স্নায়ুশৈথিল্য ; মাদক কারণে। আগাগোড়া, পুরোপুরি।

সব জেনে শুনে বুঝেও এই ভাণ দেখানোই সোজা। নিরাপদ। এর ফলে হেমের সাময়িক উত্তেজনা দুর্ব্যবহার উষ্মা জোর জবরদস্তি—সব কিছুকে এড়িয়ে উপেক্ষা করে থাকা যায়। নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তুমি কি করছো, কি বলছো—তাতে আমি কান দিচ্ছি না—দেওয়া পাগলামো : তপতী এই ধরনের মনোভাব দেখাবার চেষ্টা করেছে। না করলে ফল উলটো হত। তপতী জানে। অবস্থা আরও বিশ্রী হয়ে উঠত বৈ নয়। দত্ত-প্রসঙ্গ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে এখন দশ রকম কথা কাটাকাটি চলত। আর বাড়তে বাড়তে সেটা কোথায় গিয়ে যে থামত—কেউ জানে না।

যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলেই তপতী—ভুল পথে পা না বাড়িয়ে—একটা কুৎসিত অবস্থা এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

স্বামী-বিজয়ের সেই গর্ব এবং সুখ তপতীকে এখনও খুশী হালকা করে রেখেছিল। কিছু না, কত সোজা, কত তুচ্ছ—অথচ এই সামান্য তুচ্ছ ক'টা হাতে তোলা ফলই আছে যা দিয়ে স্বামীকে তপতী ভোলাতে পারে। হেমের চরিত্রের ভীষণ দুর্বলতা আর বিশেষ মোহটা কোথায় তপতী তা এত সঠিক ভাবে জানে যে হেমও হয়ত জানে না।

হেমকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ডাইনিং-টেবিলে বসে বসে তপতী যখন সব তোলাতুলি, পরিষ্কার, ঘরদরজা বন্ধ করাচ্ছিল মধুকে দিয়ে, তখন স্বামীর ওপর রাগটা প্রখর ছিল। একবার মনে হয়েছিল, হেমের এই অসভ্য কুৎসিত ব্যবহারের প্রতিশোধ সে নেবে। অপমানের জ্বালায় জ্বলে

যাচ্ছিল তখন। তিতুর চোখের সামনে যা করল তার বাবা—তারপর ওই ছেলের কাছে মান-সম্মান আর কতটুকু থাকল! কি বুঝল তিতু, কি ভাবল, কতখানি খুশী হল—তপতী ভাবছিল আর গা জ্বলে যাচ্ছিল হেমের ওপর।

রাগকে অবশ্য হু হু করে মাথায় চড়ে কাণ্ডজ্ঞান ভুলোতে দিল না তপতী। উত্তেজনার ব্যাপারে সে স্বভাবতই শান্ত। সহজে আবেগে ডুবে যায় না। ঝোঁকের মাথায় যা তা একটা কিছু করে বসে পরে হাত কামড়াবে—এ রকম বোকামি করে না। অন্তত বেশি করেনি।

রাগ আক্রোশ বিতৃষ্ণা বিস্বাদ ভাবটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে ফেলল তপতী। ওপর ওপর। এর পর ঘরে গিয়ে কি ভাবে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াবে, কি কৌশলে অবাধ্য উগ্র বদমেজাজী ক্ষিপ্ত মানুষটাকে আয়ত্তে আমবে—ভেবে নিল।

কফির পেয়ালা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। মধুকে বলে কফিটা আবার গরম করিয়ে নিল তপতী। ফ্লাস্কে ঢেলে রাখল। হেম হয়ত সঙ্গে সঙ্গে খেতে চাইবে না; রাগ না পড়া পর্যন্ত। ততক্ষণ গরম রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা।

মধু দরজা জানলা বন্ধ করে চলে গেলে তপতী উঠল। প্যানট্রির দরজার ভেতর থেকে বন্ধ করলে। ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে ডাইনিং-রুমের বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরে এল।

হেম বারান্দার দিকে দরজা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তপতীর পায়ের শব্দে নড়ল না, মাথা ঘুরিয়ে দেখল না একবারও।

ফ্লাস্ক রেখে তপতী পিছন থেকে স্বামীকে একটু দেখলে।

বাইরের হাওয়ায় গুটানো পরদা দোল খাচ্ছে, হেমের গায়ে এসে ঝাপটে যাচ্ছে, বাতাসের ধাক্কায় ফুলে উঠে সামনের দিকে সরে যাচ্ছে আবার। ঘরেব আলো হেমের পিঠ আলো করে রেখেছে।

তপতী স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। গায়ে গা দিয়ে ঘন হয়ে থাকল একটু, কথা বলল না। হেমও চুপচাপ।

তপতী আরও একটু চাপ দিল শরীরের; স্বামীর হাত টেনে নিল। 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ যে!'

হেম তাকাল না; কথাও বলল না।

'তোমার মাঝে মাঝে কি হয় বলতে পার?' তপতী স্বামীর মনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার মতন করে বলল। হাত টেনে নিয়ে বুকের কাছে ধরল।...হেম এবার ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীকে দেখল।

'এ-রকম পাগলামি যদি করো—' তপতী অভিমানের সুরে বলল, 'অযথা মিছিমিছি যদি এ-সব করবে তুমি—তা হলে একদিন—' কথা শেষ না করেই হঠাৎ থামল তপতী, এমন ভাবে থামল যে বাকি কথা বলতে যেন তার গলা বুজে আসছে। ক' মুহূর্ত চুপ করেই থাকল। তারপর চাপা অপরিচ্ছন্ন জড়ানো গলায়, বেদনা এবং হতাশার সুরে বাকি কথা শেষ করল, 'তা হলে একদিন দেখতেই পাবে, আমি কি করেছি।'

'কি করবে?' কথা বলল হেম।

'দিদি যা করেছিল। মরব।'

হেম চঞ্চল না হয়ে পারল না। তপতীর দিকে এক

নজরে খানিকটা তাকিয়ে থাকল। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। সুষমার মুখ দেখেও সে-দিন কিছু কি বুঝতে পেরেছিল হেম! কিছু না। সন্দেহ হয়নি সেদিনও। এ-সব ব্যাপারগুলো এমনি ভাবেই হয়। আগে থেকে বোঝাবুঝির বালাই থাকে না। কার মন তলায় তলায় কি ভাবছে, কি করছে বোঝা দুঃসাধ্য।...সুষমার ব্যাপারের পর হেমের একটা সাংঘাতিক ভয় দাঁড়িয়ে গেছে। এ এক রকম রোগই বলা যায়। কথাটা যেমন ভাবেই শুনুক হেম, অস্বস্তি বোধ ক'রে, ভয় পায়।

তপতীর সুন্দর স্তব্ধ আধবোজা চোখের দিকে তাকিয়ে হেম সত্যিই অস্বস্তি বোধ করল। 'মানুষকে প্যাঁচে ফেলার ওই একটা রাস্তাই তোমাদের জানা আছে।' হেম তপতীর কথা যে বিশ্বাস করেনি প্রাণপণে তা বোঝাবার চেষ্টা করল সাধারণ ভাবে কথাটা বলে। গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন ছিল না-ঘাঁটানো মনোভাব।

'জানাজানির কি আছে—। তুমি যদি এই রকম শুরু কর...অযথা...সকলের চোখের সামনে—' তপতী ক্ষুব্ধ, আহত গলায় বলল। স্বামীর ঘনত্ব থেকে আলগা হয়ে গেল আরও।

'আমার কথার জবাবটা দিলে বোধ হয় এ-সব কিছু হত না।' হেম ক্রমশই বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

'জবাব—! তুমি বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বাড়ি আসবে, মনগড়া যা ইচ্ছে ভাববে—আর আমায় তার জবাব দিতে হবে!...আশ্চর্য!'

'কাণ্ডজ্ঞান আমি হারাই নি।' হেম প্রতিবাদ করল।

'না, হারাও নি! তোমার সঙ্গে আমি আর ঘর করছি না পাঁচ বছর ধরে, আমি জানি না তোমায়?'

হেম হাল ছেড়ে দিয়ে হাত নাড়ল মাথা নাড়ল। তপতীকে আর বোঝানো যাবে না।

আড়চোখে স্বামীকে—স্বামীর মুখ ভাব লক্ষ্য করে মনোভাব অনুমান করবার চেষ্টা করল তপতী। খুশী হল। 'আমি তোমায় বলেছিলাম না, টেবিলে যেও না এখন। ঘরে খানিক শুয়ে থাক। কফি এনে দিচ্ছি খাও। নেশা কাটুক একটু··· তারপর—' তপতী ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'কানেই তুললে না। আর যা করলে ছেলের সামনে···ছি ছি।'

হেম বুঝতে পারছিল তার মনের কোথাও তপতী হাত বাড়িয়ে হাল ধরে ফেলেছে। নিজের মতন করে কিছু বলা কিছু করা আর হাতে নেই।

'তুমি আজ রাত্তিরে আমায় যা জিজ্ঞেস করেছ—কাল সকালে উঠে একবার মুখে এনো ত! হ্যাঁ, বলো একবার আমি দেখব···কেমন বলতে পার! পারবে না। কখখনো পারবে না। নিজের বউকে কোনো লোক ও-কথা বলতে পারে না।' তুমিও পারবে না।' তপতী এত পরিষ্কার গলায়, জোরের সঙ্গে, নিঃসন্দেহভাবে কথাগুলো বললে যে, হেমেরও মনে হল, কাল সকালে বাস্তবিকই কথাটা আর তার মুখে আসবে না।

চুপচাপ। দু'জনেই। হেম যেন লজ্জা এবং অস্বস্তির মধ্যে পড়ে চুপ হয়ে গেছে, আর তপতীও যেন স্বামীকে ভর্ৎসনা করার পর সহানুভূতি বোধ করে থেমে গেছে।

খানিকক্ষণ দু'জনে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। পরদাটা

বাতাসে তুলে তুলে ঝাপটা মারতে লাগল। বাইরের অন্ধকার থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। সর্ সর্ পাতার শব্দ।

হেমের হাত ধরে আচমকা নাড়া দিল তপতী। 'কি হল ?'

স্ত্রীর দিকে তাকাল হেম। কথা বলল না। যা ভাবতে চায় ভাবতে পারছে না, ঘোলাটে এলোমেলো মন।

'সাহেবের যেন রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে—' তপতী ঠোঁট কেটে অত্যন্ত মধুর ভঙ্গি করে হাসল। তরল, চমৎকার হাসি। খেলার ছলে হেমের হাত প্রথমে গলায় কণ্ঠার কাছে—তারপর বুকের ওপর টেনে নিল। চেপে ধরল। সামান্য হেলে পড়ল স্বামীর গায়। চিবুক তুলে আস্তে করে মাথা ঘষল হেমের গলায় থুতনিতে। 'রাগ হয়েছে ?'

'না রাগ কিসের—!' হেম স্ত্রীর নিশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছিল। খানিক আগেকার হেম এখন মরে গেছে। পুরোপুরি সেই কাঠিন্য, রূঢ়তা, জেদ, বিরক্তি, রাগ—আর এক ফোঁটাও অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

অস্থির জল শান্ত হয়েছে—তপতী বুঝতে পারল। তবু শেষবারের মতন সতর্ক হবার জন্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল, 'তুমি এমন ছেলেমানুষের মতন কাণ্ড কর যা পরে ভাবলে হাসি পায়। সত্যি হাসি পায়, দুঃখও হয়। মরব বলে ত তোমায় আমি ভালবাসিনি, বিয়েও করিনি।···কিন্তু যখন' · তপতী খুব জোরে—যেন কত কষ্ট তার, হ্যাঁ কী ভীষণ যন্ত্রণা এবং তীব্র ভালবাসা বোঝাবার জন্যে—হেমের হাত মুঠো করে অসম্ভব জোরে চেপে ধরল—'যখন এ-রকম বেয়াড়া সব কথা বল, কাণ্ড কর—বুঝতে পারি নেশায়

করছ—তবু, বিশ্বাস কর, সহ্য করতে পারিনা। এত লাগে, কষ্ট হয়—! আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। এর চেয়ে সুসাইড্ করা ভাল। তবু তাতে—'

হেম আর সময় দিল না, স্ত্রীকে ঘন করে জড়িয়ে ফেলল। যেন অনুতাপ জানাবার আর দ্বিতীয় কোন ভাষা তার নেই।

একটু সময় কাটল।

তপতীর ভয় কেটেছে। হেম আর পুরনো কথায় ফিরে যাবে না। তপতী নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। জায়গা মতন ফাঁস পড়েছে সে জানে। বাকি যা, এবার সেটুকু। ফাঁসটা টেনে নিতে হবে। আটকে ফেলতে হবে।

'রাত হচ্ছে কিন্তু—' তপতী বলল।

'হুঁ—।'

'সর, দরজা বন্ধ করে দি।' স্বামীকে সরিয়ে তপতী বাইরের দরজা বন্ধ করল। ওপরের ছিটকিনি তুলতে তুলতে বলল আবার, 'তোমার কফি এনে রেখেছি, খাও বসে বসে। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

'কফি ?'

'আহা, আকাশ থেকে পড়ছ যেন!' তপতী ঘরের মধ্যে এসে তাকাল ফ্লাস্কের দিকে। ফ্লাস্ক এনেছে। পিরিচ পেয়ালা আনতে ভুলে গেছে। ধুয়ে ঠিক ঠাক করে ডাইনিং-টেবিলেই রেখেছিল, আসবার সময় খেয়াল করতে পারে নি।

ঘর ছেড়ে চলে গেল তপতী। ড্রয়িংরুম ডাইনিংরুম কোনো ঘরেরই বাতি জ্বালল না। প্রয়োজন হয় না। অন্ধকারেও অভ্যস্ত সব। সোফায় হোঁচট না খেয়ে, দরজায় কপাল না ঠুকেও তর তর করে চলে যেতে পারল তপতী।

টেবিল থেকে পেয়ালা পিরিচ ওঠাল—কোনো অসুবিধে হল না—হাতটা শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় একবার বুলিয়ে নিতেই পিরিচের কানা ঠেকল হাতে। (তিতু অন্ধকারে মাসির আসা যাওয়ার শব্দ শুনেছিল)।

ফিরে এল তপতী। হেম বিছানায় বসে। আলো দেখছে, দেওয়াল দেখছে।

কাপে কফি ঢেলে ছোট টিপয়ের ওপর রাখল তপতী। স্বামীর কাছে এগিয়ে দিল। খুব নরম, সুন্দর, গার্হস্থ্য ছবিটা ফুটছিল এই সব আচরণে। হেম দেখছিল। ভাল লাগছিল তার।

'নাও, কফি খাও বসে বসে। আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

'খেতেই হবে কফি ?'

'হবে।' তপতী দাম্পত্য শাসন আর ধমকের গলায় বলল। বলে কি একটু ভাবল, স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। হেম খুশী চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের অর্থপূর্ণ একটা হাসি হাসল তপতী, ভ্রূভঙ্গি করল, 'না-খেয়ে দেখ—কি করি—তখন হাজার খোসামোদ করলেও আজ আর কিচ্ছু হবে না।' দাঁড়াল না আর তপতী। এর পর এক মুহূর্ত দাঁড়ালে, একটা কথা বললে, তপতী জানে—এই মায়া-রহস্যের ঘনত্ব ফিকে হয়ে যাবে। তপতী চলে গেল বাথরুমে। যাবার আগে বড় বাতি নিভিয়ে, ড্রেসিংটেবিলের ওপরে টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে গেল।

লক্ খোলা আর হাতল ঘুরোবার মৃদু সুন্দর শব্দ। বেরিয়ে এল তপতী বাথরুম থেকে।

'বৃষ্টি হল, তবু আজ যেন কি রকম; এত ঘামছি—। তোমার কি, বেশ আছ—ঘাম টামের বালাই নেই।'

হেম স্ত্রীকে দেখছিল। মুগ্ধ হয়ে, অপলকে। কোঁচ দেওয়া, ফুলো মসৃণ গোলাপী রঙের রেশম-সায়া। পায়ের গোড়ালি ঢেকে লুটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পায়ের কাছটায় বর্ডার লেস, চমৎকার নকশা, মিহি রেশমী সুতোর জাল। গায়ে সাদা চওড়া বড় টার্কিস তোয়ালে। নাভি, বুক, কাঁধ ঢেকে ছড়ানো। দুটি প্রান্ত কাঁধের দু'পাশ থেকে পিঠে গিয়ে পড়েছে।

চটির পাতলা শব্দ তুলে তপতী ড্রেসিংটেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'বৃষ্টি হল, ঠাণ্ডা—তবু যেন আজ কি রকম; এত ঘামছি—। তোমার কি, বেশ আছ—বালাই নেই—।' ট্যালকম্ পাউডারের কৌটোটা তুলে নিল তপতী।

'না,' মাথা নাড়ল হেম। 'তুমি ঘামছ, আমি পুড়ছি।' হেম জোরে হেসে উঠল। আনন্দে, খুশীতে, প্রত্যাশায়, আবেগে। হেমের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঠোঁটে নিশ্বাসে জ্বালা জ্বালা ভাব।

(তিতু বাবার এই হাসি শুনেছিল)

তপতীর আর কোথাও এতটুকু ভয় নেই। স্বামীকে অনায়াসে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। এখন আর হেমের সাধ্য নেই দত্তর কথা তোলে, সন্দেহ আর ঈর্ষায় অমানুষ হয়ে ওঠে। এখন হেম পুতুল। তপতীর শরীরের লোভে অক্ষম মানুষ। কাতর, প্রত্যাশী, বিহ্বল হেমের চোখে মনে চেতনায় তপতীর দেহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব আর নেই।

তপতী খুশী হল। গব বোধ করল। যে জালে স্বামীকে বেঁধে ফেলতে চাইছিল তপতী, সেই জালে বাঁধা পড়েছে হেম। ফাঁদ পাতার আগে সামান্য সন্দেহ ছিল, এখন না ভয়, না দুশ্চিন্তা। তপতীর সুখের অনুভূতিটা এখন শত্রুজয়ের মতন। সামান্য যেন নিষ্ঠুর, উগ্র, গর্বিত এবং খেয়ালী। যা খুশি, যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে তপতী, হেমকে বাধ্য করাতে পারে সেই মর্জির আগুনে কয়লা জুগিয়ে দিতে।

ঝগড়াঝাটি কথা-কাটাকাটি খেয়োখেয়ি করে কতটুকু মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারত তপতী কে জানে—হয়ত সে হারত, হয়ত স্বামীর দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরও আহত হত—তার চেয়ে এই ভাল। এখানে হারল না তপতী। জিতেছে। এও এক রকম প্রতিশোধ। তপতী ভাবল। মনে মনে হাসল।

আস্তে করে বিলিতি ক্রিমের শিশি খুলে আঙুল ডুবিয়ে সামান্য ক্রিম তুলে নিল তপতী। গালে, কপালে, চিবুকে চন্দনের ফোঁটার মতন দিতে দিতে বলল, 'খেয়েছ কফি?'

'অর্ধেকটা।'

....পুরনো কথা তপতী আর তুলল না। গাড়ি ঠিক ভাবেই চালিয়েছে হেম। টনটনে জ্ঞান তার ছিল। তপতী সব জানে, ভালো করেই জানে। তবু ব্ল্যাক কফি খাওয়ানোর দরকার পড়েছিল কেন তার, হেম তা বুঝবে না। এখন অন্তত আর বোঝার চেষ্টাও করবে না।

পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে এসেছিল সিগারেট, আঙুলের নোখে চিনচিনে তাত লাগল। পাশেই অ্যাসট্রে, তবু কফির পেয়ালায় টুকরোটা ফেলে দিল হেম। উঠে দাঁড়াল।

ড্রইংরুমের দিকে দরজা খোলা। জানলা দিয়ে ছুটে-এসে মুখ-থুবড়ে-পড়া দমকা বাতাসে পরদার একটা পাশ সামান্য উড়ে গেল, তারপর একপাশ থেকে আর-একপাশে ছোট ঢেউ ভেঙ্গে গিয়ে আস্তে আস্তে কাঁপতে লাগল। আয়নার কাচে খোলা দরজা আর পরদা ওড়া দেখতে পেল তপতী। হেম কাছে এসেছে। আড়াল পড়ে গেল দরজা।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' তপতী বলল; এমন ভাবে, যেন এটা তার খেয়াল ছিল না—এবং দরজাটা খোলা থাকা আর উচিত নয়।

হেম এগিয়ে আসছিল; দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করতে ফিরে গেল।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল হেম। তপতীর পিঠ ঘাড় মাথা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আয়নার কাচের গায়ে আবক্ষ ছবির খানিকটা।

হেম প্রায়-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক'পলক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল।

ড্রেসিংটেবিলের একপাশে টেবল ল্যাম্প; ফুলের গড়নের। ফোটা পাপড়ির মতন শেডের কানা ঢেউ খেলানো। ল্যাম্পটা এমন ভাবে ঘাড় তোলা যে, তপতীর মুখে কপালে গলায় তার সবটুকু উজ্জ্বলতা ঢেলে দিয়ে ফুরিয়ে গেছে। মাথা ডিঙিয়ে আর আলো আসতে পারছে না; সামান্য একটু আভা যা। ঘাড় গলা গায়ের পাশ দিয়ে ফিকে আলো সামান্য ক'পা এগিয়ে এসে ম্লান হয়ে মেঝের অন্ধকারে মিশে গেছে। তারও পিছুতে প্রায় অন্ধকারই হয়ে আছে ঘর।

হেম এবার যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখানে ম্লান আলো আর মেঝের অন্ধকার মিশে যাচ্ছে।

আয়নায় স্বামীকে দেখতে পেল তপতী। মুখ নয়; পেট, বুক আর গলার খানিকটা। হেমের গায়ে ঘুমোবার জামা—চওড়া-ফিতের মতন নক্‌শা করা ছিটের। কাপড়টা মোলায়েম। বুকের কাছে বোতামটা লাগানো, বাকিগুলো খোলা। কনুইয়ের তলায় হাত দেখা যাচ্ছে। হেম আরও একটু সরে এলে, তপতী আয়নায় স্বামীর কোমরের একটু তলা থেকে প্রায় হাঁটুর নীচে পর্যন্ত দেখতে পেল। সাদা পায়জামা। তপতীর চোখে সাদা রঙটাও কেমন খসখসে মনে হল এখন।

টেবিল থেকে নরম ছোট্ট চুলের ব্রাশ তুলে নিল তপতী। টেনে ঝুঁটি করে বাঁধা চুল। কপাল একটু বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। সিঁথি নেই, টান টান চুলের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মাথার পিছনে চুলের গোড়ায় শক্ত করে রিবন বাঁধা। রিবনের গিঁট থেকে একরাশ খাটো চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে ঝালরের মতন। ফোলানো, ফাঁপানো, কোঁকড়ানো চুল।

ব্রাশ তুলে তপতী পিঠের চুলের এক ভাগ ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের সামনে টেনে নিল।

হেম আরও একটু এগিয়ে তপতীর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ছেলেখেলার ভঙ্গিতে তপতী চুলে ব্রাশ টানতে টানতে হাসল। আয়নার দিকে চেয়ে ভুরুর ওপর চোখ ঠেকিয়ে স্বামীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল। চিবুক দেখা যায়; তার বেশি চোখে পড়ে না। তপতীর খুব একটা উৎসাহ নেই।

স্বামীর মুখ এ-সময় কেমন দেখায়—তপতী জানে। খুব ভাল করে। যে কোনো সময় ইচ্ছে করলেই কল্পনা করে নিতে পারে।

অলস হাতে চুলের আগায় ব্রাশ টেনে একমুঠো পশমের মতনই আবার কাঁধের পাশে ছুঁড়ে দিল তপতী। মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড় থেকে চুলের গুচ্ছ পিঠে টেনে নিল।

ডান কাঁধ থেকে তোয়ালে সরে গেছে। শুকনো তোয়ালে। তপতীর হাত নাড়া গা নাড়াতে আগেই খসে পড়ার মতন হয়ে ঝুলছিল।

তপতী তোয়ালেটা আবার টেনে কাঁধে তুলে নিতে যাচ্ছিল; হেমের হাত তার আগেই কাঁধে এসে পড়েছে।

হাতটা কাল। খুবই কাল। চওড়া, শক্ত, মোটা। প্রচুর লোম। তপতীর কাঁধে শক্ত হাত নরম হবার চেষ্টা করছে—তপতী অনুভব করতে পারল। হেমের শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখন কি ভাবে কথা বলতে চায় তপতী জানে, ভালো করেই জানে।

স্বামীর মুখ এবার দেখতে পেল তপতী। আয়নাতে। চোখ খুব উজ্জ্বল। মনে করা যেতে পারে, জ্বলছে। লোলুপ। তপতী স্বামীর এই দৃষ্টির সব রকম জ্বালা আর রহস্য বোঝে।...দু'এক পলক তাকিয়ে থাকল তপতী। তারপর চোখের তারা মোলায়েম করে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখল।

নিজের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের আগায় দাঁত বসিয়ে একটু হাসল তপতী। মাথা সামান্য হেলিয়ে দিল পিছুতে; হেমের বুকের তলায়। চাতকপাখির মতন গলা করে স্বামীকে এবার সরাসরি দেখতে চাইল।

হেমের চোখে এই-রকম সময় কেমন একটা ভয় ভয় ভাবও থাকে! যেন কি একটা অপরাধ করছে। কেন? তপতীর খেয়াল হল কথাটা। স্বামীকে দেখল ভাল করে। চোখ জ্বলছে, পুড়ে পুড়ে জ্বালা করছে, ছটফট করছে—তবু এই নির্দয়তা এবং জ্বালার মধ্যে অদ্ভুত এক চাপা অস্বস্তি এবং ভয়ের ভাবও আছে।

হেমের মুখ মাথা আরও নিচু হয়ে এসেছে। তপতীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে অর্ধেকটা শরীর। হাত গড়িয়ে গেছে। তপতী স্বামীর শরীরের খানিকটা চাপ অনুভব করতে পারছে।

'বাতিটা নিভিয়ে দি।' তপতী মৃদু গলায় বলল।

'থাক, জ্বলুক।'

'উঁহু—'তপতী স্বামীর সেই ভয় ভয় অস্বস্তি ভরা মুখের কথা ভাবছিল। অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাই না: মনে মনে ভাবল তপতী।

'চলো—শুই।' হেমের হাত আস্তে করে গা থেকে সরিয়ে তপতী উঠল। বাধা পেল না।

হেম হাত বাড়িয়ে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার টানল। অডিকোলনের শিশিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছিপি খুলে হাতে মাখল খানিকটা হেম। তপতীর গায়ে বাকিটা ঢেলে দিল। হেম হাসছে। অডিকোলনের গন্ধ উঠেছে। বাতাস একটু সুঘ্রাণ হয়ে উঠল।

হেম অডিকোলন খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে এখন। তপতী জানে। পর পর কি ঘটবে এবার, তপতী তাও জানে; গাঁথা সিঁড়ির মতন সব ঠিক হয়ে রয়েছে। তপতী মনে মনে এক মুহূর্তে সব ক-টা সিঁড়িতে পা দিয়ে একেবারে শেষ ধাপে

গিয়ে দাঁড়ায়।....তারপর—? তারপর অন্ধকার। আর কিছু নেই। হেম বালিশে মাথা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের নিশ্বাস শান্ত মৃদু।

তপতীর আচমকা খেয়াল হল, হেম হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে ওকে। হল্‌কার ভাবটা অনুভব করতে পারল তপতী। হেমের হাত মুখ বেশ গরম। তার জামার তলায় যে অস্বাভাবিক গাত্রতাপ—তপতী তাও অনুভব করতে পারছিল। হাত আর আঙুল দিয়ে জড়িয়ে পেচিয়ে মানুষটা যেন তপতীকে নিজের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চাইছিল। কাঁধে, ঘাড়ে, গলায় অস্থির অধৈর্যের মতন চুমু খাচ্ছে।

অডিকোলনের গন্ধ পচ্ছিল তপতী। হেমের অডিকোলন মাখা হাত আগুনে পুড়ে যাচ্ছে যেন। তপতী বুঝতে পারল, পিঠের দিকের ব্রেসারির হুক খুলে গেছে। হেমের আঙুল খুব রুক্ষ শক্ত।

হেমকে একটু ঠেলে সরিয়ে ঘন আলিঙ্গন থেকে সামান্য আলগা হল তপতী। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। ড্রেসিংটেবিলের ওপর ডিম-রঙের খানিকটা আলো এতক্ষণ মুখ তুলে বসে ছিল, এবার দৌড়ে পালাল। অন্ধকার। প্রথম অন্ধকারের ঝাপটা ঘুটঘুট করে উঠল চোখের সামনে।

বিছানায় আসতে আসতে তপতী বলল, 'তোমার কি যে ওই এক অডিকোলন মাখা···বিশ্রী লাগে আমার।'

নরম মোলায়েম বিছানায় বসে পড়েছে তপতী। পা ঝুলিয়ে। চটিটা খুলে গেছে পা থেকে। হেম সামনা

সামনি দাঁড়িয়ে। তপতী দেখতে পারছে না, বুঝতে পারছে। তার হাত খুঁজছে হেম।

'অডিকোলন তোমার ভাল লাগে না?—আমার খুব ভাল লাগে। কুলিং রিফ্রেশিং···চমৎকার একটা মেডিকেটেড ভাব আছে।' তপতীর দু'হাত নিজের কোমরের দু-পাশ থেকে টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে হেম।

'তা হলে আর কি, ঘরটাকে হাসপাতাল করে ফেল—' তপতী অপ্রসন্ন গলায় বলল। স্বামীর পেটের কাছে মুখ লেপটে রয়েছে। কথাটা কতখানি স্পষ্টভাবে ফুটল তপতী বুঝতে পারল না। আচমকা আবার বলল, মুখ সরিয়ে, 'এই বিদ্‌ঘুটে গন্ধ শুঁকলে আমার মরার কথা মনে পড়ে। মরার খাটে শিশি শিশি সস্তা অডিকোলন ছড়ায় লোকে।'

হেম শুনল। বেশ স্পষ্ট ভাবেই পুরো কথাগুলো শুনতে পেল। ক' মুহূর্ত তপতীর কাঁধে পিঠে তার হাত দুটো অনড় হয়ে পড়ে থাকল। যেন তপতীর শরীরটা মৃত না অ-মৃত অনুভব করবার চেষ্টা করল একবার।

'এখন ও-সব বাজে কথা ছেড়ে দাও।' হেম কেমন যেন বিরক্ত, অধৈর্য। বেখাপ্পা বেয়াড়া আলোচনাটা উড়িয়ে দিতে চাইল হেম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

তপতীর পাশে বিছানায় বসে পড়ল হেম। তপতীর গা ঘেঁষে, ঘন হয়ে। স্ত্রীকে জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকল একটু। কাঁধে আস্তে করে দাঁত বসিয়ে কামড় দিল। চুমু খেল। চুলের গুচ্ছ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুড়সুড়ি দিল। ঘাড়ে চিবুক রগড়ে হাসল একটু। স্ত্রীর বাহুর তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

তপতীর খেয়াল হল, রাত অনেক হয়েছে। হেম এখন নতুন এক ধরনের নেশায় আচ্ছন্ন, তপতী যে-ধরনের নেশা চাইছিল স্বামীর কাছে, যে-ধরনের মাদকতার জন্যে তাকে এই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হয়েছে।....আর একটু পরেই হেম ঘুমিয়ে পড়বে। কাল আবার নতুন মানুষ।

হেমের বুকের ওপর নরম শিথিল হাতের সামান্য আদর ফেলে তপতী মাথা সরিয়ে নিল। খেলার ছলে আঙুলগুলো অন্য কোথাও আড়াল হয়ে গেছে। মসৃণ মোলায়েম পা হেমের পায়ে ঘষল একটু, যেন পায়ের পাতা শিরশির করে উঠেছে আচমকা।

'তুমি আজ একটা খুব অন্যায় কাজ করেছ।' তপতী বলল; খুব সাধারণ ভাবে শুরু করল কথাটা।

হেম জবাব দিল না। অন্যায়টা বুঝতেই পারছিল। তপতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার।

'এ-রকম করলে তিতুর কাছে আমার মান মর্যাদা সম্মান বলে কিছু থাকবে না।' তপতীর গলায় ঈষৎ অভিযোগ এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হেম এবারও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। ক্রমশ নীরবতাটা তার নিজের কাছেই অশোভন এবং কটু লাগল। তপতী অসন্তুষ্ট হবে, হচ্ছে....মনে হল হেমের। 'হ্যাঁ— একটু খারাপই হয়ে গেছে।' হেম সংকোচ অস্বস্তির সঙ্গে অগোছালোভাবে বলল। যেন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে স্ত্রীর কাছে।

'আমি খুব চটে উঠেছিলাম।' তপতী বলল; অসন্তোষ, উষ্মা, ক্ষোভ এবং অভিযোগ স্পষ্ট; অনেকটা তীব্রও।

'তোমার ব্যবহার আর কথায় বার্তায় ও কি মনে করল একবার ভাববার চেষ্টা কর।....এরপর আর আমায় সে গ্রাহ্য করবে না। বাবা যখন মারছে ধমকাচ্ছে গালাগাল দিচ্ছে তখন আর কি—মাসি একটা ফেলনা মেয়ে—ঝি কি আয়া হবে এ-বাড়ির।'

'আমি তোমায় মারি নি।' হেম অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বাধা দিল। আপত্তি জানাল।

'ওকেই মারা বলে। বরং মারার চেয়েও খারাপ।' তপতীর গলার স্বর, বলার ভঙ্গি একেবারে পালটে গেছে। এখন যেন মনে হচ্ছে, স্বামীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে একটা চূড়ান্ত রকম বোঝাপড়া করতে বসেছে তপতী। 'তুমি আমার গালে একটা থাপ্পড় মার নি—কিন্তু যদি মারতে আমি কি করতাম! কিছু না। তিতু দেখত বসে বসে।'

'যা হয় নি তাই নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' হেম অসহায়ের মতন বলল।

'কিছু কমও হয়নি; আর যেটুকু আজ হয় নি—সেটুকু কাল হবে। কে বলতে পারে।'

'না, না—আর কিছু হবে না।'

'তোমার কথা—!' বিষণ্ণ, হতাশ, অবিশ্বাসের সুর তপতীর গলায়। একটু চুপ। আবার বলল, 'কী ভীষণ খারাপ নোংরা কথা তুমি বলেছ মনে করে দেখ।'

'কি?'

'মনে পড়ছে না?'

'রাগের মাথায় কি বলেছি তখন...'

'যে মাথায় হোক্ তাতে আসে যায় না। তুমি নেশার

মাথায় বলেছ—' তপতী মনে মনে এখানে থামল, ভাবল : স্বামী নেশা করে পাগলের মতন কি না কি বলেছে—তপতীর তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই—এই কথাটাই খানিক আগে পর্যন্ত স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে সে, এখন কিন্তু ঠিক উলটো।

কথা তুলে নিজের কথায় নিজেই জড়িয়ে গেছে তপতী। এখন সাবধানে এগুতে হবে। গলার স্বর সামান্য কোমল এবং নিচু করে বলল তপতী, 'আমি বুঝতে পারছি নেশার ঝোঁকেই আজে বাজে কথা বলেছ—কিন্তু তা হলেও কথা থাকে। দিদির আমার আমাদের সকলের একই রক্ত এ-কথা বলায় মানে কি? তুমি খারাপ খুব নোংরা ভাবেই বলেছ কথাটা।'

হেম বুঝতে পেরেছিল আগেই। কথাটা যে খারাপ এবং নোংরা সে-বিষয়ে তারও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এর জবাব কি দিতে পারে হেম! বিব্রত বোধ করছিল। কথা চাপা দেওয়ার গলায় বলল, 'যেতে দাও ও-সব কথা··· প্লিজ! বোধহয় সত্যিই নেশায়—' কথা আর শেষ করল না হেম।

'সব কথা বাদ দেওয়া যায় না।' তপতী বলল, স্বামীকে বোঝাচ্ছে এমন ভাবে, 'ওই কথার পর তিতু কি ভাববে এবার একবার ভেবে দেখ। হাজার হোক সে আর ছোট ছেলে নয়। সব বোঝে। ওর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বোঝে। তা জানো?'

'এ-সব সে কি বুঝবে? লেখাপড়ার কথা হলে না হয়—'

'এমনিতেও তোমার ছেলে যথেষ্ট বোঝে। কেমন ছেলে দেখছ না! বিন্দুর ভিজে কাপড় ছাড়ার সময় হ্যাংলার মতন

গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে !....রীতিমত শাস্তি পাওয়া উচিত ওর এ জন্যে।'

'যেমন মা!' হেম নিজেই বুঝতে পারল না সে কি বলল, কি বলছে।

আশ্চর্য, এবার আর তপতী আপত্তি করল না। 'কিন্তু তোমার ছেলে।—'

হেম হঠাৎ কেমন রেগে উঠল। যেন এই আলোচনার কটু কুৎসিৎ ঝাঁজ তার নিশ্বাস বিষিয়ে দিয়েছে। মাথা খারাপ করে ফেলেছে। অদ্ভুত একটা আক্রোশে খেপে উঠল। বিশ্রী এক জ্বালা তার গলায়, 'আমার ছেলে ও নয়। তোমাকে আমি হাজারবার বলেছি।...সেই সোয়াইন ডাক্তারটার... চৌধুরীর....তোমার দিদির লভারের ছেলে ও।'

অদ্ভুত একটা নীরবতা সহসা যেন বিছানা আর ঘর আর অন্ধকারে মেঘের মত পুরু হয়ে জমে উঠল। অনুভব করা যায়। ভয় হয়। বিশ্রী এক অস্বস্তি আর কষ্ট।

'আমি কি করব—' হেম বিছানা থেকে উঠে বসে অস্থির-ভাবে হাত নেড়ে কথা বলছে মনে হল, 'কি করবো আমি বলো? এখানকার শহর সুদ্ধু লোক জানে ও আমার ছেলে। আই ক্যান নট্ কিক্ হিম আউট অফ দি হাউস! আমার প্রেষ্টিজ আছে—পজিসন আছে....কি ভাববে লোকে? আফটার অল ওই রোগা ফরসা রাস্কেলটা একটা শো। শো অফ্ এ সন।—' হেম জানত না তার গলা কত উঁচুতে চড়েছে, বুঝতে পারে নি তার আক্রোশ আর অসহায়তার আর্তনাদ এই স্তব্ধ অন্ধকার ঘরে কী ভয়ংকর হয়ে বাতাসে ভেঙ্গে পড়েছে!

তপতী কোনো কথা বলল না। স্বামী পাশে আছে কি নেই হাত বাড়িয়ে দেখল না। সে সাহস তার নেই। হেম এক এক সময় এমন হয়ে ওঠে যখন তপতী সত্যিই ভয় পায়। এখন তার ভয়ই হচ্ছিল। অন্ধকার তাকে বাঁচিয়েছে। আলোর মধ্যে স্বামীর এখনকার চেহারা দেখলে তপতী এ ঘরে থাকতে পারত না। স্বামীর সেই-চেহারা যে কী রকম ভয়ংকর কদর্য উন্মাদ হয় তপতীর দেখা আছে।

অনেক্ষণ চুপচাপ কাটল। কেউ কোনো কথা বলল না। বাইরে আবার এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে মনে হল। দূরে রেললাইন দিয়ে একটা মালগাড়ি যাবার শব্দ ভেসে এল। গ্রেগারীর বাংলোয় কুকুর দুটো ডাকছে।

ছয়.

ঘুমোয় নি হেম। অস্পষ্ট একটা আচ্ছন্নতা চোখ জুড়ে রয়েছে। বাঁ হাতের তালু থেকে অডিকোলনের ফুরিয়ে আসা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মাঝে মাঝে একটু ঘন হয়ে উঠছে গন্ধটা, ফিকে হয়ে আসছে আবার।

সুষমাকে মনে পড়েছিল হেমের। মাথায় একটু খাটো, সেলুলয়েডের পুতুলের মতন পরিষ্কার ছাঁচে ঢালা মুখ, গোলগাল চেহারা, আধ ফরসা রঙ। সুষমার গাল গলা আর নাকের ঢঙে কেমন একটা নরম আদুরে ভাব ছিল। চোখ আর ঠোঁটে শান্ত মৃদু একটু হাসি, প্রায় সব সময়। যেন অনেক কষ্টে তৈরী করে নিয়েছিল, পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, চেষ্টা করেও যা আর মুছতে পারে নি।

এখানকার কারখানার হাসপাতালে নার্স ছিল সুষমা।

সিনিআর নার্স। হেমের সঙ্গে জানাশোনা ছিল না। রাস্তা ঘাটে মুখ দেখেছে।

ভাগ্য তাকে সুষমার কাছে টেনে এনেছিল। ওয়ার্কশপে কাজ করতে করতে বড় রকম একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে গেল। হেমের বাঁচার কথা নয়, গলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তখন বাঁচবার জন্যে কি করেছিল হেম—পরে কোনদিনই ভালভাবে বুঝতে পারে নি। বাঁচতে গিয়ে জখম হয়েছিল। বেশ জোর জখম। মাথার খুলি ফেটেছিল. হাড় ভেঙেছিল বাঁ হাতের; হাঁটু, গোড়ালি, শিরদাঁড়া—মোটামুটি প্রায় গোটা শরীরটাই চোট পেয়েছিল কম বেশি।

হাসপাতালের বিছানায় ছ' মাস একটানা শুয়ে, পরে আরও মাস দেড়েক শুয়ে-বসে বাঁধা ধরা পা ফেলে হেঁটে বেশ তোয়াজে কাটাতে হল। সুষমার সঙ্গে পরিচয় তখন থেকে। প্রথম দিকে, যখন হেম বাঁচবে কি বাঁচবে-না জানা ছিল না, সুষমা তার সেবা করেছে। অভ্যস্ত চাকরি রাখা সেবা ঠিক নয়। তার বেশী। হয়ত হাসপাতালের বড় ডাক্তার দাশের মতন তারও রোখ পেয়ে বসেছিল—, হেমকে বাঁচাতে হবে। মৃত্যুর সঙ্গে সে এক রেষারেষি, লড়াই। হেমের জীবনের আরও একটু বিশেষ মূল্য ছিল। ইঞ্জিনিয়ার থেকে জি, এম,—সবাই তটস্থ হয়ে পড়েছিল। কিছুটা স্নেহবশত, বেশিটা কোম্পানীর ঘাড়ে মামলা ঝুলে পড়ার ভয়ে। এই দুর্ঘটনায় হেমের যত না দোষ ছিল তার বিশগুণ দোষ ছিল কোম্পানীর। কাজেই হেমকে নিয়ে হাসপাতালে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল।

সুষমা সে-বাড়াবাড়িতে প্রত্যক্ষ ভাবে না থাক, পরোক্ষে ছিল হয়ত। কিন্তু আসল কথা ওটা নয়। হেম যখন খানিক সুস্থ, তখন সুষমাকে একটানা কাছে পাওয়া যেত না। অন্য নার্স সেবা করত, সুষমা তদারকি করতে আসত মাঝে মাঝে।

হেম সেই প্রথম একটা অভাব এবং আকর্ষণ বোধ করল। সুষমাকে সে চাইত। সুষমা ঘরে থাকলে খুশী হত, আনন্দ পেত, কথা বলত অজস্র, হাসত।

শেষ পর্যন্ত সুষমার ওপর কেমন একটা দাবী তৈরী করে ফেলল হেম। তার ঘরেই সুষমাকে থাকতে হবে ডিউটিতে। সে কি দিনে কি রাত্তিরে। সুষমা বলত, বা, এ কি হয় নাকি ; আপনার কেবিনে আমার ডিউটি না থাকলে আমি আসতে পারি না।

'ডিউটি অ্যারেঞ্জ করে নাও সেই ভাবে।'

'মাথা খারাপ নাকি আপনার!'

'কেন? ডাক্তার দাশকে বললেই হয়।'

'আমি বলতে পারব না।'

'আমি বলব।'

'না।'

'কেন নয়? আমি পেশেণ্ট ; আমার দরকার আমি জানাব না? তোমার কি, তুমি ত আর বলছ না।'

হেম জেদি একগুঁয়ে অবুঝ একরোখা মানুষ, লজ্জা বা মান সম্মানের সূক্ষ্ম বাধাটা বুঝতে পারে নি, বা বুঝলেও গ্রাহ্য করে নি। সে-গরজ ছিল না একটুও। সুষমাকে জোর জবরদস্তি করে যতদিন পেরেছে নিজের কেবিনে আটকে

রেখেছে। ডাক্তার দাশকে বলেছে, মজুমদারকে বলেছে, মেট্রনকে ধমক দিয়েছে।

একদিন···সে-ঘটনার কথা নিয়ে পরে সুষমা হাসাহাসি করত। হেম অবশ্য অপ্রস্তুত হত না, বরং খুশী হত। ঘটনাটা ভোলার মত নয়। মনে আছে। সুষমার নাইট-ডিউটির হপ্তা শুরু। হেমের ঘরে কোনো নার্স নেই। প্রয়োজনে আসবে। প্রায় বারোটা পর্যন্ত অধৈর্য ভাবে অপেক্ষা করেও হেম দেখল সুষমা এল না। বেড্ ছেড়ে উঠে পড়ল হেম। করিডোর দিয়ে সোজা নার্সদের রেস্ট্-রুমের কাছে হাজির। দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ। শীতকাল। চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে সুষমা ঢুলছে। আর কেউ নেই। প্রথমে টোকা মারল দরজায় হেম। সাড়া নেই। ধাক্কা দিল। মুখ তুলে তাকাল সুষমা। হাত নেড়ে ইশারায় ডাকল হেম, সুষমা উঠল না।

খেপে উঠল হেম আচমকা। বেপরোয়া ভাবে জানলায় এক ঘুঁষি মারল। দু-সার কাচের কয়েকটা ফেটে গেল, চিড় খেল, একটা চৌকো কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ঘরের মেঝেতে। হাত কাটল কি কাটল না নজর করল না হেম।

সুষমা বিমূঢ়, বিহ্বল। কি করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। হেমের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

খানিক পরে সুষমাকে আসতে হল হেমের কেবিনে। গম্ভীর, বিরক্ত। প্রথমে হাতটা দেখল। কাটে নি। আঙুলের দু' এক জায়গায় ছড়ে গেছে। আয়োডিন ঘষে দিতে দিতে সুষমা বলল, 'কাজটা আপনি খুব অন্যায় করেছেন।'

'মোটেই না। আমার কাছে লোক থাকা দরকার।'

'সেটা বিবেচনা করবে হাসপাতাল।'

'রাখো তোমার হাসপাতাল। আমার দরকার পড়েছে আমি ডাকব।'

'একজন সিস্টার ডিউটিতে আছেন এদিকে। তাঁকে ডাকলেন না কেন?'

'ও কিচ্ছু জানে না। ওআর্থলেস....।'

সুষমা চুপ। সুষমা সব জানে, বোঝে—তবু অনর্থক কথা কাটাকাটি করছিল এতক্ষণ। হেমের এই একরোখামি জোর-জবরদস্তির ওপর কথা বলা যায় না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুষমা বলল, 'আমার ডিউটির বাইরে আমি কিছু করতে পারব না। এখানের তা নিয়ম নয়। আপনার কি দরকার বলুন, আমি মিনতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'তোমার কি ঘুমোবার ডিউটি?' হেম গম্ভীর মুখে শুধলো।

'আপনার তা দেখার দরকার নেই।' সুষমা চটে উঠল। চলে যেতে যেতে বলল, 'যা কেলেংকারি করলেন আজ—কমপ্লেন উঠলে আপনাকে হাসপাতালে আর রাখবে না। আমারও চাকরি যাবে।'

'সুষমা—!' হেম স্থান কাল সময় ভুলে চিৎকার করে উঠল।

সুষমা দাঁড়াল। ফিরে তাকাল।

কি একটা কথা বলতে গিয়ে গলা আটকে গেল হেমের। কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে ভাবল কি বলবে। কথা আসছিল না। একটা ভয়ংকর কষ্ট গলার কাছ দিয়ে উঠে এসে জিব আড়ষ্ট করে ফেলেছিল।

কিছু বলতে পারল না হেম। কেমন এক অদ্ভুত চোখে সুষমার দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক। তারপর শুয়ে পড়ল।

সুষমা চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসতে হল সুষমাকে। কাছে এল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল আড়ষ্ট হয়ে। ঘর জানলা বিছানা আলো দেখল। কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করল কিসের যেন। তারপর একটু ঝুঁকে কপালে হাত রাখল হেমের।

হেম কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল। টিমটিমে আলোতেও তার মুখে নতুন এক যন্ত্রণা এত স্পষ্ট আর সরল ভাবে ফুটে রয়েছে যে সুষমা সেদিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারল না।

অল্পক্ষণ অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুষমা সেই অদ্ভুত যন্ত্রণা আর কষ্ট দেখল। চোখ ফিরিয়ে নিল। বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল। আবার তাকাল। দেখল হেমকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আস্তে আস্তে—চেপে চেপে।

'কি হয়েছে ?' সুষমা গলার স্বর সহজ করে শুধলো।

জবাব নেই। চোখ অল্প খুলে সুষমাকে শুধু একবার দেখল হেম। সুষমা যে একধরনের অস্বস্তি আর বেদনা বোধ করছে হেম বুঝতে পারল। কষ্টকর সুখ পেল সে সুষমার এই নিগ্রহে।

'ঘুম আসছে না ?' সুষমা রোগীর দিকে চোখ না রেখে সংকোচের সঙ্গে শুধলো।

'না।'

'বাতি নিভিয়ে দি, অন্ধকার হলে ঘুম আসবে।'

'তুমি থাকবে?' হেম আচমকা বলল।

সুষমার মুখ কেমন হয়ে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল হেম। মনে হল, ভীষণ একটা লজ্জা আর আঁচে সুষমার গাল নাক চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

সুষমার সেই মুখ আস্তে আস্তে আবার শুকিয়ে কেমন কালো হয়ে গেল। শুকনো। মুখ ফিরিয়ে নিল সুষমা। কিন্তু উঠল না টুল ছেড়ে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল হেম। সুষমাকে ছাড়তে পারল না। আরও যেন বেশি পাগল হয়ে গেছে। সুষমাকেও পাগল করে তুলেছে।···মাস তিনেক পরেই বিয়ে করল সুষমাকে। বউ নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে এল। হেমের ইচ্ছে ছিল না সুষমা আর চাকরি করে। সুষমাও বলত, আর হাসপাতালে যেতে তার ভাল লাগে না।··তবু বিয়ের পরও মাস দুই চাকরি করতে হয়েছে সুষমাকে। ডাক্তার দাশ ভাল ট্রেনড্-নার্স না পাওয়া পর্যন্ত সুষমাকে আটকে রেখেছিলেন। অনুরোধ এড়াতে পারে নি সুষমা। তখন হাসপাতাল আর ডাক্তার দাশের ওপর কেমন এক কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মে গিয়েছিল হেমেরও।

হাসপাতাল হেমকে শুধু প্রাণ ফিরিয়ে দেয় নি, প্রাণেশ্বরীকেও দিয়েছিল—ঠাট্টা করে বলত হেম। পরে বুঝল হাসপাতাল তাকে বিষ দিয়েছে।

সুষমা জুন মাসে চাকরি ছাড়ল। তিতু জন্মাল ফেব্রুয়ারীতে। বিয়ের ঠিক এগারো মাস পরে। বেশ শীত

তখন। হাসপাতালেই প্রথম মুখ দেখল হেম তার সন্তানের। আর দেখল চৌধুরীর বাড়াবাড়ি। চৌধুরী যেন সন্তান প্রসব করায় নি, জন্ম দিয়েছে এমন তার হাব ভাব। একটু কষ্ট পেয়েছিল সুষমা সন্তান প্রসবের সময়, সামান্য বিপদের ঝুঁকিও এসেছিল—কিন্তু তা এমন কি যে চৌধুরী হাসপাতাল তোলপাড় করে ফেলবে। লোকটা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কেন?

নতুন ছোকরা ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে সুষমার যে একটু মেলামেশা ছিল হাসপাতালের সবাই জানত। জানত না হেম। পরে শুনল, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জনশ্রুতি সংগ্রহ করল। কাজের সময় চৌধুরী সিস্টার মৈত্রকেই আগে ডাক দিত। অ-কাজের সময় সুষমাকে সামনে বসিয়ে গল্প করত। চৌধুরীর চেম্বারে ওদের হাসাহাসি করে চা খেতে দেখেছে অনেকেই।··· বিয়ের পরও চৌধুরী মাঝে মাঝে হেমের বাড়িতে এসেছে। গল্প গুজব করেছে সুষমার সঙ্গে। অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের পরামর্শ দিয়েছে। সুষমাই তাকে ডেকে পাঠাত, না নিজের গরজেই চৌধুরী আসত হেম পরে তা অনেক ভেবেছে। দু-তরফেরই গরজ ছিল বলে মনে হয়েছিল হেমের।

তিতুর গায়ের রঙে যে-ছাপ পড়ল, মুখের গড়নে যে-ছাঁচ স্পষ্ট হল, চুল আর চোখে যে-ভাবটা ফুটল বছর খানেকের মধ্যে তাতে হেম কিছুতেই নিজের সঙ্গে ছেলেকে মানিয়ে নিতে পারল না। চৌধুরীর সঙ্গে তিতুর মুখের মিল খোঁজবার অস্বাভাবিক বিকৃত এক নেশা পেয়ে বসল হেমের। হেম ছেলেকে দেখত, দেখত, দেখত।

বিয়ের পর সুষমার দু-মাস হাসপাতালে চাকরি করার

পিছনে একটা অন্ধকার ইতিহাস তৈরী হতে লাগল। মনে মনে সেই জটিল ইতিহাস তৈরী করল হেম।

অস্পষ্ট কথাবার্তা, আভাসে আড়ালে হেঁয়ালি, তিক্ত কদর্য বিদ্রূপ—একদিন শেষ হতই। হয়ে গেল। হেম খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করল; সুষমা পায়ের তলায় মাটি পেল না কথা শুনে। কাঁদল কাটল রেগে আগুন হল, ঝগড়াঝাটি করল।

স্বামীর মন থেকে এই বিষ-চারা উপড়ে ফেলতে পারল না সুষমা। হেমের মনের কোন্ অতলে যে শেকড় ছড়িয়ে গেছে সুষমা তা বুঝতে পারল না, ধরতে পারল না।

ওদের স্বামী স্ত্রীতে এই নিয়ে অনেক অশান্তি ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি হয়েছে।....সুষমা বলত, কী ইতরের মতন মন তোমার, নোংরামিতে ভর্তি স্বভাব! ছি ছি, তুমি কি মানুষ না....! জবাবে হেম আরও কুৎসিতভাবে বিদ্রূপ করত, এতই যদি অপছন্দ আমায়, বিয়ে করলে কেন? পছন্দ মত মানুষ ত তোমার হাতের কাছেই ছিল।...সুষমা জবাবে বলেছে, ভুল করেছি। তুমি জোর জবরদস্তি করে কথা আদায় করে নিয়েছিলে। নয়ত—।

'কচি খুকি! এরপর কোনদিন বলবে, মুখে কাপড় পুরে হাত-পা বেঁধে চুরি করে আমার ঘরে এনে ঢুকিয়েছি।'

'এক রকম তাই।'

'আরে রাখো, ও-সব আমার জানা আছে। তোমাকেও চিনেছি।'

সুষমাকে বাস্তবিক হেম চিনতে পারে নি, বুঝতেও পারে নি। নিছক একরোখামি, জোর জবরদস্তি, গোঁ, পাগলামির

পাল্লায় পড়ে সুষমা তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল—এ কথা বিশ্বাস করতে, ভাবতে হেমের কষ্ট হত। পছন্দ না, ভালবাসা না—শুধু তুমি নাছোড়বান্দা তাই বিয়ে করেছি—সুষমার এই ধরনের মনোভাব তাকে আরও খেপিয়ে তুলত, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারত।

হেম ভাবত, ও-সব বাজে কথা। আসলে সুষমা একটা সুযোগ নিয়েছে। চৌধুরী তাকে বিয়ে করত না কোনোকালেই। হাসপাতালের একটা নার্সকে বউ করে ঘরে তোলার মতন ছেলে সে নয়।

হেমকে বিয়ে করে সুষমা জিতেছে। আদপেই হয়ত বিয়ে হত না সুষমার। কে করত! ভদ্রঘরের মেয়ে ছেড়ে হাসপাতালের নার্সকে কে সেধে বিয়ে করে। হেম সে তুলনায় সুষমার কাছে স্বর্গ। ভাল চাকরি, সামনে উন্নতির খোলা রাস্তা ছড়ানো, সংসারে কোনো ঝামেলা নেই, কেউ নেই হেমের কোনো কুলে—সুষমা নিশ্চয় সব খুঁটিয়ে ভেবে হিসেব করে দেখেছিল। সারা জীবন হাঁ করে বিয়ের আশায় বসে থাকা আর দিনরাতের বাদবিচার না করে রুগী ঘাঁটার চেয়ে একটা স্থিতি, নিরাপত্তা, আরাম ও সংসার নিশ্চয় ভাল। একশো টাকার চাকরির চেয়ে তিরিশ দিনের নিরুদ্বিগ্নতা এবং রাত্রের ঘুম কেই বা না চাইবে! সুষমা সব বুঝে, জেনে শুনে তবেই বিয়েতে রাজী হয়েছিল। অথচ এমন ভাব দেখায় যেন, হেম তাকে হাতে পায়ে ধরে দয়া দাক্ষিণ্য ভিক্ষে করে এই বিয়েতে রাজী করিয়েছে।

হেমের ধারণা, তার নিজের কোনো দোষ নেই। সুষমাকে তার ভাল লেগেছিল, সুষমাকে সে ভালবেসেছিল—তাই

বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়েও করেছে।—না, কোনো দোষ নেই হেমের। দোষ সুষমার। সুষমা তাকে ঠকিয়েছে। হেমকে বিয়ে করেছে ব্যবসাদারের মতন লাভ লোকসান হিসেব করে। আর বিয়ের পরও চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমট্রেম দিব্বি চালিয়ে গেছে।···হ্যাঁ এই, এই জন্যে, বিয়ের পরও হাসপাতালের চাকরি ছাড়তে অত কিন্তু কিন্তু ছিল সুষমার। হেমকে কত বড় বড় ভাল ভাল কথা বোঝাত—কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ব, কর্তব্য। সমস্ত ঝুটো জাল জোচ্চুরির ব্যাপার। বিয়ের পনেরো দিন পরেও সুষমা নাইটডিউটি করতে গেছে। হেম আপত্তি করেছে, সুষমা শোনে নি। কৈফিয়ত দিয়েছে, সিরিআস একটা রুগী আছে, না গেলে চলবে না।···সিরিআস রুগী ছিল কি না কে জানে—তবে হ্যাঁ চৌধুরী নিশ্চয় ছিল। একদিন মাঝরাতে হাসপাতাল থেকে বেয়ারা আর চিঠি পাঠিয়ে চৌধুরী ডেকে নিয়ে গেছে সুষমাকে, জরুরী দরকারে। ···আর একদিন রাত্রে ডিউটি থেকে ফিরে এসে হেম দেখে বাড়ির চাবি সুষমা রেখে যায় নি ভুল করে। হাসপাতালে যেতে হল হেমকে। গিয়ে দেখে চৌধুরীর ঘরে সুষমা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে গল্প করছে। সামনে চা না ওভালটিন কি যেন! সুষমা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, চাবি আমি শোভাদিদের বাড়িতে দিয়ে এসেছি, মণ্টুরা ছিল না বলে। শোভাদিরা তোমায় কিছু বলে নি? তুমি খোঁজ করলেই পারতে। হেমের দৃশ্যটা ভাল লাগে নি। হেম শুধু বলল, 'এত রাত্রে চা খাচ্ছ?'····সুষমা জবাবে বলল, 'বলো না আর, লেবাররুমে ঠায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে এই বেরিয়ে এসেছি আমরা। বউটার বাচ্চা নামছে না কিছুতেই।

ইন্‌জেকসান দিয়ে এসে বসেছি একটু। আজ সারারাতই ভোগাবে।

নিজের চোখেই এ-সব দেখেছে হেম। আরও অনেক কিছু। তিতু হবার পর চৌধুরী খুব খোঁজ নিত ছেলেটার আর তার মার। হেমের কোয়ার্টারে আসত, তুলোর রঙীন বল, কাগজের পাখি, ঝুমঝুমি—কত যে খেলনা আনত তিতুর জন্যে। আর সুষমার জন্যে—? সুষমার জন্যে কি আনত হেম দেখে নি, জানতে পারত না। কয়েকটা স্যাম্পেল ওষুধের শিশি ছাড়া চোখে পড়ে নি কিছু। তবে হ্যাঁ, বিয়ের সময় সুষমাকে একটা ভাল আংটি দিয়েছিল, আর এই জায়গা ছেড়ে জামসেদপুরে চলে যাবার সময় তার ছবি আর ঠিকানা।

চৌধুরী চলে গেল। তিতুর বয়স তখন বছর দুই পুরো হতে চলছে। হেমদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ততদিনে সম্পর্কটা অনেকখানি চিড় খেয়ে গেছে। ফাটল ধরছে অদৃশ্যে।

সেই ফাটল দিনে দিনে বাড়ল। বেড়ে বেড়ে ওদের সম্পর্ককে ভাঙল, আলাদা-আলাদা করল, কুৎসিত আর বিশ্রী করে ফেলল।

ঝগড়া বাঁধলে দুজনের কারও মাথা ঠিক থাকত না। অনেক অসভ্য নোংরা বিশ্রী ব্যাপার করেছে তারা—গালি গালাজ থেকে শুরু করে মারধোর পর্যন্ত। তখন অনেক মনের কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ত। সরাসরি। হেম অসংখ্যবার বলেছে, হাসপাতালের একটা দুশ্চরিত্র নার্সকে সে বিয়ে করেছে নেহাৎ খেয়ালের মাথায়। নয়ত কে না জানত ও-সব মেয়ে এই ধরনেরই হয়।....জবাবে সুষমা বলেছে,

একটা হাতে-পায়ে-ধরা লোকের হ্যাংলামিতে একটু গলে গিয়েছিল বলেই তার এই সর্বনাশ হল।

'আরে যাও, চৌধুরী ত জুতোর ঠোক্কর দিয়ে চলে গেল।'

'তোমার মত অমানুষ নয় সে।'

'তাই নাকি! তবে আর কি....তার বাড়িতে গিয়ে ওঠো এবার।'

'একদিন তাই যাব। তোমার মতন লোকের বউ হয়ে ঘর করার চেয়ে সে অনেক ভাল।'

এত কদর্য ঝগড়াঝাটি, মনোমালিন্য, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ইতরতা—তবু কোনো কোনো সময় এতসব চাপা পড়ে গিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বেশ একটা স্বাভাবিক শান্ত আবহাওয়া ফিরে আসত। হেমের মনে হত, আর তাদের ঝগড়াঝাটি হবে না, অন্য পাঁচটা সংসারের মতন তাদের দিন-গুলোও সুখে স্বস্তিতে কেটে যাবে। হেম তখন ভাবত, সুষমাকে সে সত্যই ভালবাসে, সুষমার ব্যবহারে মনে হত সুষমাও যেন কত গভীরভাবে ভালবাসে হেমকে। তিতুর সম্পর্কে হেম আর কোনো বিশ্রী সন্দেহ রাখতে চাইত না। বরং ওই অসহায় নিরপরাধ শিশুর কাছে হঠাৎ যেন নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হত। গ্লানি বোধ করত হেম। অসহ্য গ্লানি। বেদনায় সহানুভূতিতে মনে কেমন একটা উছলে পড়া আবেগ আসত। ছেলেকে তখন অতিরিক্ত আদরের আতিশয্যে অতিষ্ঠ করে তুলত।

হেমের এই মনোভাব কখনও কখনও দীর্ঘ হত, মাস খানেক কি দুই—বেশ কাটত। অকস্মাৎ একদিন দেখা যেত, কি করে যেন আবার সেই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

তুচ্ছ কিছু একটা অবলম্বন করে আবার সেই বিকার, অসুস্থতা, অচেতন ইতরতা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

বছর পাঁচ এই ভাবে কেটেছিল। হয়ত আরও কাটত। হয়ত আজীবন এই ভাবে কেটে যেত। কিন্তু হেমের ভাগ্য অন্য ভাবে তৈরী হচ্ছিল।...এই সময় তপতী এল; সুষমার বোন। সহোদরা নয়, কাকার মেয়ে। কাকা মারা গেছে। কাকিমাই সংসারের কর্তা। কলেজে পড়তে ঢুকেছিল তপতী। অসুখ করল। টাইফয়েড। শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। দিদির কাছে এল শরীর সারাতে।

কে জানত শরীর সারাতে এসে এত ভাল করে শরীর সেরে যাবে তপতীর। দু-মাসের জায়গায় চার মাস কাটল। চার মাসের পরও হেম আটকে রাখল। ছ'মাস একটানা দিদির কাছে থেকে তপতী যখন কলকাতায় ফিরল তখন কুড়ি বছরের শরীরের কোথাও আর কিছু অ-পূর্ণতা নেই। মানসিক অভিজ্ঞতারও।

তপতী শুধু শরীরকে সুন্দর করে ফিরে গেল না কলকাতায়, মনে মনেও অনেক কিছু গড়ে নিয়ে গেল। এ-সংসারে একটা সাংঘাতিক শেষ ভাঙন নাটকীয়ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। হেম তখন তপতী-তাপে পুড়ে পুড়ে মরছে।

শীত পড়তে হেম নিজে গিয়ে আবার নিয়ে এল তপতীকে। কলকাতার অফিসের কি কাজে যাচ্ছে হেম, সুষমা তাই জানত। তপতী আসবে স্বপ্নেও ভাবে নি। খুশী হয় নি সুষমা। তার মনে কোথায় একটা কাঁটা আগেই ফুটেছিল।

তপতীকে কলকাতায় ফেরত পাঠাবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা করল

সুষমা। পারল না। হেম যেন আগলে রেখেছে তপতীকে। ছাড়বে না। তপতীও জামাইবাবুর কোন গোপন প্রশ্রয়ে দিদিকে অবজ্ঞা করতে লাগল। যেন এ-সংসার তার—হেম তার।

সুষমার কাছে অসহ্য লাগল এই অন্যায় ঘনিষ্ঠতা। বোনের ওপর ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় সে এত উগ্র, বন্য, বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল যে, খোলাখুলি স্বামী আর বোনকে আক্রমণ শুরু করল। ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াল। একদিন তপতীর বাক্স টেনে বাড়ির বাইরে ফেলে দিল সুষমা। দশ টাকার দু-খানা নোট ছুঁড়ে দিল বোনের গায়ের ওপর। 'ওই তোমার ট্রেনের ভাড়া। এখুনি চলে যাও—এই মুহূর্তে। আর একদণ্ড আমার বাড়ির মধ্যে নয়। শয়তান, বদ্ মেয়ে কোথাকার। আমার ঘর ভেঙে লুটেপুটে খেতে এসেছ।'

সে-দিনই চলে গেল তপতী। রাত্রির ট্রেনে হেম তুলে দিয়ে এল। যাবার সময় দিদির ওপর যে বিদ্বেষ আক্রোশ ঘৃণা ঈর্ষা আর তিক্ততা নিয়ে গেল তার বেশি বিদ্বেষ আক্রোশ ঘৃণা ওর শরীরে বা মনে আর ছিল না। এমনভাবে গেল যেন এবার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সোজাসুজি নেমে গেছে এবং দেখবে কতদিন দিদির এই দাপট থাকে।

তপতী চলে যাবার পর হেম কয়েকবারই কলকাতায় গেল। বলল, অফিসের কাজে। সুষমা না বুঝল এমন নয়। ঝগড়াঝাটিও হল।

তারপর একদিন সুষমা স্বামীর জামার পকেট থেকে সেই চিঠিখানা পেল। তপতীর চিঠি হেম নিশ্চয় বাড়িতে আনত না। এটা কি ভাবে কোন ভুলে এসে গিয়েছিল হেম নিজেও

তা মনে করতে পারল না। তখন হেম বড় দুশ্চিন্তায় এবং উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। ভীষণ অন্যমনস্ক এবং চঞ্চল।

তপতী একটা খারাপ পরিণাম সন্দেহ করে খুব ভীত হয়ে পড়েছে। তার ঘুম নেই, খাওয়া নেই, সব সময় ভয় আর অশান্তি। মার চোখে ধরা পড়বে একদিন ঠিকই—যদি না হেম এখন একেবারে গোড়াতেই তাকে বাঁচায়। (অথচ তপতীর এই ভয় যে অযথা এ-কথা তখন কেউ বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। কিন্তু ততদিনে যা হবার হয়ে গেছে।)

চিঠির কথা সুষমাই তুলল। হেম নীরব। তার মুখে কোনো কথা নেই।

তারপর সুষমাদের সংসারে কেমন ভয়ংকর এক গুমোট ঘনিয়ে উঠল। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। কেউ কারুর দিকে তাকায় না। হেম বাড়ির বাইরে বাইরে থাকে। ভয়ে ভয়ে। সুষমা যেন ঢেলে ফেলা গলা-লোহার মতন সময়ের বিরতিতে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ওঠে। কঠিন, কঠিনতর। দৃঢ়, স্থির, অবিচল। 'আমার এতবড় সর্বনাশ তুমি করবে তা হতে দেব না। তোমাদের আমি পুলিসে দেব।' সুষমা শেষে একদিন বলল যখন ঝগড়া বেঁধে উঠেছে আবার করে।

'তুমিই বা আমার কি কম সর্বনাশ করেছ—!'

'করা উচিত ছিল। তোমার মতন শয়তান পশু জোচ্চোরকে জব্দ করতে হলে আমার তাই করা উচিত ছিল।'

'চুপ করো। পাজি বদমাস মেয়েমানুষ, মাদি কুকুর কোথাকার—!'

স্বামী স্ত্রীতে সেদিন রাতে সব চেয়ে কুৎসিত কলহ হয়ে গেল। ওরা কেউই আর মানুষ ছিল না। পশু হয়ে গিয়েছিল।

ভোরে সুষমা বাড়ির পেছনের বাগানে পেয়ারা গাছের ডালের সঙ্গে দড়ির ফাঁস বেঁধে আত্মহত্যা করল।

না, সুষমা পুলিসকে চিঠি লিখে রেখে যায় নি। হেমকে ধরিয়ে দিয়েও যায় নি। হয়ত তিতুর কথা ভেবে, তিতুর জন্যে। হেম ছাড়া কে আর থাকল তিতুর।

হেম অনেক সময় ভেবেছে, সুষমা ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল তিতুর জন্যেই। তিতু ভীষণ ভয় পাবে সে-দৃশ্য দেখলে। সুষমা তাই চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।···

···হেমের খেয়াল হল, তার মাথার মধ্যে ভার ভার লাগছে। সামান্য যন্ত্রণাও। মাথা ধরে উঠছে। ঘাড়ের কাছে একটা মোটা শিরাও টান ধরে টনটন করছে।

সুষমার কথা কেন যে ভাবছিল এতক্ষণ আশ্চর্য! হেমের নিজেরই বিরক্তি বোধ হল। হাজার হোক, এই ভাবনা নিরর্থক। সুষমা আর ফিরে আসছে না। হেম তাকে জিজ্ঞেস করতেও পারবে না কোনোদিন, কেন তুমি গলায় দড়ি দিয়ে আমায় এ-ভাবে ফাঁসিয়ে গেলে। শয়তানি করে তুমি যে ওই রাস্কেলটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছ আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে, আমি জানি। কিন্তু, আমি····আমি····

হেম ভুরুর তলায় কপালের নীচে বেশ ব্যথা অনুভব করল। যেন ব্লেডের ছুঁচলো আগা দিয়ে হাড়ের তলায় কিছু একটা চিরে চিরে কেটে দিচ্ছে কেউ।···ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠল।

বিছানা ছেড়ে উঠল হেম। বেড সুইচ টিপতে একটা হালকা আলো জ্বলে উঠল। তপতী ঘুমিয়ে পড়েছে। হেম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল একটু। ঘুমোবার আগে তপতী তার ঢিলে পাতলা ব্লাউজের মতন জামাটা পরে নিয়েছে। তবু তপতীর শরীর স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। এখন যেন আরও সুন্দর।···শরীরটাই সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। অথচ হেম এই সুন্দর শরীরের ব্যর্থতা এবার অনুভব করল। তপতী এমন সুন্দর শরীর নিয়েও হেমের জন্য একটি সন্তান ধারণ করবে না। সে ক্ষমতা তার নেই।··কথাটা ভাবলে হেম কেমন যেন একটা গভীর নিশ্চিন্ততা বোধ করে।

হেম ডান হাতে কপাল টিপে মাথা ঝাঁকাল; যন্ত্রণাটা যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। না, যন্ত্রণা গেল না। নাকের কাছে হাত। ফিকে অডিকোলনের গন্ধ পেল আবার হেম। নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে স্নায়ুতে তলিয়ে গেল।

ধরা ধরা মাথা, এই ভার ভার ভাব, ক্লান্তি, করকরে একটা জ্বালা আর ঝাঁঝাল অনুভূতিকে শান্ত, ঠাণ্ডা, নরম করার জন্যে হেম তার অভ্যস্ত হাত অডিকোলনের শিশির দিকে বাড়িয়ে দিল।

নেই ফুরিয়ে গেছে। শিশিটা খালি।

খালি শিশি হাতে করেই হেম বাথরুমে চলে গেল। বেসিনের কল খুলল। প্রথমে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ছিটলো মুখে, চোখে, ঘাড়ে। তারপর অডিকোলনের খালি শিশিতে জল ভর্তি করল। জোরে ঝাঁকাল খানিক। শিশির সেই গন্ধ-জল হাতের তালুতে ঢালল। কপালে ঘাড়ে গলায় মাখল।

ভাল লাগল হেমের। আরাম পেল। মুখ মুছল না। বাথরুম বন্ধ করে ফিরে এল। শুয়ে পড়ল বিছানায়। বাতি নিভিয়ে দিল।

গন্ধটা জলো হয়ে আরও ফিকে হয়ে এসেছে। বেশ লাগছিল হেমের। ঠাণ্ডা এবং সতেজ ভাবটাও অনুভব করতে পারছিল হেম।

সুষমাকেই আবার মনে পড়ল। হাসপাতালের বিছানায় সুষমা রোজই প্রায় অডিকোলন ছড়িয়ে দিত। রোজই। হেম চোখ বুজে মনকে আরও অন্ধকারে আচ্ছন্নতার মধ্যে ফেলে রাখল।

সাত.

গরমের ছুটি আর ফুরোচ্ছিল না। তিতু প্রায় রোজই ক্যালেণ্ডারের পাতা দেখত। মাত্র কুড়ি কি বাইশ দিন কেটেছে। আরো সতের আঠার দিন। এই সোমবার, এর পরের সোমবার, তারপরও একটা সোমবার পেরিয়ে বৃহস্পতিবার দিন খুলবে স্কুল। এখনও অনেক দেরি। অনেক।

সারাদিন একা একা আর ভাল লাগে না তিতুর। সকালে দুপুরে বিকেলে—সারাক্ষণই একা একা। স্কুলটা খুললে তবু দুপুরটা স্কুলে কাটবে, সন্ধ্যেবেলায় মাস্টারমশাই আসবেন পড়াতে। স্কুলও খুলছে না মাস্টারমশাইও ফিরছেন না কলকাতা থেকে।

বাড়িতে সব সময় একা একা তিতুর আর ভাল লাগে না। কথা বলার মত একজনও কেউ নেই। ঘুম থেকে উঠে

আবার ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত শুধু এই ঘর, এই বিশ্রী বেয়াড়া ঘরের মধ্যে মুখ বুজে থাকা। বড় জোর বাংলোর ফেন্সিংয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। দিনের পর দিন একই ঘর একই বারান্দা, বাংলোর সামনের আর পিছনের রাস্তা, মাঠ মতন জায়গাটুকু, ফুলবাগান, গাছতলা, কুলঝোপ দেখে দেখে তিতুর আর ভাল লাগে না। নতুন কিছু নেই। সব পুরনো, স—ব; এই বাংলোতে আসার পর থেকে রোজ যা দেখছে তিতু; রোজ।

বাড়ির মধ্যেও যেমন, বাংলোর ফেন্সিংয়ের মধ্যেও তেমন —তিতুর সব বাঁধাধরা। বাড়ির মধ্যে তিতু নিজের ঘর, বাথরুম বারান্দা আর ডাইনিংরুম ছাড়া অন্য কোথাও ইচ্ছে মতন ঘুরতে ফিরতে পারে না। তিতু কি পারে মাসিদের ঘরে গিয়ে খানিকটা শুয়ে থাকতে বা এটা ওটা নাড়তে? না। তিতু পারে না। ড্রয়িংরুমে গিয়ে কাচের বুককেসটা খুলুক দেখি তিতু, সোফার ওপর গড়াক কিংবা রেডিও খুলে গান শুনুক—মাসি এমন একটা ধমক দেবে যে তিতুর আর ইচ্ছে হবে না কোনোদিন ও-দিকে পা বাড়ায়। মাসির সব সময় ভয়, অমন চমৎকার ফিটফাট সাজানো ঘর তিতু নোংরা করবে, কিছু ভাঙবে, কোন জিনিসটা বা নষ্ট করবে। তিতু দেখেছে, মাসি এমন করে তখন, যেন তিতু ওদিকের ঘরে ঢোকার যোগ্য নয়। তিতু তাই যায় না ওদিকে। কখনও যদি যায়, দু' এক মিনিট—তার বেশি থাকে না।

বাড়ির মধ্যেও যেমন বাঁধাধরা—বাংলোর মধ্যেও তেমনই তিতুর চলাফেরা মাপ করা। পিছনের মাঠটুকুতে বেড়াও, গাছতলায় ঘোরো, সামনের বাগান আর রাস্তায় খেলা করো

—কেউ বারণ করবে না। কিন্তু একা একা খেলা যায় এমন কোন্ খেলা আছে! মুখ বুজে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তিতুর তাই উপায় নেই।

গ্যারেজের পাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে তিতুর যাওয়া বারণ। 'ওরা চাকর বাকর—ওদের ঘরে আড্ডা মারতে যাওয়া কিসের তোমার': মাসি খুব কড়া ভাবে ধমক দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে।

মালি আর মালির মেয়ে বিন্দুর সঙ্গে তিতুর তবু ভাব ছিল। কথা বলত; গল্প করত। এখন তাও বারণ। বিন্দুর সঙ্গে আগে ছুটোছুটি করেছে তিতু; বাগানে গঙ্গাফড়িং প্রজাপতি ধরেছে, সাপের গর্ত খুঁজেছে, ভেলভেট পোকা কুড়িয়েছে, কুল পেড়ে খেয়েছে। আজকাল আর সে-সব হয় না। তিতুর আর এ-ধরনের ছেলেখেলা ভাল লাগে না। বিন্দুরও অনেক কাজ বেড়েছে। খেলা অনেক আগেই ছেড়েছিল তিতু, আজকাল বড়জোর বিন্দুর সঙ্গে কখনও দুটো কথা বলত, গল্প করত। দিনকয়েক আগে—সেই শিলাবৃষ্টির পর থেকে তাও বন্ধ। মাসি বারণ করে দিয়েছে: 'মালির ওই মেয়েটা তোমার বন্ধু নয়, ওর সঙ্গে হুড়োহুড়ি আড্ডা কিসের? ওদিকে যাবে না তুমি। বারণ করে দিলাম। কথার অবাধ্য হলে তোমার বাবা বলেছেন…।'

বাবা কি বলেছে, তিতুর আর তা শোনার দরকার হয় না। ইচ্ছেও হয় না। মাসি সে-দিন, সেই শিলাবৃষ্টির দিন, রাত্রে খাবার টেবিলে তিতুর নামে বাবার কাছে যে-চুগলি কেটেছিল তার কোনো মানেই বোঝে নি তিতু। কি যে বলেছিল মাসি, তিতুর কোন্ দোষটা দেখেছিল—তিতু অনেক

ভেবেও তা বুঝতে পারে নি।....মাসি মিথ্যে কথা বলেছিল। একেবারে মিথ্যে কথা। তিতু যখন বিন্দুর ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন বিন্দু ভিজে কাপড়েই বাটি ভর্তি শিলের মধ্যে এক মুঠো চিনি দিয়ে মিষ্টি-বরফ তৈরী করছিল। তিতুকে সেই চিনি মেশান শিল বিন্দু খানিকটা দিয়েছিল। তিতু খেয়েছে। এতে যে কোথায় দোষ, কি দোষ হয়েছে তিতু বুঝতে পারে নি।.... পরে তিতুর মনে হয়েছে, মালির মেয়ের হাত থেকে তাদেরই থালা বাটি থেকে কিছু নিয়ে খাওয়া বোধ হয় দোষের। ওরা চাকর বাকর!

মালি, বিন্দু, মধুদের সঙ্গে তাদের যে একটা তফাত আছে তিতু জানত। জানত যে, ওরা মনিব মালিরা চাকর বাকর; ওরা ভদ্রলোক, মালিরা ছোটলোক; তার বাবা মাসি সে বড়লোক—আর মালি বিন্দু মধু গরিব। তফাতটা জানত তিতু, দেখতেও পেত—কিন্তু সব কথা যেন বুঝত না।

খুবই অবাক লাগত তিতুর, বইয়ে পড়া কথা আর বাবা মাসি বা স্কুলের টীচারদের কথা শুনলে। বইয়ে সব সময় এক রকম লেখে, মাস্টার মশাইরা প্রশ্ন করার সময় এক রকম করেন—অথচ কথাবার্তায় সব একেবারে আলাদা।

এই ত তিতুদের বাংলা বইয়ে, ক্লাস এইটের বাংলায় একটা কবিতা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্থ কিংবা তাৎপর্য লেখার প্রশ্ন আসে। এবারেও এসেছিল। গরমের ছুটির আগে ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষাতেও তিতু উত্তর লিখে এসেছে খুব ভাল লিখেছে

বাংলার টীচার শ্যামবাবু খুব সুন্দর করে পড়িয়েছিলেন তিতুর পুরো মুখস্থ আছে। তবু তিতু শ্যামবাবুর

গলা থেকে শুনছে এমন ভাবে কবিতাটা মনে মনে আওড়াল ঃ

> নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।
> তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
> রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে—
> ধুলো তাদের লেগেছে দুই হাতে…

কবিতাটা পড়লেই মালি, বিন্দু, মধু, ডিমঅলা সেই বুড়ো, স্কুলের জল-বেয়ারা এদের মুখ ভাসে তিতুর চোখে। এরা কি তাই নয়—বারো মাসের খাটিয়ে! তবে…? তিতুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজী কবিতাটাও মনে পড়ে বইয়ের ঃ

> *…Any good thing, therefore, that I can do,*
> *Or, any kindness that I can show*
> *To any human being,*
> *Let me do it now '…*

মাঝে মাঝে তিতুর মনে হয়, বইয়ের কথা আর লোকজনের কথা এক নয়। বই যারা লেখে তারা লেখার সময় একরকম লেখে, মানুষে সে-সব গ্রাহ্য করে না। বাবার চাপরাশির কে যেন মরে গিয়েছিল, বাংলোয় এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, ছুটি চায় ক'দিনের—দেশে যাবে। বাবা এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে। লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদছিল। বাবার ত কই একটুও দয়া হল না!… মধুর পায়ে কাচ ফুটে সেপটিক হয়ে বিচ্ছিরী এক কাণ্ড হয়েছিল। হাসপাতালে গিয়ে কাটাকুটি করতে হয়েছে। ক'দিন বেশ ভুগেছে মধু। পায়ে ব্যাণ্ডেজ, খোঁড়াত, যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে থাকত। কই মাসি ত মধুকে ছুটি দিয়ে দেয় নি,

বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতে বলে নি। একটা না দেড়টা দিন পার পেয়েছিল মধু, তারপর খোঁড়া ব্যাণ্ডেজবাঁধা পা নিয়ে তাকে সব কাজ করতে হয়েছে।...শ্যামবাবু রবীন্দ্র-নাথের ওই সুন্দর কবিতাটা ক্লাসে কী চমৎকার করে পড়ান, অথচ ক্লাসের ফটিককে কি বিচ্ছিরী ভাবে কথা বলেন: 'ওহে সদ্গোপের পো—কেনে বাবা বাপ-মায়ের ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে ঠেলছ গো চাঁদ। যাও ঘরকে গিয়ে বাপের সাথে জমিতে হাল ধরো গা।'...শ্যামবাবু এখানকার বর্ধমানী না বাঁকড়োর ভাষায় ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে বলেন কথাগুলো। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হাসে। ফটিক মাথা নীচু করে ফ্যাকাসে শক্ত মুখে বসে থাকে।...ফটিক বার দুই ফেল করেছে। তারা নাকি জাতে চাষা। কিন্তু ক্লাসের মধ্যে ফটিককে শ্যামবাবু কেন অমন যাচ্ছে তাই করে বলবেন! এটা অপমান। তিতু তা বোঝে।

তিতু একদিন মাস্টার মশাইকে কথাটা শুধিয়েছিল, তার প্রাইভেট টিউটর যতীনবাবুকে। মাস্টারমশাই জবাবে বলেছিলেন, 'মানুষ ত আর বই নয়। সবাই যদি বইয়ের উপদেশ শুনত তবে পৃথিবী সুখের স্বর্গ হয়ে উঠত তিতু। ও-সব কেউ শোনে না।'

'তবে লেখে কেন?'

'তা জানি না।...ভাবে বিভোর হয়ে লেখে আর কি!'

'মিথ্যে মিথ্যে?'

'না, ঠিক মিথ্যে নয়। তবে—তবে ঠিক যে সত্যি তাও না। একটু বেশি বেশি ভেবে নেয়। কল্পনা টল্পনা। কিন্তু তোমার মাথায় এমন সব আজগুবি কথা আসে কোথা থেকে?'

মাস্টার মশাই যে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন তিতু বুঝতে পারছিল। আমতা আমতা করে জবাব সেরে তিনি বললেন, 'আরএকটু বড় হও, মাথার ঘিলু বাড়ুক—তখন এ-সমস্ত কথা ভেব। নাও এবার একটু জিওমেট্রির প্রবলেমটা পড়।'

তিতু তার বয়সের তুলনায় একটু বেশী বুদ্ধিমান। বুঝেছিল, তাকে বড় হতেই হবে এ-সব কথা বুঝতে হলে। মাসি বাবা শ্যামবাবু মাস্টার মশাই—এরা কেউ তাকে কথাটা বোঝাতে পারবে না।

মাসি যখন বারণই করছে, বেশ, কথা বলব না বিন্দুদের সঙ্গে, যাব না তাদের ঘরের দিকে। বকুনি, ধমকানি খাওয়ার চেয়ে বরং বারণটা শোনাই ভাল।

একা একাই কাটতে লাগল তিতুর। ঘরের মধ্যে বসে বসে, বাগানে খানিক হেঁটে ফিরে। আর ক্যালেণ্ডারের পাতা দেখে।

স্কুল খুললেই যে তিতুর দশটা বন্ধু জুটে যাবে তা নয়। তবু স্কুল খুললে সে স্কুলে যেতে পারবে, ক্লাসের তিরিশ চল্লিশটা ছেলেকে দেখতে পাবে। একসঙ্গে অত ছেলে দেখা, এক ঘরে বসে থাকারও একটা আনন্দ আছে। তিতু সে আনন্দ ভোগ করতে পারে।

স্কুলে, বাস্তবিক, তিতুর বন্ধু বলে কেউ নেই। ক্লাসে তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে এমন ছেলে দু-একজন। বাকিরা তিতুকে পাত্তাই দেয় না। হিংসে করে। কেমন একটা রাগ তাদের। ফার্স্ট বয় বলে তিতুকে ঠাট্টা তামাশা এমন কি দয়া টয়া করে যেন। কেউ কেউ আবার বলে, 'গো-বৎস'।

আগের ক্লাসে ওর নামে একটা ছড়া বানিয়েছিল ছেলেরা, এ-ক্লাসেও মাঝে সাঝে কখনও তা আওড়ায়। 'তীর্থপতি মল্লিক, সাহেব পাড়ার বেল্লিক।'

তিতুকে যে কেন ওরা এমন করে তিতু বোঝে না। সে ফরসা দামী শার্ট প্যাণ্ট পরে স্কুলে আসে বলে? বাড়ির গাড়ি তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় নিয়ে যায় বলে? তাতে তিতুর কি দোষ! মাসি তিতুকে যতই বকুক ঝকুক, দু-চোখে দেখতে পারুক না পারুক, এই খাওয়া পরার ব্যাপারে কখনও কষ্ট দেয় না। তিতুর শার্ট আছে চৌদ্দটা, প্যাণ্টও ওই রকম কি আরও দু-চারখানা বেশি। বেশ ভাল ভাল শার্ট; ছিটের, সিল্কের। গরম কাপড়েরও আছে। প্যাণ্টগুলোও খুব দামী আর চমৎকার। গায়ের গেঞ্জি, আণ্ডারওইয়ার, রুমাল, এমন কি নেকটাই। তিতু যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয় নেকটাই পরে এসেছিল, মাসির হুকুমে, মাসিই বেঁধে দিয়েছিল। ক্লাসের টীচাররা আর ছেলেরা তাই দেখে এমন চোখ মুখ করল! তারপরই ছড়া তৈরি করল ছেলেরা। তিতু কিছুতেই আর টাই গলায় পরল না। ওই একবারই সে জীবনে মাসির হুকুমের উলটো গোঁ ধরেছিল।

টাই তিতু আর কোনোদিন পরে নি, পরবেনা। কিন্তু শার্ট প্যাণ্ট বদলাবে না এ-কথা সে বলতে পারে না। সপ্তাহে তিন সেট—দু-দিন অন্তর—তাকে পোশাক বদলাতে হয়। মাসির হুকুম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ত বটেই, বাবার মান-মর্যাদার জন্যেও। মল্লিক সাহেবের ছেলে সে, ফিটার মিস্ত্রী বা কেরানীর নয়। মাসি কথাটা তিতুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল পরিষ্কার করে: 'তোমার স্কুলের জন্যে আমি এক গাদা

পোশাক করিয়ে দিলাম। ঠিক নিয়ম মতন পরবে।' এ-ব্যাপারে তিতুর তেমন আপত্তি নেই। দুদিনের জায়গায় যদি তিন দিন হত, তাতে ক্ষতি হত না। সোমবার যে শার্ট প্যান্ট ভাঙে তিতু, সেটা বুধবার পর্যন্ত বেশ পরা যায়। বৃহস্পতিবার আর-এক সেট ভাঙলে শনিবার পর্যন্ত চলে যেত। তিতুর ইজের জামা ময়লা প্রায় হয়ই না।

কি করে ময়লা হবে! অন্য ছেলেদের মতন তিতু যদি লাফ ঝাঁপ খেলা ধুলো করত, মাঠে ময়দানে রগড়াত—তবে একদিনেই ভূত হতে পারত।

স্কুলে তিতুর কোনো খেলার সঙ্গী নেই। অনিল বিজু পলটু—ক্লাসের সবচেয়ে দুরন্ত হুড়ে ছেলের দলটা তার সঙ্গে কথাই বলে না ভাল করে, ত খেলা। ওরা কেউ কোনদিন তিতুকে টিফিনে খেলতে বা বেড়াতে যেতে ডাকে নি। অনিল তার ছোট সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে কত ছেলেকে ঘুরিয়ে এনেছে নদীর ধার থেকে, কত ছেলেকে সাইকেল চড়া শিখয়েছে—কিন্তু তিতুকে কখনও ডাকে নি। তিতুর বরাবরই ইচ্ছে করত, অনিল তাকে সাইকেল চড়া শিখিয়ে দিক। কাঁচুমাচু মুখে তিতু অনিলের কাছে হয়ত গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই লোভে, বলব বলব করেছে, অনিল গ্রাহ্যই করে নি।...বিজু একবার তিতুকে ক্রিকেট বল ছুঁড়ে মেরেছিল কপালে। অনেক দিন হল, শীতের সময়, ড্রিল পিরিঅডে যখন একদিন স্কুলের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট প্রাকটিস করছিল। তিতুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ব্যাট্ ধরিয়ে, বিজু বদমাইশি করে কাণ্ডটা করেছিল।....এ-রকম ঘটনা অনেক আছে। কেউ তিতুর পকেট থেকে লুকিয়ে রুমাল

বের করে থুথু ভর্তি করে দিয়েছে, পেনসিলের সরু আগা দিয়ে খোঁচা দিয়েছে কেউ; কেউবা তার খাতা চুরি করে ছবি এঁকে লিখে দিয়েছে: 'গো-বৎস গোচারণে যাইতেছে।' তিতুর হাত মুচড়ে দিয়েছিল একবার করুণা।

সবচেয়ে চটেছিল তিতু সেদিন, যেদিন অনিলের দল বোর্ডে একটা ফ্রক পরা মেয়ের ছবি এঁকে তলায় লিখে দিয়েছিল: 'তীর্থপতি মল্লিক, ছেলে নয় ত মেয়ে ঠিক।'... তারপর সেই ছবি নিয়ে আর তিতুকে নিয়ে কী অসভ্যতাটাই তারা করল। সামারের ছুটি হয়ে যাওয়ার দিন বলে ক্লাসে সেদিন টীচাররা কেউই ঢুকছিলেন না। সারা ক্লাস জুড়ে হুল্লোড় চলছিল।

ওরা যে কেন তিতুর সঙ্গে এই রকম করে তিতু বুঝতে পারে না। দোষ কারও কাছে করে নি তিতু। কারও বিরুদ্ধে 'কমপ্লেন'ও না। কাউকে কিছু বলেনি কোনো দিন। তবু ওরা এত নিষ্ঠুর কেন তার ওপর?

নির্মলের কথাই ঠিক। অনিলের দল শুধু নয়, ক্লাসের দু-একজন ছাড়া আর সবাই তিতুকে দু-চোখে দেখতে পারে না। তারা ওকে চালবাজ বলে; বলে পেল্লু সাহেব। বলে, বেটা বদমাশ কোথাকার, লবাবের নাতি। ডাঁট মারতে এসেছে।

মিথ্যে কথা। তিতু কারুর কাছে চাল মারতে যায় নি। বাড়ির গাড়ি আর বাবার অফিস থেকে ঠিক-করা-ড্রাইভার তাকে স্কুলে পৌঁছে দেয়, ছুটির পর আবার এসে নিয়ে যায়। টিফিনের সময় দুধের ফ্লাস্ক আর খাবার নিয়ে আসে বাড়ি থেকে মালি। পরিষ্কার ভাল সুন্দর জামা কাপড় পরে তিতু,

কচকে জুতো, মোজা। তিতু ক্লাসে ফার্স্ট হয়। টীচাররা
তুকে ভালবাসে। হ্যাঁ—এ-সবই ঠিক। তিতুকে তাই সবাই
চোখে দেখতে পারে না, তাকে খেপায়, গালাগাল দেয়,
রধোর করে বাগে পেলে। কী নিষ্ঠুর এরা!

ওদের দলের মতন হতে পারলে তিতু সকলের বন্ধু
তে পারত। ক্লাসে পড়া না পারা, টীচারদের ভেঙচানো,
বড়াল ডাক দিয়ে পণ্ডিত মশাইকে অতিষ্ঠ করে ক্লাসরুম
থকে তাড়ানো, খারাপ কথা, ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়
রে স্কুলে আসা, ধারে আলুকাবলি ফুচকা খেয়ে বেচারী
ফরিঅলাটাকে তাড়ানো—এ-সমস্ত করতে পারলে তিতু
াসের ছেলেদের বন্ধু হয়ে উঠত। তিতু তা পারে নি,
ারবে না। সোম সাহেবের ভাইপো, মুখুজ্যে সাহেবের দুই
ছলে, আরও দু'একজন ত পড়ে এই স্কুলে, অফিসারদেরই
ছলে ভাইপো। তারা সিগারেট খায় কেউ কেউ, অন্য
ছলেদের সিগারেট খাওয়ায়, আইসক্রীম খাওয়ায়, চানাচুর
বলি করে, ক্লাসে মাস্টারদের নাস্তানাবুদ করে, পরীক্ষার সময়
কল করে। স্কুলের ছেলেরা এদের খাতির করে, পা চাটে,
াংলার মতন পিছু পিছু ঘোরে। ওদের তাই অনেক বন্ধু।

তিতুর বন্ধু নেই। তিতু বন্ধুত্বের জন্যে ক্লাসের
ছলেদের মতন অসভ্য, বদমাশ, নোংরা হতে পারবে না।
কছুতেই না।

নির্মল আর অমরেশের সঙ্গেই তিতুর যা একটু ভাব।
নর্মলকে তিতু কত করে বলেছিল, গরমের ছুটিতে একদিন
ার বাড়িতে আসতে। নির্মল এল না। অবশ্য এখনও কুড়ি
াইশ দিন ছুটি আছে—আসতেও পারে একদিন।

তিতুর খালি ভয়, মাসি না নির্মলকে দেখে রেগে যায়, তাড়িয়ে দেয়। ওরা একটু গরিব। ধুতি শার্ট-ই পরে। তাও ময়লা। কে জানে, হয়ত সেই লজ্জায় নির্মল আসছে না। আর অমরেশ বোধ হয় রাঁচি চলে গেছে। তার গরমের ছুটিতে রাঁচি যাবার কথা, পিসিমার কাছে।

তিতুর পিসিমা নেই। কেউ না। তিতু কোনোদিন কোথাও কারও কাছে যায় নি। মা-র সঙ্গে ছেলেবেলায় নাকি একবার কলকাতায়, আর একবার বাবা মা সবাই মিলে দেওঘর গিয়েছিল। তিতুর কিছু মনে নেই আর এখন।

অমরেশ ফিরে এলে রাঁচির গল্প শুনতে পাবে তিতু। রাঁচিতে পাহাড় আছে, ঝরনা আছে, পাগলা গারদ…। পাগলা গারদ কেমন দেখতে? সেখানে কত পাগল থাকে? একশ, দু'শ—পাঁচশ? তারা কি করে? ঝগড়া, মারপিট? তারা কি সারাদিন হাসে? না কি কাঁদে? তাদের কি সব সময় ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেয়?…মানুষ কি করে পাগল হয়? কারা পাগল হয়? কারা? তিতুর কল্পনা থই পায় না।

আট.

গরমের ছুটি ফুরিয়ে স্কুল খুলল। তারপর কবে যে বর্ষা এসে গেল তিতু বুঝতে পারল না ভাল করে। প্রায় দিনই আকাশ মেঘলা, কখনও ছাই ছাই রঙ রোদমোছা ভাব, কখনও অন্ধকার-ঘন-হওয়া বাদলা। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। দিনে,

দুপুরে, সারারাত ধরেও বা বৃষ্টি। কিছু ঠিক নেই। দু'এক পশলা হয়ে থেমে যায় কখনও। কখন বা টানা। থামতে চায় না।

কবে একদিন এত বৃষ্টিও কমে এল। মেঘলা কাটল। আকাশে হালকা মেঘ ; নীল আকাশ, চকচকে রোদ। রোদ আড়াল হয়ে এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়ে যায় হঠাৎ। আবার রোদ এসে ঠিকরে পড়ে। শরৎকাল এসেছে, তিতু বুঝতে পারে।

বাড়ির বাগানে লতাগাছগুলো বেড়ে উঠেছিল হু-হু করে বৃষ্টির জলে, বেলফুলের কেয়ারির পাশে রজনীগন্ধার ডাঁটাও লম্বা হয়ে মাথা তুলেছিল, ফুল ফুটে ফুটে এবার যেন মরে আসছে, যুঁই আর গন্ধরাজ ফুটছে এখনও ; ডাল-পালা পাতায় ঝোপ হয়ে গেছে, এখনও কী সবুজ! মালি বর্ষার পর বাগান পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছে। ডালপালা ছাঁটছে। লম্বা লম্বা ঘাস ছোট করছে। সার ফেলে রাখা কোপানো জমিতে বীজ ছড়াচ্ছে মরশুমি ফুলের।

তিতুর ঘরের কাছে একদিন নতুন একটা গন্ধ ভেসে উঠল। সন্ধ্যে বেলায়। মিষ্টি সুন্দর মনোহর গন্ধ। শিউলি গাছটায় শিউলি ফুল ফুটল। তিতু বুঝতে পারল, অনুভব করতে পারল। এত ভাল লাগল তিতুর—মনে হল তাদের বাগানে এর চেয়ে ভাল গাছ নেই, এই গন্ধের চেয়ে কোনো গন্ধই আর ভাল নয়।

ঠিক তার দু-তিনদিন পরেই সন্ধ্যের মুখোমুখি তিতুদের বাংলোয় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। টাউন থেকে আসছে। ট্যাক্সি থেকে নামল খুব মোটাসোটা বুড়ি বুড়ি বিধবা কে

একজন ; আর ময়লা রঙ, রোগাটে, ফ্রকপরা একটি মেয়ে
পিঠের ওপর লিকলিকে দুটো বিনুনি, আগায় রিবনের ফু
বাঁধা। একটা বড় সুটকেস, ছোট বেডিং, জলের কুঁজো
ফলের ছোট টুকরি—ঝপ ঝপ করে তিতুদের পায়ের কাছে
এসে পড়ল।

মাসি বাড়ি নেই, বাবাও না। সেন সাহেবের খু
অসুখ। দেখতে গেছে। তিতু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল
কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না। মধুটাও হাঁ কা
দাঁড়িয়ে থাকল। তিতুর মনে হচ্ছিল, এরা ভুল বাড়িতে
এসে পড়েছে। ট্যাক্সির ক্লীনারটাও গাড়ি থামার স
সঙ্গে ঝটপট মালগুলো নামিয়ে সামনের বারান্দার ওপ
রেখে দিয়েছে।

হাতের রুমালের গিঁট খুলে ট্যাক্সি ভাড়াও দিয়ে দিলে
বুড়ি মহিলাটি। ক্লীনার ছোঁড়াটা তবু হাত গোটায় না
মেমসাহেব মেমসাহেব করছে। 'কিতনা খোঁজনে পড়া-
আওর ভি কুছ....' মুখ আর বন্ধ হয় না তার। 'থাম বা
মেমসাহেব মেমসাহেব করতে হবে না! বড্ড জ্বালা
তোরা। কত আর খুঁজতে হয়েছে—পাঁচ মিনিটও নয়।' বু
মহিলা আর একটা সিকি না আধুলি যেন টুপ করে ফে
দিলেন ক্লীনার ছোঁড়ার হাতে। ট্যাক্সিটা ততক্ষণে স্টা
দিয়ে গেটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভারটা ডাকল
ক্লীনার ছোঁড়া চলে গেল। চোখের পলকে ট্যাক্সি উধাও

তিতুর মুখ শুকিয়ে গেছে। এই রে, ট্যাক্সিটাও চ
গেল! ভুল বাড়িতে এসে পড়েছে এরা। মালপত্র
নামিয়ে ফেলেছে, এখন যাবে কি করে ?

উনি কি বলেছিলেন তিতু শুনতে পায় নি প্রথমটায়, অন্যমনস্কতার দরুণ। এবার কানে গেল। তিতুকেই কি যেন শুধোচ্ছেন। তাকাল তিতু।

'মিনুরা কোথায়?'

মিনু!....মিনু কে! তিতু বুঝতে পারল না। ঠিক যা ভেবেছিল তিতু। ভুল বাড়িতে এসে পড়েছে এরা। তিতুদের বাড়িতে কে আসবে? কেউ আসে না। তাদের কেউ নেই।... কিন্তু এখন কি উপায় হবে? তিতু ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল।

'এটা আমাদের বাংলো। আমার বাবার নাম শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক।' তিতু ঘাবড়ে গিয়ে পুরোপুরি পরিচয় দিল।

'ওমা, তুই-ই বুঝি সুষমার ছেলে।' মহিলা বললেন, খানিকটা বিস্ময় এবং বেশ হাসি-খুশী মুখে। তিতুর কাছে সরে এসে থুতনি তুলে ধরলেন। 'কি যেন নাম রে তোর?'

'তিতু'—। ঢোঁক গিলে বোকার মতন বলল তিতু। ভাবছিল, মাকে চেনেন ইনি। কি করে চিনলেন? নিশ্চয়ই মার কেউ হবেন। কে?

'বা, বেশ নামটি ত।' তিতুর চিবুক থেকে আঙুল টেনে নিয়ে মহিলা চুমু খেলেন আঙুলে। 'এরা সব কোথায়—? বাড়ি নেই?'

'না।' মাথা নাড়ল তিতু। 'সেন সাহেবের খুব অসুখ। দেখতে গেছে।'

'মিনুকে খবর দিয়েছিলুম, আমরা আসব।' উনি বললেন, 'স্টেশনে নেমে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলুম খানিক। কাউকে দেখতে পেলুম না। গাড়ির স্ট্যাণ্ডে এসেও দাঁড়ালুম

লটবহর কুলি নিয়ে—কোথায় মিনু ? জামাইকেও দেখলুম না। ভাবলুম, এক আধবার দেখেছি, আমিও পোড়া কপাল চিনতে পারছি না, সেও পারছে না।···শেষে ট্যাক্সি করলুম। ভয় করছিল, কিছুই জানি না শুনি না এখানকার। তা কখন ফিরবে সব ?'

তিতুর মুখোমুখি ক'হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল বিনুনি ঝোলানো মেয়েটা। তার কাঁধে আবার একটা সুন্দর ব্যাগ ঝুলছে। নকৃশা করা। তিতু এতক্ষণ ঠিক আলাদা ভাবে ওটা দেখতে পায় নি। এবার দেখল। মেয়েটা কথা বলল। যেন বেশ রেগেছে। চোখের ভুরু একটু কুঁচকে গেছে, কপালও। 'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন যত বকর বকর শুরু করলে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

তিতু দেখল, বেশ রাগ রাগ চোখে মধুর দিকে চাইল মেয়েটা।

'তা যখন আসে আসুক ওরা, আমরা ত আর জলে পড়ি নি—' বুড়ি মহিলা এবার নিজের থেকেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন, 'মুখ হাত ধুয়ে আমরা চা-টা খাই, জিরোই—। মিনুরা ফিরে এসে অবাক হয়ে যাবে।···এই,···এই···কি নাম তোর ···নে জিনিসপত্রগুলো তুলে ঘরে ঢোকা।' মধুর দিকে চেয়ে শেষ কথাগুলো বললেন উনি।

তিতুর হুঁশ হল। অনেকক্ষণ এদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে। মধুর দিকে চাইল তিতু, 'আমার ঘরে নিয়ে চল—'হুকুম করল, এবং কে জানে কেন তার মনে হল, মাসি বা বাবার মতনই শোনাল তার গলা। গোপন একটা সুখ

অনুভব করল তিতু, বড় মানুষের মতন ব্যবহার করতে পারছে ও। এ-বাড়ির মালিকের মতন।

মহিলা এবং মেয়েটিকে নিয়ে নিজের ঘরে এল তিতু। এই-ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে যে বাক্স বিছানা রাখতে দেবে না মাসি—তিতু অনায়াসে তা বুঝে নিয়েছিল।

ঘরে পা দিয়ে মহিলা একবার এদিক ওদিক তাকালেন, ডাইনিংরুম দিয়ে আসার সময়ও চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলেন, তিতু দেখেছে। মধু স্যুটকেস রেখে বেডিংটা আনতে গেল। মেয়েটি কাঁধের ঝোলান বাহারী থলিটা নামিয়ে তিতুর টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে।

'এই ঘরটা বুঝি তোর?' মহিলা শুধোলেন তিতুকে।

মাথা নাড়ল তিতু।

'বাব্বা, এইটুকু ছেলে এতবড় ঘর নিয়ে করিস কি?' মহিলা হাসি মুখেই বললেন।

মেয়েটা আবার যেন কেমন ছটফট করছে। কষ্ট চেপে রাখা মুখ। রাগছে খুব। বার বার তাকাচ্ছে মহিলার দিকে। পাশে গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। কি করল যেন, হাত টানল না চিমটি কাটল মহিলার গায়ে ঠিক বুঝল না তিতু। মহিলা শুধু মুখে একটু জ্বালাতন হবার ভাব করলেন।

'তোদের কলঘরটা কোথায় রে—?' উনি শুধোলেন।

হাত দিয়ে বাথরুমের দরজাটা দেখিয়ে দিল তিতু। কলঘর শব্দটা তার কানে নতুন শোনালো। এ বাড়িতে কখনও এ-শব্দ সে শোনে নি। মধু মালি এরাও কখনো বলে না।

'ওই ত—যা এবার।' মহিলা মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, মহিলা বললেন আবার, 'তোর জামাটামা একেবারে বের করে নিয়ে যা, বকু। ট্রেনের ওই রগড়ানোগুলো ছেড়ে—মুখ হাত ধুয়ে আসিস।'

বকু ফিরে এসে হাত বাড়াল। 'চাবিটা দাও।' থানের আঁচলে বাঁধা গিঁট খুলে চাবি দিলেন মহিলা। বকু উবু হয়ে হেঁট-মুখে বসল সুটকেস টেনে। তাড়াতাড়ি ওলট পালট করে টেনে হিঁচড়ে জামাটামা বের করল। ঘাড়ে খুব ব্যথা হলে যেমন করে ঘাড় ঘোরায়, অনেকটা সেই ভাবে হেঁট মুখে সামান্য একটু ঘাড় ঘুরিয়ে কারও দিকে না চেয়ে শুধলো, 'সাবান টাবান আছে কলঘরে না বের করব?'

প্রশ্নটা কাকে করল বকু তিতু বুঝল না। চুপ করে থাকল।

'তুই নিয়ে যা না।' মহিলা বললেন।

তিতুর কি মনে হল; বলল, 'সাবান তোয়ালে সব বাথরুমে আছে।'

বকু উঠে পড়ল, ডালাখোলা সুটকেস ফেলে রেখেই। হাতে তার জামাটামা। সাবান নেয় নি, গামছাও না। যেতে যেতে বকু বলল, 'তোমার কাপড় সেমিজ বের করে নিয়ে সুটকেসটা গুছিয়ে রেখ দিদিমণি।'

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল বকু।

চেয়ার ছেড়ে তিতুর স্প্রীংয়ের খাটে এসে বসে পড়লেন দিদিমণি। গদিটা সামান্য আওয়াজ করে ঝুলে পড়ল। সোয়াস্তি আর আরাম পেয়ে দু'পাশে হাত ছড়িয়ে সামান্য পিঠ এলিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস টানলেন দিদিমণি। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে।

তিতু থেকে থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল—একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার দেখছিল এই নতুন মানুষটিকে। দিদিমণি! দিদি না দিদিমা—তিতু বোঝবার চেষ্টা করল। যাঃ, অতটুকু মেয়ের এত বড়—বুড়ি দিদি হয় নাকি? নিশ্চয় দিদিমা। দিদিমাকে বকু দিদিমণি বলে। বেশ লাগে ডাকতে দিদিমণি বলে। মনে মনে তিতু বার দুই দিদিমণি ডাকটা বলল, বকুর নকল করে।

দিদিমণিকে আবার একবার দেখল তিতু। ধবধবে ফরসা রঙ, মোটাসোটা খুব, চুল সব পাকা নয়—কাঁচাও আছে, মুখ গোল গোল, ঠোঁট পানে পানে খয়েরী ছোপ ধরা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, কানের কাছে গুটিয়ে আছে, ঢলঢলে, চোখ থেকে ঝুলে নেমে পড়েছে। সাদা জামা, সাদা কাপড়।

কে জানে কেন, তিতুর ভাল লাগছিল এই দিদিমণিকে। সমস্ত চেহারাটাই। মাকে এই-দিদিমণি জানত। হয়ত মার সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

তিতু হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

'হ্যাঁরে, তুই জানিস—মিনু আমার চিঠি পেয়েছিল?' দিদিমণি হঠাৎ শুধোলেন কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে।

'না।' মাথা নাড়ল তিতু। মিনু কি মাসির ডাক নাম? নিশ্চয় তাই। নয়ত মিনু আর কে হবে? আচ্ছা বকুর ভাল নাম কি?

'চিঠিপত্তরের গোলমাল হয় নাকি তোদের এখানে!' একটু হতাশ এবং খটকালাগা গলায় বললেন দিদিমণি।

তিতু চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

ডালাখোলা স্যুটকেসের দিকে চাইল আবার। ঘেঁটে ঘুটে অগোছাল হয়ে পড়ে রয়েছে কাপড় জামা। সাদা থান, ফ্রক, নতুন সাবান…। একটা বইও দেখতে পেল তিতু। আরও যেন কি কি— !

'তিতু সোনা, আমি যে একটু জল খাবো বাবা।' দিদিমণি আচমকা বললেন।

তিতু সোনা….তিতু সোনা…জল খাবো বাবা….। তিতুর কানে ঝিঁঝিঁর ডাকের মত কথাগুলো বাজতে লাগল। মা বলত, মা ডাকত, তিতু সোনা—বাবা…। এই আদরের ডাক তিতুর বুকের মধ্যে গলতে লাগল। কেমন লাগছিল তার।

'মধুকে বলছি।' তিতু চলে যাচ্ছিল।

'দূর বোকা ছেলে—!' দিদিমণির নরম ধমকে তিতু দাঁড়াল। তাকাল। 'তোর ওই পাজামা পরা খানসামার হাতের জল খাব নাকি আমি ?'

তিতু ভীষণ অবাক। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। 'মধুই ত আমাদের জল দেয়, রান্নাবান্না করে।'

'তোমরা সাহেব বাবা, আমি ত সাহেব নই, মেমসাহেবও নয়। আমার কি ওই এঁটো কাঁটা মাছ মাংসের হাতে জল খাওয়া চলে ?'

দিদিমণি ভাবলেন তিনি তিতুকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই দু-চারটে কথায়। তেমন ভাবেই হাসলেন। তিতু মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝল না। তবু খানিকটা বুদ্ধি তার যুগিয়ে গেল। বলল, 'আমি নিয়ে আসি ?'

'তুই! তা আন…. ছেলেমানুষে কোন দোষ নেই। লক্ষ্মী বাবা, তোদের রশুন পেঁয়াজের গেলাসে আনিস

না।…ওই ত আমার গ্লাসই আছে—ওই থলির মধ্যে—নিয়ে যা।'

বকুর রেখে দেওয়া থলি থেকে কাচের গ্লাস বের করে তিতু চলে গেল জল আনতে।

ফিরে এল যখন—তখন বাথরুমের দরজা সামান্য খুলে বকু ডাকছে, 'দিদিমণি—!'

'কি?'

'শোনো একবারটি এখানে।'

দিদিমণি উঠলেন, বাথরুমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিতু শুনতে পেল না, বকু কি বলছে। দিদিমণির গলা অবশ্য শুনতে পেল। উনি বলছিলেন, 'এক পাশে ছেড়ে রেখেছিস? থাক্ না। তুই বেরো, আমি সব কেচে টেচে দেব।'

বাথরুমের দরজা আবার বন্ধ করল বকু। ফিরে এলেন দিদিমণি। তিতুর হাত থেকে গ্লাস নিয়ে আলগোছে জল খেলেন, থলি থেকে পানের কৌটো বের করে নিয়ে ছোট্ট মতন এক খিলি পান খেলেন, জর্দাও সামান্য।

'তোরা কাপড় চোপড় শুকোতে দিস কোথায়?'

'মাঠে। বৃষ্টি হলে ওই বারান্দায়।' তিতু জবাব দিল। তারপর হঠাৎ খুব বুদ্ধিমানের মত বলল, 'আপনারা কাপড় চোপড় কাচবেন না। সব ওই বাথটবটার মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিন—কাল সকালে মালির মেয়ে কেচে দেবে।'

দিদিমণি মিষ্টি মুখে একটু হাসলেন। কিছু বললেন না আর….ডালাখোলা অগোছাল সুটকেসের সামনে কোল পেতে মাটিতে বসলেন। সুটকেস গুছোতে লাগলেন। তিতু

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ক'খানিই বা কাপড় জামা। গুছোতে সময় লাগল না। দিদিমণি নিজের জন্য একটা থান, জামা, সেমিজ বের করে কোলের ওপর রাখলেন। ডালা বন্ধ করে দিলেন সুটকেসের। বললেন, 'এ-দিকের গাড়িতে বেশ ভিড় হয়। আমরা মেয়েদের কামরায় উঠে পড়েছিলাম। তাও কি কম ভিড়।'

তিতুর ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, দিদিমণিরা কোথা থেকে আসছেন। কলকাতা থেকে! মাসির কে হন এঁরা! তার মাকে কি দিদিমণি দেখেছেন! কখন দেখেছেন?

সাহস করে তিতু কথাটা বলব বলব করছে এমন সময় বাথরুমের দরজা খুলে গেল। বকু বেরিয়ে এসেছে। ঘরে পা দিয়েই বকু পর পর তিন চার বার হাঁচল।

'খুব জল ঘাঁটলি ত?' দিদিমণি বললেন।

'মুখ হাত ধোব না—? বাব্বা কী কয়লার গুঁড়ো আর ধুলো! সাবান দিতে কালো কালো জল বেরুল—। মাথাটা কির কির করছে। কাল আমি মাথা ঘষবো দিদিমণি।'

'কালকের কথা কাল—' স্প্রীংয়ের খাট ধরে বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন দিদিমণি। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'পরিষ্কার করে আমার জন্যে একটু চা তৈরী কর, এসে খাবো।'

'আমিও খাবো।'

দিদিমণি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিতু চুপ করে দাঁড়িয়ে। দিদিমণি না থাকায় কেমন অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। বকু তাকে আর তার এই ঘর দেখছে। এখুনি যে কি একটা বলে বসবে—তিতু বুঝতে

পারছিল না। তার একরকম ভয়ই করছিল। দিদিমণির জন্য চায়ের জল বসাবার কথা বলতে যাবে কিনা ভাবছিল।

বকু কিন্তু একটাও কথা বলল না। তিতুকে আর দেখছে না। বেশ তন্ময় চোখে ঘরের আসবাবপত্রগুলো দেখছিল। নাক টানছিল থেকে থেকে। দু'চার পা এদিক-ওদিক করল ঘাড় তুলে আপন মনে। তারপর দেওয়ালের কাছে দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখবার চেষ্টা করল একবার। দেরাজটা এত উঁচু যে গলা ঠেকে যায় কাঠে। একটা খোলা বড় মতন আয়না দেরাজের ওপর পিঠ হেলিয়ে রাখা আছে। কাচটাও খুব পরিষ্কার নয়। বকু বোধ হয় মুখ দেখতে পারল না। চিরুনিটা হাতে ঠেকল। হাত বাড়িয়ে নিল বকু। ছোট্ট চিরুনি, একবার দেখে নিল দাঁতগুলো আঙুল ঘষে।

'এটা তোমার চিরুনি?' বকু ঘাড় ফিরিয়ে শুধলো তিতুকেই।

মাথা নাড়ল তিতু।

চিরুনি কপালের ওপর চুলে ঠেকিয়ে বকু আবার বলল, 'তোমার আয়না স্বর্গে তোলা, মুখ দেখ কি করে?'

তিতু থতমত খেয়ে গেল। আয়নাটা উঁচুতে ঠিকই। তিতু নিজে যখন চুল আঁচড়ায়, একটা চেয়ার টেনে নেয় দেরাজটার কাছে। চেয়ারের ওপর হাঁটু মুড়ে—নিলডাউন হয়ে বসে; চুল আঁচড়ায়···মুখে কিছু না বলে তিতু একটা চেয়ার টেনে দেরাজের কাছে এগিয়ে দিল।

'এর ওপর দাঁড়াবো?' বকু চোখ বড় বড় করে শুধলো।

'নিলডাউনের মতন হয়ে বসলেই....' তিতু বাকিটুকু আর শেষ করল না কথার।

বকুর অবাক লাগছিল; মজাও পাচ্ছিল। চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে একবার দেখে নিল। 'উলটে পড়ি যদি?'

'না, উলটবে না।' তিতু ভীতু মেয়েটাকে সাহস দিল। আর এই প্রথম তার মনে এমন একটা ভাব এল যে, নিজেকে সে বকুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবতে পারল। এই জটিল অস্পষ্ট বোধটা তিতুকে খুশী করল। তার লাজুক ভাবও খানিকটা কাটিয়ে দিল। 'চেয়ার আমি ধরে থাকব।' তিতু আচমকা বললে।

বকুর কিন্তু চেয়ার ওলটানোর ভয় বাস্তবিকই হয় নি। ব্যাপারটা তার কাছে উদ্ভট লাগছিল। মজার লাগছিল!.... চেয়ার টেনে বকু উঠে পড়ল। হাঁটু মুড়ে নিলডাউন হবার ভঙ্গিতে বসল। আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ হেসে উঠল খিল খিল করে।

তিতু বুঝতে পারল না হাসির কি পেল বকু! হাঁ করে চেয়ে থাকল।

কপালের ওপর সামনের দিকটায় উসকো খুসকো চুল-গুলোকে একটু আঁচড়ে চিরুনিটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল বকু।

'এই, এখানে এই পাউডারটা কার?' পাউডারের কৌটো হাতে তুলে বকু ঘাড় ফিরিয়ে শুধলো।

'আমার।'

'তোমার!...তুমি পাউডার মাখো?'

ঘাড় নাড়ল তিতু। হ্যাঁ, মাখেই ত! কি হয়েছে তাতে! মাসি মাখতে বলেছে।

'এমা, মেয়েছেলে নাকি রে!' বকু ঠোঁটের বিচিত্র এক ভঙ্গি করল। খানিকটা পাউডার ঢেলে ঘাড় গলা মুখে মাখল। ধব ধব করতে লাগল মুখটা। আয়নায় সেই মুখ দেখে বকু আবার হি হি করে হেসে উঠল।

'এই কেমন দেখাচ্ছে—; ভূতের মতন ঠিক্, না—'

তিতুরও হাসি পাচ্ছিল। একটু হাসল তিতু। ঠোঁটে ঠোঁটে। বকুর মতন জোরে অমন করে সে হাসতে পারে না। হাসি তিতুর কম। খুব কম।

চেয়ার থেকে বকু নেমে পড়ল। মুখ হেঁট করে ফ্রকের আগা দিয়ে ঝটপট মুছে নিল। তিতুর দিকে মুখ তুলে তাকাল, 'গেছে পাউডার?'

'হ্যাঁ;···কানের তলায় আছে একটু।'

'কোন্ কান?'

'ও দিকের—'

'কিরে, কোন্ কান? ডান না বাঁ?' বকু যেন ছোট্ট করে ধমক দিল, আবার সেই নাক ঠোঁট কুঁচকে, কেমন এক ভঙ্গি করে।

'বাঁ।' চট্ করে বলল তিতু ঘাবড়ে গিয়ে। তিতুর যেটা ডান বকুর সেটা বাঁ। ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়িতে সে-হিসেব ওর মাথায় এল না।····বকু তার বাঁ কানে হাত তুলতেই তিতু ভুল বুঝতে পারল।

'না—না—ওটা নয়; বাঁ—।' মাথা নেড়ে ভুল শুধরোল তিতু।

'কিরে, একবার এটা একবার ওটা—।' বিরক্তির ধমক দিয়ে বলল বকু। কানের এ-পাশটাও মুছল। 'গেছে—?'

'আর একটু আছে, কানের মধ্যেও।'

'দূর বাবা! কি পাউডার এটা?' বকু ভুরু কোঁচকাল। 'মুছে দাও।'

তিতু আলনার দিকে তাকাল। মোছার জন্যে কি একটা নেওয়া যায় ভাবল। ছোট জিনিস কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত একটা শার্টই পেড়ে নিল তিতু আলনা থেকে।

পাউডার মুছে দেবার সময় তিতু সাবানের আর পাউডারের গন্ধ পাচ্ছিল।

'খুব মজা করে কান মলে দেওয়া হচ্ছে—না?' বকু ঠেলে হাত সরিয়ে দিল তিতুর।

'কই না।' মাথা নাড়ল তিতু। মাথা ঝাঁকালো জোরে।

'বই কি! আমি বুঝি না। খুব চালাকি!' বকু চোখ ভুরু কুঁচকে আবার ছোট করে ধমক দিল।···তিতু সরে গিয়ে শার্ট রেখে দিল আলনায়। বকু মিথ্যে মিথ্যে কান মলার কথা বলছে।

বকু এবার ঘুরতে ঘুরতে তিতুর পড়ার টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। একটা বই তুলে নিল। দেখল। আরও এটা ওটা টেনে বার করল।

'তোমার ভাল নাম তীর্থপতি?' বকু শুধলো।

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল তিতু।

'আমার ভাল নাম বকুল।' বকু বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল। টেবিলের ওপর হেলে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা বিনুনি এখন গলার পাশ দিয়ে

বুকের ওপর ঝুলছে, আর-একটা পিঠের ওপর পড়ে আছে। 'আমার আরও একটা ভাল নাম আছে। বড্ড বড়।' বকু হাতের বই রেখে দিয়ে এবার তিতুর লেখার খাতা দেখতে লাগল।

তিতু ভাবছিল, বকু তার অন্য ভাল নামটাও বলবে। বলছে না দেখে তিতু চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্য নামটা বলল না বকু। খাতা রেখে—এবার খানিকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল; এতক্ষণ একটা পায়ের হাঁটু খানিকটা মুড়ে—অন্য পা গাছের ডালের মত বেঁকিয়ে টেবিলের ওপর পেট বুক মাথা নুইয়ে রেখেছিল।

'তোমার ক্লাস এইট্?' বকুর চোখের পাতা পড়ল পর পর ক'বার। বই খাতা থেকেই জানতে পেরেছে সব। 'আর মাত্র দুটো বছর—তারপরই ম্যাট্রিক তোমার।'

'তুমি স্কুলে পড়?' তিতু শুধলো।

'পড়ব না! কি ছেলেরে'—বকু সামনের দিকের বিনুনিটা হাতে তুলে গলার কাছে নাচাতে লাগল। 'আমি সেভেনে পড়ি।'

বাইরে বারান্দা থেকে কে যেন ডাকল। শান্ত কিন্তু মোটা গলায়। তিতু চিনতে পারল।

'মাস্টার মশাই।'

'প্রাইভেট মাস্টার? পড়বে এখন তুমি?' বকুর পছন্দ হল না।

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ—?'

'ন'টা পর্যন্ত।'

'বাইরে বসে বসে ?'

মাথা নাড়ল তিতু। বাইরে বসে সে পড়ে না। এই ঘরে বসেই পড়ে। 'না, এ-ঘরে।'

'আহা, তা হলে আমরা কোথায় যাব ?···দিদিমণি ত এখুনি এসে বিছানায় গা দেবে। যা ধকল গেছে সারাটা দিন।'

তাইত, দিদিমণিরা যাবে কোথায়! তিতু সমস্যায় পড়ল। কি করা যায় ? বাইরে বসেই পড়বে নাকি আজ।

'আজ ছুটি নিয়ে নাও না, শনিবার ত। কাল রবিবার।' বকু তার স্বভাব মতন নাক গাল কুঁচকে বলল। মোটেই পছন্দ নয় তার এখন তিতু পড়তে বসে।

'কাল ছুটি। আবার আজও···' তিতুর গলায় দ্বিধা।

মাস্টার মশাই কাছেই কোথাও পায়চারি করছেন। বকু হাঁটা ফেরার শব্দ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা এলাম আজ—আর তোমার শুধ্ পড়া—একদিন না পড়লে কি হয়!'

তিতুরও খুব ইচ্ছে হল, আজ ছুটি চেয়ে নেয়। তারও ভাল লাগছে না পড়তে বসতে। কিন্তু মাসি যদি ফিরে এসে দেখে তিতু পড়তে বসে নি, মাস্টার মশাইকে চলে যেতে বলেছে—তবে—? মাসির সেই রাগে শক্ত হয়ে আসা মুখ আর রুক্ষ চোখের ছবি তিতু অনায়াসেই দেখতে পেল। মুষড়ে পড়ল তিতু। মন ভেঙে গেল।

'মাসি রাগ করবে।' আস্তে গলায় বলল তিতু। শুকনো মুখে।

'মাসি, কে মাসি—?' বকু অবাক।

বকু মাসিকে চেনে না! দেখে নি মাসিকে? বা, ওরা ত মাসির কাছেই এসেছে। তিতু এই ধাঁধা বুঝতে না পেরে নিজেও অবাক এবং অসহায় চোখে চেয়ে থাকল বকুর দিকে।

'তুমি মিনুপিসির কথা বলছ?' বকু আন্দাজ করে নিয়ে বলল।

তিতু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। কেমন যেন অন্যমনস্ক, আচ্ছন্ন। মাসি যে বকুর পিসি হয় তিতু এই জানল।

মাস্টার মশাইয়ের পায়ের শব্দ আবার দূরে সরে গেছে। পায়চারি করছেন। কিংবা চেয়ার টেনে বসেছেন বারান্দায়। তিতু সাড়া না-দেওয়া পর্যন্ত ঘরে আসবেন না।

বকু একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে তিতুকে দেখছিল। 'মিনু পিসিকে তুমি মা বলো না—?'

তিতু বিহ্বল অসহায় ক্ষুব্ধ এবং কেমন এক অর্থশূন্য চোখে চেয়ে আছে। চোখ দিয়েই যেন বলছে, না, বলি না; মা বলি না।

বারান্দা থেকে মাস্টার মশাইয়ের ডাক আবার একবার ভেসে এল। তিতু নড়ে চড়ে উঠল। বলল, 'আমি বাইরে বসে পড়ব।' তিতু মাস্টার মশাইকে বসতে বলতে গেল।

একটু পরে তিতু বই পত্র নিতে ফিরে এল ঘরে, দেখল দরজার পরদা একপাশে সরিয়ে বকু দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে খানিকটা গুটনো পরদা, দরজার পাল্লায় গা হেলান। বারান্দার আধো অন্ধকার, ঘরের আলো—দুই মিলেমিশে বকুকে অনেকটা যেন বড় বড় দেখাচ্ছে।

'কোন্ ফুলের বেশ সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে তিতু?' বকু শুধলো।

দাঁড়িয়ে পড়তেই তিতু গন্ধটা পেল। 'শিউলি ফুলের।'

'খুব সুন্দর ত!'

'ওটা আমার গাছ। আমি এনে বসিয়েছিলাম।' তিতু থামল একটু। খুশী গলায় বলল আবার, 'আমার গাছটায় এই সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে।'

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। চাঁদ উঠেছে। বাগানের ঘাসে, করবী আর ডালিম ঝোপে জ্যোৎস্নার মিহি আলো। গাছগাছালির পাতায় কালো রঙ—তবু চাঁদের আলোয় চেহারাটা স্পষ্ট। বেতের গোল টেবিলের ওপর বই সাজিয়ে পড়তে বসেছে তিতু। মুখোমুখি মাস্টার মশাই।

মাথার ওপর জোরাল বাতি, ফ্যান ঘুরছে হু হু করে। তিতুর চোখ বার বার চঞ্চল হয়ে উঠছে।

পড়ায় মোটেই মন বসছে না তিতুর। ছটফট করছে; ভেতরে ভেতরে। চোখের সামনে মেলা ইংরিজী বইয়ের লাইনের ওপর দিয়ে দুটো চোখ ছুটতে পারছে না। পিছলে পিছলে পড়ছে। ঘরের মধ্যে দিদিমণি এখন কি করছে, বকু কি বলছে—তিতু তাই ভাববার চেষ্টা করছে বার বার।

একটু আগেই বকু একবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে তাকে ডেকেছিল। উঠে গিয়েছিল তিতু। দিদিমণির চায়ের ব্যবস্থা করা হয় নি। ইস···কথায় কথায় তিতু বকু দুজনেই তখন ভুলে গিয়েছিল চায়ের কথা। দিদিমণি এখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে বকুকে দিয়েছেন এক ধমক। বকুর তাতে কিছুই না। গ্রাহ্যই করল না ধমক টমক।

চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিতু আবার ফিরে এসে পড়তে বসেছে। নানারকম কথা মনে আসছিল। দিদিমণির রাতের খাবারের কথা ভেবে ভেবেও তিতু কুল পাচ্ছিল না। মাসি ফিরছে না। রাত বেড়ে যাচ্ছে। দিদিমণির খাবারের কিছু ঠিক হচ্ছে না। অস্বস্তি লাগছিল তিতুর।

হঠাৎ নজর গেল তিতুর—বকু আবার বাইরে বারান্দায়। তার ঘরের সামনে ঘুর ঘুর করছে। ওদিকটায় আলো তেমন জোর নয়। তিতু বুঝতে পারল বকু বাগানের জ্যোৎস্না দেখছে। তার দিকেও বার বার চাইছে। কেন, তাও তিতু জানে। একা একা ভাল লাগছে না বকুর। চঞ্চল চোখে তিতু একটু ও-দিকে তাকিয়ে নিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ দিল।...খাটো গুন গুন গলায় রিডিং পড়তে লাগল : ইট্ ওয়াজ এ স্মল্ শিপ্...দি সি ওয়াজ কাম্ · স্মল্ ওএভস্...।

তিতু ঘাড় ঘুরিয়ে আবার তাকাল। ঠিক যা ভেবেছিল, বকু ঘুর ঘুর করতে করতে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। গোলাপ ফুলের টবটার কাছে। মাঠের জ্যোৎস্নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে নোখ কাটছে। একটু আলো এসে পড়েছে তার মুখে ঘাড়ে। তিতুর মনে হল, বকু তার পড়া শুনছে। আবার হঠাৎ মনে হল, পড়া নয়, বকু শিউলি ফুলের গন্ধ শুঁকছে।

'তোমার আজ পড়ায় মন নেই তিতু।' মাস্টার মশাই বললেন আচমকা।

তিতু একটু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

'ওরাই এসেছে নাকি?' মাস্টার মশাই কি ভেবে শুধোলেন বকুর দিকে আঙুল দেখিয়ে।

'হ্যাঁ'। তিতু ঘাড় নাড়ল।

'কি নাম মেয়েটির?'

'বকু—।'

'হুঁ—!...ডাক ত ওকে।'

'বকু!' তিতু ডাকল। ওর ভয় হল, মাস্টার মশাই না বকুকে ধমক দেয় পড়ার সময় বিরক্ত করার জন্যে।

বকু তাকাল; এগিয়ে এল না। তিতু আবার বলল, 'মাস্টার মশাই ডাকছেন।' অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে বকু আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল।

মাস্টার মশাই একটুক্ষণ দেখলেন বকুকে। 'তোমার নাম বকু?'

'ভাল নাম বকুল।'

'কোথায় থাক তোমরা?'

'কলকাতা।'

'কলকাতা—কোথায়?'

'ভবানীপুরে।'

'কোন স্কুলে পড়?'

'বাণী বিদ্যালয়—; ক্লাস সেভেনে।'

মাস্টার মশাই আরও দু' চারটে কথা জিজ্ঞেস করলেন। চটপট জবাব বকুর। একটুও ভয় করল না। তিতু অবাক এবং মুগ্ধ হচ্ছিল। তিতুকে যদি অচেনা কেউ এ-ভাবে ডেকে কিছু শুধোত—এত ঝটপট জবাব দিতে পারত না ও।

'তিতুকে আজ ছুটি দিয়ে দিন না—' বকু ফট করে

বলল। বলে মাস্টার মশাইয়ের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকল যেন ছুটি হয়ে যাবেই।

কি যেন ভাবলেন মাস্টার মশাই বকুর দিকে চেয়ে। বললেন, 'ছুটি দিয়ে কি হবে, বরং তুমি বস এখানে? কটা অংক কর।' মাস্টার মশাই হাসি চেপে বকুর মতামত শোনার আশায় চেয়ে থাকলেন।

তিতু একবার মাস্টার মশাই, একবার বকুর মুখের দিকে তাকাল।

'অংক—!' বকু ঠোঁট কুঁচকে তেঁতো খাওয়ার মতন মুখভঙ্গি করল, 'অংক-টংক আমার ভাল লাগে না।'

'অংক ভাল লাগে না! কি ভাল লাগে তবে?'

'বাংলা....ইতিহাস ..'

'ছুটি?'

বকু মাস্টার মশাইয়ের হাসি চাপা মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করল।

মাস্টার মশাই এবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'আচ্ছা তবে ছুটিই দিয়ে দেওয়া গেল তিতুকে। পড়ায় ওর একদম মন বসছে না।'

মাস্টার মশাই চলে যেতেই বকু সগর্বে বলল, 'দেখলে ত কেমন ছুটি করিয়ে দিলুম।'

বইপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে তিতু বলল, 'অসুখ না করলে আমি ছুটি পাই না। মাসি তা হলে ভীষণ রাগ করে।' তিতুর গলার স্বরে আশংকা, ছুটি পাবার খুশী তেমন নেই।

বকু কি ভাবল তিতুর দিকে চেয়ে চেয়ে। 'মিনুপিসিকে তুমি খুব ভয় পাও, না?

তিতু জবাব দিল না। বইগুলি গুছিয়ে হাতে তুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

'মিনুপিসি তোমায় মারে?' বকু সহানুভূতির সুরে শুধলো।

এবারও তিতু জবাব দিল না। সামনে মাঠের ফিকে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকল।

চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে তিতু ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। পাশে পাশে বকু। তিতুর ভয় ভাঙাচ্ছে এমন গলায় বকু বলল, 'মিনুপিসি যদি এখন ফিরে আসে—আমি বলব আমি ছুটি করিয়ে নিয়েছি।'

ঘরের কাছে এসে বকু আবার বলল, 'তুমি বড় ভীতু। আমি কাউকে ভয় পাই না। ভয় খারাপ। ভয় করলে লোকে ভীতু হয়ে যায়।'

তিতু যেন খুব মন দিয়ে বকুর কথা শুনল। 'ভীতু হলে কি হয়?' আচমকা শুধলো।

কি হয়? কি যে হয় বকু তার সঠিক জবাব মনে করতে পারল না। খুব অস্পষ্ট মনে আসছে আসছে-না হয়ে অনেকগুলো কথাই জট পাকিয়ে গেল। ভীতু হওয়া যে খারাপ খু-ব খারাপ,—এর বেশি আর কিছু তার মনে এল না।

'ভীতু হলে ঘেন্না করে লোকে।' বকু বলল, বলেই যেন বুঝল—ঠিক হল না। আবার বলল, 'ভীতুরা কিচ্ছু করতে পারে না—কিচ্ছু না।'···এবারও যেন ঠিক ঠিক হল না। বকু ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে হঠাৎ আবার বলল, 'খরগোশরা খুব ভীতু। তুমি কি খরগোশ? বেড়াল?'

তিতুর মনে কেমন করে যেন এক আক্রোশ জেগে উঠেছে। ভয়ের ওপর, নিজের ওপর, মাসির ওপর। বাবার ওপরেও। এই বাড়ির সব কিছুর ওপরেই বোধ হয়।

নয়.

ধীরে ধীরে রাত বাড়ল। মাসিরা ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। দিদিমণিদের দেখে মাসি সত্যিই অবাক। বকুকে দেখে চিনতেই পারল না। কবে ছেলেবেলায় দেখেছিল। চেহারাটাও মনে করতে পারল না। 'বেশ বড় হয়ে গিয়েছিস যে! রঙটা কই ফরসা হল না ত!' মাসিই বলল বকুকে। মাত্র ওই ক'টা কথা—কী আর দু'চারটে টুকটাক···। বকু মাসির ওপর খুশী হল না।

দিদিমণি, তিতু পরে জানতে পারল, মাসির মামিমা হয়। মাসি দিদিমণিকে মামি মামি করছিল।····তিতুর কেন যেন মনে হল, দিদিমণিরা এখানে আসায় মাসি মোটেই খুশী হয়নি। খুশী হওয়ার মতন দেখাচ্ছিল না মাসিকে। চিঠির কথা তুলল দিদিমণি, মাসি মাথা নাড়ল, কই না—কোনো চিঠি পায় নি।

সেন সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরে খবর পেয়েই মাসি এ-ঘরে এসেছিল। খানিকটা কথা বলার পর মাসি উঠে গেল। ···বকু বলল দিদিমণিকে, মিনুপিসি কত সেজেছে।'

'মেম সাহেব হয়েছে যে!'···দিদিমণি বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, 'সবই কপাল। কি মেয়ে কী হল। কপালে ওর সুখ লেখা ছিল—। সুখেই থাকুক।'

দিদিমণির কথা বুঝল না ভাল করে তিতু। বুঝল না, কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল। দিদিমণিও কি মাসির ওপর খুশী হয় নি!

খাঁওয়া দাওয়া সারা হয়ে গেলে এ-ঘরে বিছানা করতে এল মধু। মাসির কথা মতনই। তিতুর স্প্রীংয়ের খাটে দিদি-মণি আর বকু শোবে। তিতুর জন্যে একটা ক্যাম্প খাট নিয়ে এল মধু, চাকরের ঘর থেকে। খাটটা পড়েছিল, ক্যাম্বিসে গন্ধ হয়ে গেছে। তার ওপরেই বিছানা করে দিল।

এখন দশটা বাজে। তিতু আর বকু ঘরের মধ্যে। দিদি-মণি বাইরে বারান্দায় মাসির সঙ্গে কথা বলছে। বাবা সেখানে অল্প একটু বসে ছিল। উঠে গেছে।

ক্যাম্প খাটে শুয়ে রয়েছে তিতু, স্প্রীংয়ের খাটে উপুর হয়ে বকু হাতের ওপর ভর রেখে মুখ তুলে তিতুর দিকে চেয়ে বক্ বক্ করছে।

'নদীতে তুমি যাও নি কোনোদিন—?' বকু শুধলো, আগের কথার জের টেনে।

'না। অনেকটা দূর। সাইকেল থাকলে যাওয়া যায়।'

'তোমাদের ত মটরগাড়ি আছে।'

'কে নিয়ে যাবে?'

'বারে, কেন—পিসেমশাই।'

'বাবা আমায় কোথাও নিয়ে যায় না বেড়াতে।' তিতু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল।

বকু একটু চুপ করে থাকল। কি ভাবল, বলল, 'নদী দূরে, এরোপ্লেননামা মাঠ লাইন পেরিয়ে—যা বলি তোমায় সবই না না, ধ্যুৎ তুমি কি—কোথাও যাও না নাকি বেড়াতে?'

'না।' মাথা নাড়ল তিতু, 'আমায় কোথাও যেতে দেয় না।'

'করো কি তাহলে সারাদিন—? শুধু স্কুলে যাও আর বাড়িতে এসে বসে থাক?' বকু যেন একটু বিরক্তই হল।

তিতু কিছু বলল না।

বোধহয় মিনিট খানেকও চুপ করে থাকল না বকু। আবার কথা বলল। 'এত বড় মাঠ রয়েছে—তুমি ব্যাট্‌মিন্‌টন্‌ কোর্ট করে খেল না কেন? নেট্‌বলও খেলা যায়।'

'আমি জানি না।'

'খুব সোজা, আমি জানি। বন্ধুদের এনে খেললেই পার।'

'আমার বন্ধুটন্ধু নেই।'

'বন্ধু নেই! যাঃ মিথ্যে কথা! বন্ধু আবার কার না থাকে!...আমাদের টুনুরও বলে বন্ধু আছে...' বকু হেসে উঠল টুনুর কথা ভেবেই বোধ হয়।

'টুনু কে?'

'আমার বোন। ছোট্ট। এইটুকু। তারও এক বন্ধু আছে।' বকু হাত দিয়ে তিন বছরের বোনের মাথার মাপ দেখিয়ে আপন মনেই হাসতে লাগল।

'ক্লাসের দু'জনের সঙ্গে আমার একটু ভাব আছে।' তিতু যেন শেষ পর্যন্ত লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যে বলল।

'একটু ভাব থাকলে বন্ধু হয় না।' বকু মাথা নেড়ে বলল, 'খুব ভাব হলে তবে।...আমার তিনজন বন্ধু আছে—বাসন্তী, হাসি আর সোনা।' একটু থামল বকু, বোধ হয় কিছু ভাবল। 'বাসন্তী খুব সুন্দর দেখতে, এত ভাল গান গায়! ও আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধু।'

তিতু চুপচাপ শুনছিল। কাত হয়ে শুয়ে। বকুকে দেখার জন্যেই পাশ ফিরে শুয়েছে।

'আচ্ছা, একটা ধাঁধা বল ত! খু-উব সোজা। বাসন্তীটা আমাকে ঠকিয়েছিল।' বকু বালিশে ভর দিয়ে আরও খানিক মুখ তুলে ধরল, 'ভাল করে শুনবে, আমি কিন্তু বারবার বলব না। আচ্ছা বলো—কাননেতে থাকি আমি, অরণ্যতে নাই; কলকাতার মাঝে আমি থাকি দুই ঠাঁই, শিক্ষকেতে আছি আমি পণ্ডিতেতে নাই।··আবার শোনো একবার, কাননেতে····।' বকু পর পর তিনবার ধাঁধা শুনিয়ে থেমে গেল। তারপর তিতুর দিকে চেয়ে থাকল সকৌতুক কৌতূহলে।

এক বিন্দু কিছু ঢুকল না তিতুর মাথায়। জিনিসটা যে কি, তিতু বুঝতেই পারল না। শূন্য নির্বোধ চোখে তাকিয়ে থাকল।

বকু আবার একবার প্রতিটি লাইন ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সাদামাটা ভাষায় বলল হেঁয়ালিটা। তিতু শুনল। মুখ খুলল না।

'কি, বলো?'

'কে জানে!'

'এটাও জানো না?'

'না।'

'ধ্যাত্, তুমি একটা হাঁদা। 'ক'···'ক' অক্ষর—বুঝলে না। কাননে ক আছে, অরণ্যতে নেই, ক-ল-কা-তা-য় দু জায়গায়—' বকু অংক বুঝোবার মতন করে বুঝিয়ে দিল।

তিতু বুঝল। খানিকটা মজা পেল। বলল, 'আর একটা বলো।'

'আর একটা—! আচ্ছা, দাঁড়াও।' বকু বেশ প্যাঁচালো একটা হেঁয়ালি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

দিদিমণি ঘরে এলেন। বারান্দা থেকে মাসি উঠে গেছে। মধ্যের ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ; বাতি নিভানো। ঘরে ঢুকে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন দিদিমণি।

'তোরা এখনও ঘুমোস নি—বক্ বক্ করছিস। কত রাত হল তা খেয়াল আছে।' বকুর দিকে চেয়ে দিদিমণি বললেন।

তিতু বা বকু কেউ জবাব দিল না। বকু আধভোলা হেঁয়ালিটা বিড় বিড় করে একবার আওড়ে নিল। তারপর বলল, 'আচ্ছা বলো,···না থাকি গাছে, না থাকি ডালে; লতায় পাতায় বনে কিংবা চালে, পায়ে সোনা বাকি্য গোনা, ফল জলে নিত্য কানা।'

তিতু ভাবতে লাগল। দিদিমণি জল খেলেন, পান মুখে পুরলেন—বাথরুমে যেতে যেতে বললেন, 'বকর বকরটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখে দিয়ে ঘুমো ত বাপু।

তিতু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না—জিনিসটা কি, গাছেও থাকে না ডালেও থাকে না, লতা পাতা বনেও নয়। চালেও না—। খটকা লাগল তিতুর। কি চাল? বকুর মুখের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল তিতু, যেন এই শব্দটা দিয়ে বকু তাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।

'কি চাল? খাবার চাল, না বাড়ির চাল?' তিতু শুধলো।

'বাড়ির।' বকু কনুই ভর দেওয়া হাতের পাতায় মুখ রেখে পিট পিট করে চেয়ে থাকল। পা ছুঁড়ে যাচ্ছে একটানা, যেন বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে সাঁতার কাটছে।

আকাশ পাতাল অনেক ভাবল তিতু। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বলল, 'কি জানি, আমি জানি না।'

'কোনটা তুমি জানো! বোকার বোকা'। বকু যেন তিতুকে এক কথায় তুচ্ছ করে দিল। 'এত সোজা একটা জিজ্ঞেস করলাম—তাও পারলে না।....খাঁচার পাখি...খাঁচার পাখি দেখ নি কখনও?' বকু হেঁয়ালির উত্তরটা শুনিয়ে তারপর বুঝিয়ে দিল কথাগুলো—খাঁচার পাখি কোথায় থাকে, গাছে না ডালে না লতায় পাতায় ঘরের চালের মাথাতেও নয়, তার পায়ে সোনা বাঁধা শেকল, শেখানো বুলি বলতে পারে, ভাল ভাল ফল খায়...।'

তিতুর যেন একটু আফসোসই হল। না, এটা সোজাই ছিল। পাখির কথা তিতুর একবার মনেও হয়েছিল। বকুর মুখ থেকে উত্তরটা শোনার পর, খাঁচার পাখি...পাখি....মনে মনে আওড়াতে গিয়ে অনেকবার পড়া কবিতাটা মনে পড়ল।...তিতু যে একেবারেই বোকা নয়, কিছু জানে না—এই লজ্জা কাটাতে আপন মনে কথা-বলার ভান করে বকুকে শুনিয়ে আওড়াল, 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে! একদা কি করিয়া...'

'থাক, আর মুখস্ত বলতে হবে না।' বকু বাধা দিল; তারপর আচমকা বলল, 'তুমি নিজেই ত একটা তাই।'

'কি?'

'খাঁচার পাখি।' কেমন এক সুরে হেসে উঠল বকু।

প্রথমটায় তিতু ঠিক বুঝতে পারল না। কয়েক মুহূর্তের বিমূঢ়তার পর, পাখির একটা খাঁচা মনের মধ্যে দুলছে, বুঝতে পারল। দুলে দুলে উঠতে লাগল খাঁচা। নিজেকে

সেই খাঁচার মধ্যে পাখির চেহারায় কল্পনা করবার চেষ্টা করল তিতু।

দিদিমণি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কি যেন বললেন ; তিতু শুনতে পেল, বুঝতে পারল না।....বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন উনি। স্প্রীংয়ের খাটে একটা শব্দ উঠল। অস্ফুট একটা শব্দ করল বকু। হয়ত কোথাও লেগেছে তার।

ঘর অন্ধকার। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে— বাতাস-কাটা মৃদু একটা শব্দ। তিতু চুপ। বকুও চুপ।

অল্পক্ষণের অটুট একটা স্তব্ধতা যেন বাতি-জ্বালা আগের ঘর আর এখনকার অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা আড়াল ফেলে দিয়ে আলাদা করে দিল।

'তিতু!' বকু আস্তে করে ডাকল।

'কি?'

'এই ঘরে তুমি একলা শোও?'

'হ্যাঁ।'

'ভয় করে না?'

'না।' তিতু বলল। বলেই মনে পড়ল, বকু তাকে ভীতু বলেছিল সন্ধ্যেবেলায়। বলেছিল, ভীতু হওয়া খারাপ। বকুর নিজেরই এখন ভয় করছে। মনে মনে তিতু যেন একটু খুশী হল।

'অন্ধকারে শোও, না বাতি জ্বালিয়ে?' বকু আবার শুধলো।

'অন্ধকারে।'

'না বাবা, এ যেন কেমন—এত বড় ঘর, ঘুটঘুটে অন্ধকার—চারপাশটায় বন—' বকু অস্বস্তির সঙ্গে বলল।

'এই, তোরা দুটো ছোঁড়াছুঁড়িতে শুরু করেছিস কি—

খালি ব্যাজর ব্যাজর, বক্কেশ্বরী কোথাকার! ঘুমো—; কাল যদি পড়ে পড়ে বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিস দেখাব মজা তোকে।' দিদিমণি জোর এক ধমক লাগালেন।

'আহা, ঘুমোব কি! তুমি এদিকে যে আমায় চেপ্টে মারছ।' বকু বলল।

'আমার গায়ে আসছিস কেন তুই?'

'বা, আমি তবে যাবো কোথায়? গড়িয়ে যচ্ছি যে!'

'সরে শো।'

'তুমি সরে যাও না।'

'জায়গা আছে আর যে সরবো।' দিদিমণি বিরক্ত। 'কি ছাই তোদের খাট বাপু, গা দিয়েছি ত গড়িয়ে পাতালে নামলুম।'

বকু অন্ধকারেই খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, 'যা মোটা তুমি দিদিমণি—শুলেই স্প্রীংটা ঝুলে পড়ে।'

'তোমার মতন ঝেঁটার কাঠি থাকলে দিদিমণি—আমার আর বিয়েও হত না, পাঁচটা ছেলেপুলে মানুষ করতে হত না।···নে ফিরে শো।'

তিতু তন্ময় হয়ে দিদিমণি আর বকুর এই মজার ঝগড়া শুনছিল। খুব ভাল লাগছিল তার।

দু মিনিটও হল না, আবার বকু চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু সরো না দিদিমণি। আমি যে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলাম।'

'গেলি ত গেলি, যা মটিতে নেমে শুগে যা ··তখন থেকে হাঁটু দিয়ে পেটে গুঁতোচ্ছে, হারামজাদি।' দিদিমণি একে-বারে জ্বালাতন।

আবার খানিকটা চুপচাপ। তিতুর চোখে আস্তে আস্তে তন্দ্রা আসছে, হঠাৎ স্প্রীংয়ের খাটে আর এক দফা বেঁধে গেল। বকুর একটা হাত দিদিমণির দাঁতের ওপর লেগেছে। দিদিমণি ছটফটিয়ে উঠলেন। বিছানা ছেড়েই উঠে পড়লেন। গজগজ শুরু করলেন : 'কোন্ ঢঙের খাটই যে রেখেছিস বাপু তোরা, এর চেয়ে গর্ত খুঁড়ে রাখলেই পারিস....।'

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল টুক্ করে, তিতু চোখের পাতা খুলে তাকাল। দিদিমণি বললেন, 'এই ছোঁড়া—এই খাটে আয় তুই। তোরই ত খাট। যা, ওঠ্—আমায় একটু শুতে দে, সারাদিন রেলগাড়ির ধকল—আর বইছে না শরীরে।'

তিতু উঠল, দিদিমণির শাস্তি দেখে তার মজা লাগছিল।

'যা শুয়ে পড়। তোরা দুটোই কাঠি কাঠি, দুলতেও হবে না—খানায় গড়িয়ে ঝুলতেও হবে না।....ওটাতে আবার শুতে পারব ত!' দিদিমণি ক্যাম্প খাটটা সন্দেহের চোখে ভাল করে দেখে নিলেন।

উঠে এল তিতু। বকু তার আগেই বেশ গুছিয়ে শুয়ে নিয়েছে। পায়ের কাছে একটা সুতির চাদর।

বাতি নিভিয়ে দিদিমণি ক্যাম্পখাটে শুতে গেলেন। শুতে শুতে বললেন, 'আর একটাও যদি কথা বলেছিস তোরা দু'টোতে দেখ, কি করি। রাত বারোটা বাজতে চলল—বকর বকর থামে না।'

দিদিমণি চুপ করতেই ঘর নিস্তব্ধ হল। সাড়াশব্দ উঠল না আর। তিতুর প্রথমে মনে হয়েছিল এখুনি আবার একটা কথা কেউ বলবে। দিদিমণি কিংবা বকু। কেউ আর কথা বলল না।

খাটের ধার ঘেঁষে শুয়েছিল তিতু, বকুকে যতটা সম্ভব বেশি জায়গা ছেড়ে দিয়ে। এতে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। স্প্রীংয়ের পুরনো খাট, মাঝখানটা ঝুলে গেছে। দিদিমণির শরীরের ভারে আরও ঝুলে পড়েছিল, তিতুর ভারে কতটুকু আর ঝুলতে পারে—তবু তিতু বকুর দিকে গড়িয়ে যাওয়া আটকাতে পারছিল না। মাথার দিকে লোহার ফ্রেম মুঠো করে চেপে ধরে খানিকক্ষণ বিছানার ধারেই থাকবার চেষ্টা করল তিতু। এমন একটা অস্বস্তি আর অসুবিধে হতে লাগল যে মুঠো ছেড়ে শরীরটাকে স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে দিল। কাত হয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সোজা হল।

বকুও পাশ ফিরল। তিতুর মনে হল, তার দিকেই মুখ করে শুয়েছে বকু।

তিতু চোখের পাতা খুলে বকুকে দেখবার চেষ্টা করল। এত গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা গেল না। জানলার দিকে একবার তাকাল তিতু। বাইরে কোথাও যেন আলো আলো ভাব আছে জ্যোৎস্নার। ছায়ায় রাখা আয়নার কাচের মতন রঙ সেই আলোর। অমনই ম্লান।

বকু ঘুমিয়ে পড়েছে। তিতুর সে-রকম মনে হল। উস্‌খুস্‌ করছে না। কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে।··

তিতুরও বেশ ঘুমটা আসছিল একটু আগে—দিদিমণি না ডাকলে তিতু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ত।···ক'টা বেজেছে এখন? বারোটা? এত রাত হয়ে গেছে! তিতুর তা মনে হল না।

চোখের পাতা বন্ধ করে তিতু ঘুমোবার চেষ্টা করল। এইবার ঘুম এলে সারারাত এক ফুঁয়ে কেটে যাবে। তারপর সকাল। কালকের সকাল যে নতুন ধরনের হবে তিতু তা

অনুভব করতে পেরে খুশী হল। কাল রবিবার ; স্কুল নেই, মাস্টার মশাই আসবেন না—সারাটা দিন যেন তিতুর হাতে পড়ে আছে, তার খুশি মতন। গোটা একটা দিন আর বকু—তিতু যেন এই দুইয়ের যোগফল কল্পনায় ভাল করে ভাবতেও পারল না। কিংবা আগে থেকে ভেবে সেই আনন্দকে নষ্ট করতে চাইল না। এও হতে পারে, তিতু ঠিক মতন সব আন্দাজ করতে পারল না।

হঠাৎ তিতুর খেয়াল হল—আস্তে আস্তে সে আরও একটু গড়িয়ে গেছে। বকুর বালিশের ঝালর তার গালে ঠেকছে। বকুর নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছে। বকুর পায়ের আঙুল তার পায়ে লাগছে।

এই বিছানা, স্প্রীংয়ের খাট আস্তে আস্তে কত যে ঘন আর ছোট হয়ে এল তিতু বুঝতে পারল না ভাল করে। মনে হচ্ছিল, তার অতবড় খাটের বদলে নতুন এক খাটে শুয়ে আছে। বিছানা অনেক ছোট, হাত পা ছড়াবার উপায় নেই, পাশ ফেরার মতনও জায়গা না। তবু তিতুর ভাল লাগছিল। ভীষণ ভাল।

তিতু আস্তে করে পাশ ফিরল। বকুর চুলের কেমন এক গন্ধ নাকে এল, নারকেল তেল—ধুলোবালি কয়লার গুঁড়ো মেশান আঁটা-আঁটা গন্ধ। মিষ্টি না, কিন্তু কেমন গভীর। ওই গন্ধ যেন তিতুর মনকে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে—কোন অতলে নিয়ে গেল। নিশ্বাস মৃদু ঘন হয়ে আসছিল তিতুর।

বকুর মুখের কি এক রকম গন্ধও পাচ্ছে তিতু। অনেক কথা বললে কি অমন গন্ধ থাকে, সারাদিন ধরে হাসলে কি অমন গন্ধ হয়! কে জানে···কে জানে!

ঘুমের ঘোরে বকু নড়েচড়ে উঠে আবার শান্ত হয়ে গেল।

তিতুর মনে হল, ওরা ছুজনে আরও কাছাকাছি গায়ে গায়ে হয়ে গেছে। ঘুম আসছিল তিতুর। এই খাট, এই বিছানা আজ অন্যরকম হয়ে গেছে। কি রকম তিতু তা বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, তিতু আর একলা নয়, একা নয়। কতকাল আগে তার পাশে মা শুয়ে থাকত, তারপর মা মারা গেল, তিতু একলা হয়ে গেল, একা—একা। তার পাশে কেউ শুত না, তার গায়ে গা লাগিয়ে আর কেউ কোনো দিন ঘুমোয় নি। এই স্প্রাংয়ের খাটই কত বড় মনে হয়েছে, কত ফাঁকা। কি বিশ্রী খালি খালি লেগেছে, কতদিন ভয় পেয়েছে তিতু, ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে কাউকে পাশে আঁকড়ে ধরতে গেছে। কিন্তু কাউকে ছুঁতে পারে নি তিতু। মা না, মাসি নয়, বাবাও না। তিতু একলা, শুধু একলাই ছিল।

এই একলা থাকার কী কষ্ট, তিতুই শুধু জানে, অনুভব করতে পারে। দিনের পর দিন ফাঁকা-মাঠে-ফেলে-দেওয়া পাখির ছানার মতন তিতু কেঁদেছে। কেউ সে-কান্না বোঝে নি, শোনে নি।

সেই ভয়ংকর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিতু হারিয়ে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল, কোনোদিন আবার কেউ তার পাশে তিতুকে একটু জায়গা দেবে বা তিতুর পাশে কেউ জায়গা নেবে।

তিতু তার তেরো-চৌদ্দ বছরের মনে এত কথা ভাবতে বা বুঝতে পারল না। বুকের মধ্যে কোথাও একটা অদ্ভুত শক্ত জমা কান্না আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছিল—আর গলার মধ্যে টনটনে বাতাসের পুঁটলি যেন কণ্ঠা থেকে জিবের কাছে এসে আটকে থাকল।

তিতু কাঁদছিল। তিতুর ঘুম আসছিল।

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তিতু তার সবটুকু ঝাপসা স্মৃতি হসপিটাল-রোডের বাড়ির বিছানায় ফেলে দিয়ে সেই ছোট্ট নেয়ারের-খাটের বিছানার কথা ভাবছিল, যখন তিতুর পাশে মা শুয়ে থাকত, তার মা।

বকুর আর তিতুর বালিশের মাঝখানের ফাঁকটুকুও কখন ভরাট হয়ে উঠল। দুটি মাথা, দুটি মুখ। ঘুমের গাঢ়তায় এই ঘরের মতনই শান্ত, শব্দহীন, মধুর।

ঘুম ভেঙ্গে গেল তিতুর। কানের পরদায় শব্দটা তখনও ভেসে আসছে। আচ্ছন্নতার কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে গেল। চোখ মেলে তাকাল তিতু। ভাল করে সকাল হয় নি। এখনও ভোরের ফরসার সঙ্গে যেন রাতের একটু অস্পষ্টতা মেশান আছে।....প্রথমটায় কিছু খেয়াল করতে পারল না। আচমকা একঝলক আলো এসে চেতনায় ঠিকরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাতের সব কথা মনে পড়ল তিতুর। বকু...দিদিমণি...। তিতু সোজা হয়ে শুয়েছিল—আস্তে করে ডান দিকে ঘাড় ফেরাল। বকু এ-পাশে কাত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

চড়ুই পাখিটা আবার ফর ফর উড়তে লাগল। একটানা ডেকেই যাচ্ছে—কিচ্ কিচ্...। সিলিংয়ের দিকে একবার চাইল তিতু। এখনও ঝাপসা হয়ে আছে। খোলা স্কাই-লাইট্ দিয়ে কখন চড়ুই পাখিটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। যেন সাত সকালে তিতুর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে এসেছে।

অল্পক্ষণ সেই ডাক শুনল তিতু অলস মনে। তারপর উঠে

বসতে গেল। উঠতে গিয়ে আধবসা হয়ে বসে থাকল একটু। বকুর একটা হাত তার কোলের ওপর। রোগা রোগা হাত, সরু সরু আঙুল, নোখ রয়েছে। হাতের রঙ ময়লা ময়লা। সোনার সরু রুলি কব্জির তলায় কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে।

বকুর হাত আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে তিতু এবার সোজা হয়ে বসল। বকুকেই দেখছিল। ভোরের ফরসায় ঘুমন্ত বকুকে বেশ দেখাচ্ছে।

বকু এখনও যেন মাঝরাতের ঘুমে ডুবে আছে। অসাড়, নিশ্চল। বকুর চোখের পাতা পুরোপুরি বোজা, ঘুমের আঠা দিয়ে আঁটা। নিশ্বাস নিচ্ছে কি নিচ্ছে না বোঝা যায় না। ঠোঁট একটু ফাঁক, দু তিনটি সাদা ধবধবে দাঁত দেখা যাচ্ছে। তিতু একমনে দেখছিল।

বকুর মুখের ছাঁদ লম্বা গোছের। পাশ-কপাল ছোট, গালের ছাঁচ গড়ানো, চিবুকের তলা সরু, কিন্তু নরম। ভুরু খুব ঘন নয়, তবে খুব টানা টানা, চোখের পাতা পালকের মতন দু পাশে সরু হয়ে গেছে। নাকটি লম্বা। সরু পাতলা ঠোঁট। বকুর রঙ ঠিক কালো নয়, ফরসার একটা আবছা ভাব আছে।

বকুর ঘুমন্ত নিশ্চিন্ত অলস মুখ খুবই ভাল লাগছিল তিতুর। তিতু একটুক্ষণ অপলক চোখে বকুর ওপর-ঠোঁটের পাশে গাল ঘেঁষে থাকা বড় তিলটা দেখল। খুব ভাল লাগল তিতুর।

তিতুর ইচ্ছে হল, বালিশের তলা দিয়ে বিনুনির যে ডগাটা এ-দিকে বেরিয়ে রয়েছে, আস্তে আস্তে তার থেকে রিবনের

দলামলা ফুলটা খুলে নেয়। কি করবে খুলে নিয়ে? কেন, লুকিয়ে রাখবে।

ফুল খুলল না তিতু। বকুর উস্কো খুস্কো এক মাথা চুলের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল। কানের মাকড়ির সঙ্গে খানিকটা চুল জড়িয়ে গেছে। বকু চুল ছাড়াতে গিয়ে চেঁচা-মেচি করবে, তিতু যেন আগের থেকে সেই ছবি দেখতে পেয়ে হেসে নিল।

রাত্রে শীত শীত করছিল বলে পায়ের তলা থেকে সাদা চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়েছে বকু। চাদর অগুছোল হয়ে রয়েছে গায়। সাদা ফ্রকের কলারের সঙ্গে চাদরের সাদা মিশে গেছে। পায়ের খানিকটায় চাদর আছে, খানিকটায় নেই। বকু হাঁটু ভেঙে খুব আয়াস করে শুয়ে আছে।

চড়ুই পাখিটা ঘরের মধ্যে আবার ফর ফর করে উড়ছে। একবার এ-দিকের স্কাইলাইট থেকে ও-দিকের স্কাইলাইটে গিয়ে বসছে, আর ডাকছে কিচ কিচ কিচ। বাইরেও গাছের মাথায় ঘুম-ভাঙা-পাখিরা ডেকে উঠেছে।

পুরোপুরি ফরসা হয়ে গেল বাইরে।....তিতু বুঝতে পারল। বকুকে জাগিয়ে দেবে? ভাবল তিতু। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হল, সেই ছোট্ট বেলায় মাকে যেভাবে জাগাত, নাকে আর চোখের পাতায় ফুঁ দিয়ে—সেই ভাবে জাগিয়ে দেয় বকুকে। বকু কি রাগ করবে? না। বকু রাগ করবে না। মা রাগ করত না। মিথ্যে মিথ্যে রাগের মতন করত। বকু যদি রাগ করে?

তাই কি হয়! বকু রাগ করতেই পারে না। রাগ করলেও সে মিথ্যে রাগ। মার মতনই। বকু কি কখনও রাগ করতে

পারে তার ওপর! বকুর সঙ্গে তিতুর খুব ভাব হয়ে গেছে। এত ভাব আর কারুর সঙ্গে হয় নি তিতুর, মা চলে যাবার পর। বকু তার বন্ধু। বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু। তিতু মনে মনে এই নতুন সুন্দর শব্দটা আওড়ে সবটুকু সুখ পেল না। আপন মনে অস্পষ্ট মৃদু গলায় ক'বার উচ্চারণ করল। আর তিতু এবার এক অব্যক্ত গভীর নতুন সুখ অনুভব করতে পারল।

মনের অন্ধকার-তলার যে ফাঁকা বোধ, নিঃসঙ্গতার দুর্বহ ভার তিতুকে ভীষণভাবে পীড়ন করত মাঝে মাঝেই, সেই একাকিত্ব এখন হালকা ছায়ার মতন অনুভবে ভেসে উঠল তিতুর। কিন্তু তার বেদনা আর আগের মতন রুক্ষ ছিল না। তিতু বুঝতেই পারছিল, তার একলার ঘরে বকু এসেছে, বকু গল্প করছে, ভাব করেছে, পাশে শুয়েছে···বকু তাকে বন্ধু করেছে।

ঘরের মধ্যে বার বার ফর ফর করে উড়তে গিয়ে চড়ুই পাখিটা ফ্যানের ব্লেড়ে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ল। ফট্ করে শব্দ হল আচমকা। তিতু চমকে উঠল।

পাখিটা আর ডাকছে না, উড়ছে না। তিতু এদিক ওদিক তাকাল, চড়ুইটাকে দেখতে পেল না।

টপ্ করে খাট থেকে নেমে পড়ল তিতু। চড়ুই পাখি-গুলো এমনি করেই মরে। কতবার তিতু তাদের উড়িয়ে দেয়, তবু তারা আসবে ঘরে, ফ্যান যখন চলছে।

তিতু চেয়ার টেনে টেনে দরজা জানলা ছিটকিনি খুলল, উদাম করে খুলে দিল সব। ভোরের ঠাণ্ডা আর ফুরফুরে সতেজ পরিষ্কার বাতাস এল ঘরে, ধবধবে ফরসা আলো এল।

সেই আলোয় তিতু চড়ুই পাখিটাকে খুঁজতে লাগল।

এই খাট বিছানা টেবিল দেরাজের কোন কোণায় গিয়ে পড়েছে কে জানে ! মরেই গেছে হয়ত !

তিতু যখন তার খাটের তলায় গলা বাড়িয়ে দেখছে, চড়ুই পাখিটা বার দুই দুর্বল গলায় ডেকে উঠে ফর ফর করে দরজা দিয়ে উড়ে গেল বাইরে। মাঠে, হাওয়ায়।

তিতুও উঠে দাঁড়াল। বকু তেমনি ভাবে ঘুমোচ্ছে। দিদি-মণিও।

যত খুশী হয়েছিল তিতু, এখন আর অতটা খুশী নয়। চড়ুই পাখিটা তার খুশীকে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে কেমন জট পাকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। কেন ? তিতু জানে না, তিতু বুঝতে পারল না।

বকুর দিকে আর একবার তাকিয়ে তিতু যখন চলে আসছে তখন বকুর কালকের কথাই মনে পড়ল তিতুর। বকু তাকে 'খাঁচার পাখি' বলেছে।

হ্যাঁ, তিতু খাঁচার পাখি। আর বকু ? বকু কি ? বনের পাখি ?···কেমন করে যেন তিতুর আবার মনে এল কথাগুলো ঃ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে ; একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে—কি ছিল বিধাতার মনে।···জলের ঝাপটার মতন মনের ওপর দিয়ে কথাগুলো বয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে-আসা পাখার ঘা-খাওয়া চড়ুই পাখির ছবি চোখে মনে ভাসতে লাগল। বকু···বকু···

বনের পাখী····ঘরে এসেছে····!

তিতু বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শিউলি ফুল ঝরেছে অনেক। শিশির পড়ে মাঠের ঘাস ভিজে গেছে। আলো ফুটছে। তিতুর তবু যেন কেন কান্না পাচ্ছিল।

দশ.

মাঘ মাস। শীতের কনকনে হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে আজ ক'দিন। বেলা একটু বাড়তে না বাড়তেই সেই হাওয়া হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে, তারপর রোদের তাত যত বাড়ে ততই দাপট বাড়ে হাওয়ার। মাঠে গাছে বাগানে সোঁ সোঁ বয়ে যায়।

বাইরে বারান্দায় শীতের রোদে তিতুকে বসিয়ে দিয়ে যায় মধু কিংবা মালি। মাথায় রোদ খুব বেশি লাগলে ডেক্-চেয়ারটা সরিয়ে দেবার জন্যে তিতু কাউকে ডাকে। কখনও বা নিজেই আস্তে আস্তে ছায়ার দিকে মাথাটা সরিয়ে নেয়।

বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকে তিতু। রোদে। বাগানের দিকে চেয়ে। মরশুমি ফুলের গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে। ছোট ছোট গাছ, পাতাও বড় না— কিন্তু কত রকম রঙ, কী বাহার। হাওয়ার তাড়ায় সব সময় দুলছে। বাগানে এখন অনেক প্রজাপতি এসেছে। তিতু বসে বসে কোনো নীল-পাখা প্রজাপতির রঙ ছিটোনো দেখে, কখনও ফুলের মাথা দোলানো ; কিংবা রোদ, গাছ, ঘন নীল আকাশ। এক নাগাড়ে রোদের তাত খেতে খেতে যখন গরম লাগে, গায়ের শালটা খুলে ফেলে তিতু, পুল-ওভারটাও।

সারাক্ষণ কি আর শুধু মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় ? যায় না। তিতু তখন বই পড়ে। তার প্রাইজে পাওয়া বইগুলো। পড়ে পড়ে পুরনো হয়ে গেছে। তবু পড়ে। কলকাতা থেকে তিতুর নামে ছোটদের পত্রিকা আসতে শুরু করেছে গত ক'মাস ধরে। বাবাই আনিয়ে দিয়েছে। সেগুলো

পড়ে তিতু। তা ছাড়া মাস্টারমশাইও গল্পের বই টই এনে দেন। তিতু সেই সব বই পড়ে। মাস্টারমশাই রোজ আসেন না, ছ' চার দিন অন্তর একবার করে আসেন সন্ধ্যে বেলায়, তিতুর খোঁজ নিতে।

তিতু এখন প্রায় সেরে উঠেছে। পায়ে অবশ্য তেমন জোর পাচ্ছে না। হাঁটুর তলায় এবং জাংয়ের কাছে শিরাগুলো এখনও টন টন করে ওঠে, মনে হয় যেন ছিঁড়ে যাবে। ডান পা ঠিকই আছে, বাঁ পায়েরই এই অবস্থা। তবু আজকাল তিতু একা একা চেয়ার ধরে বা দেওয়াল ধরে দাঁড়াতে পারছে। বাঁ পায়ের গোড়ালি মাটিতে ছোঁয়াতে পারে না এখনও, আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

ন'টা সাড়ে-ন'টা নাগাদ একজন দাই আসে, হাসপাতালের দাই, নার্স নয়—তিতুর পায়ে মালিশ মাখাতে। এই রোদে এক ঘণ্টা কি তারও বেশি আস্তে আস্তে টেনে টেনে পা মালিশ করে দেয়। কী একটা তেল দিয়ে যেন। তারপর তিতু যায় চান করতে। বিরজা দাই সঙ্গে থাকে। তিতুকে স্নান করিয়ে কাপড় জামা ছাড়িয়ে কেচে কুচে দিয়ে সে চলে যায়।

ছপুরটা তিতুর ঘরে কাটে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বিকেলে আবার খানিক বাইরে এসে বসতে পায়। সন্ধ্যের আগেই মালি তাকে ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে যায় ইজিচেয়ারে।... রাত্রে তিতুর খাবার আসে তারই ঘরে। মধু বয়ে আনে, ছোট গোলটেবিল রেখে হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। তখন একবার মাসি কাছে এসে বসে।

সেই পুজোর কিছু আগে, বকুরা আসার পর পর তিতুর কি যে হল—তারপর চার পাঁচটা মাস কি ভাবে কেটে

গেল—তিতু এখন আর ভাল করে ভাবতেই পারে না। সব কেমন গোলমাল, এলোমেলো, আবছা হয়ে যায়। এই ক'টা মাস যেন মাস নয়—একটা গোটা রাত; রাতের আগে বেহুঁশ জ্বর এসেছিল তিতুর—ভোরে সেই জ্বর ছেড়ে গেছে। মধ্যে একটা বিকার যন্ত্রণা মৃত্যু-ভয় আর কান্নার ইতিহাস জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। এখন আর তা মনে পড়ে না স্পষ্ট করে, মনে করতে ইচ্ছে করে না; ভয় হয়। তিতুর ইচ্ছে করে না সে-সব কথা ভাবতে।

সারা রাতের এই বিকার আর যন্ত্রণার পর এখন ভোরে যা আছে—তা ক্লান্তি, অবসন্নতা, বিষণ্ণতা। তিতু সেই ক্লান্তি আর অবসন্নতার মধ্যে ডুবে আছে।

চার মাসের ইতিহাসকে তিতু মনে করতে না চাইলেও তার একটা ইতিহাস আছে। এই চার মাসে তিতু অন্তত কিছু কিছু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

অসুখ কি, কেমন; তিতুর জ্ঞানে ভাল করে জানা ছিল না। একটু জ্বরজ্বালা সর্দি বা মাথা ধরা—এমন ছোট-খাটো অসুখ তার হয়েছে। ও-সব অসুখ নয়। এবার যা হল হয়ত তাকেই বলে অসুখ।

বকুরা চলে যাবার কিছুদিন পরেই, অসুখটা হল। (বকুরা মাত্র দু'দিন ছিল, তিন দিনের দিন চলে গেল।)…একদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে তিতুর বাঁ পায়ে কেমন একটা ব্যথা লাগল। মাটিতে দাঁড়াতে গিয়ে মনে হল কুঁচকির কাছ থেকে একটা শিরা টেনে আছে। বেশ ব্যথা। দুর্বল লাগছে খুব। মুখের ভেতরটা বিস্বাদ, গরম গরম। রাত্রে জ্বর হয়ে গেছে।

দুপুর থেকে ব্যথা আরও বাড়ল। রাত্রে অসহ্য হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে জ্বর। তিতু মাথা রগড়াতে লাগল বিছানায়, ছটফট করতে লাগল।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন। দেখলেন। ঠিক ধরতে পারলেন না। ওষুধ বিষুধ দিয়ে চলে গেলেন, দু' তিন দিন অপেক্ষা করে দেখতে হবে রোগটা কি।

সেই তিন দিন তিন সপ্তাহে গিয়ে ঠেকল। পায়ের মাংসের তলায় ফোড়া হয়েছে। থাই অ্যাবসেস। জাংয়ের তলার দিকটা শক্ত, লালচে, টাটানো। এক বিঘত জায়গা জুড়ে সিঁদুরের রঙ ধরে ফুলে উঠেছে।...ফোড়াকে পাকানো হল; কুঁচকির তলা থেকে খানিকটা নীচে নামানো হল বোধ হয়—কিংবা ছড়ানো হল। অ্যান্টিফ্লোজেস্টিনের পুলটিস, তার সঙ্গে তোকমারিও মাঝে মাঝে। জ্বর আর যন্ত্রণা সমানে চলছে। ....শেষে অপারেসান। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, ছুরি, কাঁচি, গরমজল....। যন্ত্রণা এবং মৃত্যু-ভয়ের সেই সাংঘাতিক মুহূর্তগুলো আজ বিভীষিকার স্মৃতি হয়ে তিতুর মনে বেঁচে আছে।

মাসখানেক আরও লাগল ভাল হয় হয়-না সেই ফোড়াকে সারিয়ে তুলতে। আস্তে আস্তে ঘা শুকোলো। হাঁটু মুড়ে পা বেঁকিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে শিরায় টান ধরে গেল। তিতু আর পা সোজা করতে পারে না। এমন সময় আবার হল জ্বর, ব্রংকাইটিস। জ্বরে যন্ত্রণায় আবার সপ্তাহ দুই কাটল।

একটানা এই অসুখ তিতুর শরীর ভেঙে দিয়ে গেছে। রোগা কাঠির মত হয়ে গেছে চেহারা, ফরসা রঙ ফ্যাকাশে;

মুখ চোখ পাণ্ডুর। বড় বড় দুটো চোখ হাড়ওঠা বিবর্ণ মুখের ওপর যেন কোন রকমে ভাসছে। কী অসহায়, ভীরু, ক্লান্ত!

এত বড় এবং এই দীর্ঘ অসুখে তিতু তার বিছানার কাছে বাবা কিংবা মাসিকে সেবা শুশ্রূষার জন্যে পায় নি। গোড়া থেকেই বাবা হাসপাতালের একজন নার্সের ব্যবস্থা করেছিল, চব্বিশ ঘণ্টার নার্স। শুশ্রূষা খাওয়ানো পরানো সবই তার হাত দিয়েই হয়েছে তিতুর।

তিতু তাকে মালতীমাসি বলে ডাকত। কে জানে কেন মালতীমাসি তিতুকে খুব ভালবাসত। ওদের পুরনো হসপিটাল রোডের বাড়ি নাকি চিনত মালতী মাসি। মার কথা কবে একবার জিজ্ঞেস করেছিল তিতু, মালতী মাসি তার জবাব দেয় নি।

মালতীমাসি এ-মাসিকে একেবারে পছন্দ করত না। মাসিও মালতীমাসিকে দু' চোখে দেখতে পারত না। কট্ কট্ করে কথা বলত রুক্ষ মেজাজী গলায়; যেন মালতীমাসি তাদের চাকর কিংবা ঝি। মাসির ব্যবহারে রেগে গিয়ে মালতীমাসি একদিন বাড়ি ছেড়ে চলেই যাচ্ছিল।

তিতু ঠিক জানে না, বুঝতেও পারে নি ভাল করে, কিন্তু মালতীমাসির দু' একটা কথা থেকে তার মনে হত—বাবা মাসি তিতু তাদের যেন মালতীমাসি আগে থেকেই চিনত। কেমন একটা ঘেন্নাও আছে মাসির ওপর, বাবার ওপর। তিতুর মনে হয়েছে, তাদের নাম নিয়ে—খারাপ কথা-টথা হয়ত কেউ করেছে।

তিতু সেরে ওঠার পর মালতীমাসি চলে গেল। যাবার দিন তিতুর জন্যে বই আর দু' কৌটো টফি কিনে এনেছিল।

মালতীমাসি চলে যাবার পরই মাসি বলল, সেই খেলনা আর বই দেখে, 'এক কাঁড়ি টাকা গুনে নিয়ে গিয়ে আবার দরদ দেখানো। নার্সরা এই-রকমই হয়। ছোটলোক।'

মালতীমাসি ছাড়া তিতুকে এই অসুখে দেখাশোনা করত এ-বাড়ির মালি। ওই মালি। বুড়ো, কাল, ছোট্ট চেহারার মানুষটা। তিতু শুনেছে তার যখন পায়ের ফোড়া কাটা হচ্ছিল—মালি তখন ঠায় বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তিতুর পরিত্রাহি চিৎকার আর কান্নার সময় কাঁদছিল হাউমাউ করে। মালি মানত করে পুজো চড়িয়েছিল তাও তিতু শুনেছে। মালি তিতুর জন্যে অনেক করেছে। অনেক সয়েছে; ওষুধ আনতে, ডাক্তার ডাকতে, বিছানা কাচতে—মালি ছাড়া কেউ ছিল না।

আর?

আরও একটা জিনিস তিতু দেখেছে। বাবা। তার বাবা। বাবা এই অসুখের ঘরে সব সময় আসত না—সময় পেত না কিংবা ভয় পেত, খারাপ লাগত বা মাসি হয়ত বারণ করেছিল—কিন্তু বাবা সন্ধ্যেবেলায় রোজ খানিকটা করে এসে তার ঘরে বসত। দু' একটা কথা বলত। আর তিতুর বিছানা এবং তিতুকে দেখত।

যেদিন তিতুর অপারেসন হয়—সেদিন রাত্রে তিতু জ্বরে বেহুঁশ হয়ে থেকেও এক এক সময় যন্ত্রণার চোটে যখন চোখ খুলে মাকে ডাকছিল—তিতুর মনে হয়েছিল, বাবা যেন পাশে কোথাও আছে। পরের দিনও রাত্রে ঘরে বাবাকে দেখেছে তিতু। খু-উব ভাল লেগেছিল তিতুর। বাবা তাহলে তাকে এখনও একটু একটু ভালবাসে!

এই অসুখে পড়ে তিতু হারিয়ে-যাওয়া-বাবাকে আবার একটু পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে বাবা আগের মতন আর নেই, সামান্য যেন বদলে গেছে। তিতুর দুঃখ তাতে কমল কই, বরং আরও বেড়ে উঠল। ইচ্ছে হত, বাবা যেন অনেকক্ষণ তার পাশে বসে থাকে, কথা বলে, বাবার বিছানাটা তিতুর ঘরে নিয়ে এসে শোয়। কিন্তু কই, বাবা সে-সব কিছু করে না। কেন? কি জন্যে? মাসি কি রাগ করবে তাহলে?

বাবার সম্পর্কে তিতুর মন যখন এই রকম নরম, অভিমানে টলমল করছে, একটা স্নেহের ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে উঠেছে—তখন একদিন তিতুর কাছে বাবার চেহারা আবার ঘোলাটে হয়ে গেল।

খাবার টেবিলে বসে কথা বলছিল বাবা আর মাসি। খেতে খেতে। তিতুর ঘরে একটা শেড্-ঢাকা ল্যাম্প জ্বলছে মিটমিট করে এক কোণায়। রাত হয়েছিল। মাসি নিশ্চয় ভেবেছিল তিতু ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তিতু ঘুমোয় নি। জেগে ছিল। বাবা আর মাসির গলা যখন খুব চড়ে উঠল—তিতু শুনতে পেল, মাসি বাবাকে বলছে, 'অনেক পয়সা খরচ করা হয়েছে তোমার ছেলের জন্যে এই ক'মাসে। আবার কি? যথেষ্ট হয়েছে।'

'টাকার কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি রোজগার করি আমি বুঝব।' বাবার গলা। কঠিন, রুক্ষ।

'কে যাবে ওর সঙ্গে মধুপুরে?'

'সে-ব্যবস্থা করা যাবে একটা।'

'নিজেই যাবে নাকি ছেলে আগলাতে?' মাসি ঠাট্টা করে বলল।

'যেতেও পারি।....ওই নার্স—মালতী, তিতুকে যে দেখত...'

'তাই বলো।' মাসি কেমন এক বিশ্রী গলা করে বলল।

'তপতী!' বাবা চামচ দিয়ে প্লেটের ওপর এমন জোরে ঠুকল যে তিতু এ-ঘর থেকেই চমকে উঠল।

'আমাকে তুমি কচি খুকি পাও নি—' মাসি ঝাঁঝালো তিক্ত গলায় চিৎকার করে বলছিল, 'সস্তা জিনিসের ওপর তোমার লোভ আমার জানা আছে—; ওই নার্স-ফার্সগুলো হলে তোমার ভাল মানায়।' মাসি যেন প্লেট, কাঁটা, চামচ, গ্লাস সব দু' হাতের ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দিল; কাচের বাসন পত্তরের ঝন ঝন শব্দ উঠল, সেই শব্দের ওপর মাসির চড়া গলা ফেটে পড়ল ভীষণ ভাবে, 'তুমি ভেব না তোমার ছেলের ওপর আদর উথলে উঠেছে ভেবে আমি চোখ বন্ধ করে ছিলুম। ওই ছোটলোক নার্স-মাগিটা এখানে থাকবার সময় কেন তুমি রাত্তিরে যেতে ও-ঘরে আমি জানি। ...ও-সব ছেলে-সোহাগ তুমি আমায় বুঝিয়ো না।'

মাসি যে কেন এ-সব কথা বলছে, কি এর মানে—তিতু কিছু বুঝতে পারছিল না। শুধু একেবারে শেষের কথাটা ছাড়া।...

অনেকক্ষণ আর কথা নেই। তারপর বাবা বলল, 'তুমি অসম্ভব বেড়ে উঠেছ—কুকুরকে মাথায় তুললে এই রকম হয়। হ্যাঁ, আমি ওই নার্স নিয়ে আর তিতুকে নিয়ে মধুপুরে গিয়ে থাকব, তোমার যা খুশি ক'রো। আই ডোণ্ট কেয়ার....।'

হঠাৎ ডাইনিংরুম স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন কেউ আর নেই।

মাসি না, বাবাও না। শুধু ছত্রাকার হওয়া কাচের পাত্র পড়ে আছে টেবিলে—আর প্রাণহীন কতকগুলো কাঠ।

মাসি আচমকা কথা বলল, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে, অসহ্য জ্বালায়। তিতু শুনতে পেল স্পষ্ট। 'কই মাছের প্রাণ …এত অসুখ বিসুখ কাটাকুটি তবু বেঁচে থাকল!'

সেই থমথমে ঘরে বাবার শেষ কথা শোনা গেল, চাপা গম্ভীর বিতৃষ্ণা-মেশান গলা, 'হ্যাঁ, মরলেই ভাল ছিল; তুমি বাঁচতে। আমিও…'

তিতুর চোখের ওপর বাবার সেই রাত্রে-দেখা-মুখ একটা রাক্ষসের মতন বিরাট বীভৎস কুৎসিত হয়ে উঠছিল। তিতু মরলে বাবা বাঁচত….বাবাও।

এগার

বকুকে চিঠি লিখেছে তিতু।

সকালেই চিঠিটা পেয়েছিল বকুর। পেয়ে বার বার (কম করেও সাত আটবার) পড়েছে চিঠিটা। বকু খুব রাগ করেছে। তিতু তার আগের চিঠির জবাব দেয় নি কেন, তাই।

বকু কিচ্ছু জানে না, তাই রাগ করেছে। কেন, বকু কলকাতায় ফিরে গিয়ে প্রথমেই যে-চিঠি দিয়েছিল, তার উত্তর ত দিয়েছিল তিতু। তারপর পুজোর পর আবার যে-চিঠি দিয়েছিল বকু, তার উত্তর দেওয়া হয় নি। তিতুর যে তখন অসুখ, কি করে চিঠি লিখবে।

বকুর আজকের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছে তিতু। বকু ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছে। তাদের ইংরিজী বইয়ের

নাম 'গোল্ডেন রিডার'...যে-বই তিতু এখানে পড়েছে এইট্ ক্লাসে। বকু আরও কত কথা লিখেছে, কত রকম কথা— একটা সুন্দর ফটো তুলিয়েছে বকু, সার্কাস দেখেছে, বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে, এই বড়দির বিয়ের জন্যে কিছু টাকা চাইতে দিদিমণি মাসির কাছে এসেছিল, তিতু পরে জানতে পেরেছে। জামাইবাবু খুব ভাল...দিদিমণি তিতুর কথা বলে, বাসন্তীকে তিতুর গল্প বলেছে বকু...বলেছে 'খাঁচার পাখি'—।

বকুর চিঠি অনেকবার করে পড়ে তারপর সারা দুপুর তিতু তার উত্তর লিখেছে। প্রথমে 'রাফ্'—পেনসিলে করে। কাটাকুটি করেছে, রবার দিয়ে ঘষে ঘষে আবার বানান কিংবা শব্দ ঠিক করে করে তবে মোটামুটি চিঠির খসড়া হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় রুল টানা কাগজ আর ফাউনটেনপেন নিয়ে তিতু খসড়া চিঠি সুন্দর করে নকল করতে বসল। পেনসিলে লেখা চিঠি দেখে দেখে আপন মনে পড়ে পড়ে তিতু লিখছিল ঃ

বকু, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার খুব অসুখ করেছিল। সেই পুজোর আগে অসুখ করেছিল, এখনও আমি একেবারে সেরে উঠিনি। আমার বাঁ পায়ে ভীষণ বড় ফোড়া হয়েছিল। জায়গাটা অসাড় করে কাটতে হয়েছে। অনেকখানি। তারপর আবার অসুখ করেছিল। আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। হাঁটতে পারি না। গায়ে একেবারে জোর নেই। আমি মরে যেতাম। সকলে তাই বলে। অসুখ হলে বড্ড কষ্ট হয় বকু।

আমি পরীক্ষা দিতে পারি নি এবার। হেড্ মাস্টার-মশাইরা আমায় নাইন ক্লাসে তুলে দিয়েছেন এমনিতেই। নাইন ক্লাসে অনেক বই। ইংরিজী বই তিন চারটে।

ইউনিভারসিটি সিলেকসান সব ক'টা। আমি ইতিহাস আর অংক অ্যাডিসনাল নেব। মাস্টারমশাই আমার বই কিনে আনছেন। এখন বাড়িতে পড়ব একটু একটু। তারপর হাঁটতে পারলে স্কুলে যাব।

আসছে বছরে আমার টেন ক্লাস হবে। তারপরই ত ম্যাট্রিক। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি কলকাতায় যাব। কলেজে পড়ব। তোমার সঙ্গে খুব গল্প করব। তখন খুব মজা করে থাকব।

বকু, এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না। সারা দিনরাত বাড়িতে আটকে আছি। সেই যে খাঁচার পাখি বল তুমি।

আমার একটাও বন্ধু নেই। আমায় কেউ ভালবাসে না।

তুমি কত আনন্দে আছ। দিদিমণি তোমায় কত ভালবাসে। বকু, নতুন ক্লাসে খুব মন দিয়ে পড়বে।

চিঠির উত্তর দিও। তাড়াতাড়ি। ইতি—তিতু।

নামের তলায় বকুর দেখাদেখি তিতু আবার ভাল করে গোটা নামটা লিখল : তীর্থপতি মল্লিক।

চিঠি লেখা শেষ করে মনে মনে পড়ছে তিতু—এমন সময় খাবার নিয়ে এল মধু। রাতের খাবার। টেবিল থেকে বই কলম সব সরিয়ে বড় টেবিলে রেখে দিল। চিঠিটা আর পড়া হল না।

মাসি আজ আসেনি। কাজেই তাড়াতাড়ি তিতু খাওয়া শেষ করল। চিঠিটা যেন এখুনি ডাকে পাঠাতে হবে—তার আগে একবার পড়ে নেওয়া দরকার—এমনই উৎকণ্ঠা, ব্যস্ততা তার।

খাওয়া শেষ হলে হাঁফ ছাড়ল তিতু। ঢক ঢক করে দুধ খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিল। মধু পাত্রগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আস্তে করে উঠল তিতু ভর দিয়ে। পা টেনে চেয়ার ধরে ধরে বড় টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বকুকে লেখা চিঠিখানা নিয়ে বিছানায় এসে বসল।

প্রথমে হাতের লেখাটাই দেখল। বেশ পরিষ্কার গোটা গোটা হয়েছে। বকুর হাতের লেখা ভাল না। বানানও ভুল করে। তিতু নিজের হাতের লেখা দেখে খুশী এবং গর্বিত হল। কাটাকুটি নেই একেবারে। দু' একটা অক্ষর সামান্য বুলিয়ে নিতে হয়েছে।

চিঠিটা এবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে পড়ল তিতু। মনে হল, আরও কত লেখার ছিল, অনেক কথা বাদ পড়ে গেছে। তিতু একটা অসম্পূর্ণতা এবং অভাব বোধ করছিল, কিন্তু কি যে বাদ গেছে—ফাঁকা থেকে গেছে বুঝতে পারছিল না।

আবার নতুন করে পড়ল। এবারেও সেই হতাশা এবং সেই একই অসম্পূর্ণতার ভাব।...চিঠিটা এমনিতেই রুলটানা খাতার পাতায় দু'পাতা হয়েছে। গোটা গোটা বড় অক্ষরের ছাঁদে। এর চেয়ে বড় চিঠি যে লেখা যায় না, তিতুর তাও মনে হচ্ছিল। তাছাড়া এই দু'পাতা মনোযোগ দিয়ে ধরে ধরে লিখতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

যাক্‌গে, তিতু ভাবল ঃ বকুর উত্তর পাওয়ার পর আবার যখন চিঠি লিখবে তখন সব কথা লিখে দেবে! ততদিনে নিশ্চয় যা লেখা হয়নি তা মনে পড়বে তিতুর।

চিঠিটা আস্তে আস্তে ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে

শুয়ে পড়ল তিতু। আর ভাল লাগছিল না উঠতে। বেড্‌ সুইচ্‌ টিপে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। অসুখের সময় থেকে তিতুর বিছানায় একটা বেড্‌ সুইচ্‌ এসেছে।···কোণের অল্প জোরের মিটমিট বাতিটা জ্বলছে। সারারাত জ্বলবে। জ্বলুক। তাতে কোনো অসুবিধে হয় না তিতুর। ঘরের অন্ধকার ওই আলোয় নষ্ট হয় নি।

শুয়ে শুয়ে বকুর কথাই ভাবছিল তিতু। মাঝে মাঝেই তাকে ভাবে। অসুখের সময়ও ভেবেছে। বকু বড় ভাল মেয়ে। তিতুর খুব ভাল লেগেছিল তাকে। ও তার বন্ধু।

বকুর আসা এবং বকুর চলে যাবার পর তিতু একটা জিনিস স্পষ্ট করে অনুভব করতে পেরেছে। তার আগে এ-ভাবে সে বুঝতে পারে নি। এত কষ্ট, বেদনা, হতাশাও ছিলনা। শুধু তা নয়, আরও—; বকু আসার পর তিতু আশাও দেখতে পেয়েছে, দেখতে শিখেছে।

এই বাড়ি, সত্যিই খাঁচা। ঘরের আর জানলার কাঠ, টেবিল, চেয়ার আর পরদা দিয়ে তৈরি মস্ত এক খাঁচা। মাসির পান-থেকে-চুন-খসা শাসনের, বাবার উপেক্ষার, বিরক্তির ঘেরাটোপের মধ্যে তিতু বেঁচে আছে। তার নিজের বলে কিছু নেই, একটুও স্বাধীনতা নয়। তিতুকে এরা পোষা কুকুরের মতন গলায় বক্‌ল্‌স্‌ আর চেন বেঁধে রেখেছে। বকু ঠিক বলেছিল, তিতু খাঁচার পাখি।

বকুর মতন তিতুও যদি ছাড়া পেতে পারত! বকু কত খুশী, সুখী; তার কত আনন্দ, আহ্লাদ। তিতুর কিছু নেই। সুখ না, খুশি না, আনন্দ না। কেবল ভয় আর ভয়—খালি এটা না, ওটা না-র বারণ আর শাসন। আর দুঃখ, কষ্ট, কান্না।

তিতুর স্বাধীনতা নেই, তিতুকে ভালবাসারও কেউ নেই। বকুর দিদিমণি আছে, বাবা মা আছে, বাসন্তী বলে বন্ধু আছে। তিতুর কে আছে ? কেউ না। মা যতদিন বেঁচেছিল—তিতু আদর ভালবাসা পেয়েছে। তারপর তিতুকে আর কেউ ভালবাসল না—আদর করল না।

কবে যে তিতু এ-বাড়ি থেকে ছাড়া পাবে—স্বাধীন হবে, তিতু এখন প্রায়ই মনমরা হয়ে তাই ভাবে। আর ভাবে কবে সে আদর পাবে, ভালবাসা পাবে, বন্ধু পাবে।

তিতুর মনের তলায় এখন এই দুই ইচ্ছা তীব্র, ভীষণ ; তারা তিতুকে ফাঁক পেলেই কুরে কুরে খায়।

বকু একটা কথা বলে গেছে, তিতু তা মনে রেখেছে। আর দুটো বছর পরে তিতু খাঁচা-ছাড়া পাখি হয়ে যাবে। কলেজে পড়তে গেলে আর কেউ তিতুর পায়ে দড়ি বেঁধে রাখতে পারবে না। তখন তিতু স্বাধীন। তিতু মুক্ত।

আর কলকাতায় বকু থাকবে। তিতুর বন্ধু।

তিতু সেই মুক্তি আর ভালবাসার সান্নিধ্যের জন্যে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কবে সেদিন আসবে ?

এই দুটো বছর যত তাড়াতাড়ি কেটে যায় তত ভাল। ততই ভাল।

তিতু সেই সুন্দর দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখছিল তিতু ঃ

আবছা অন্ধকার—তিতু যেন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

মাথায় কাচের বাক্স চাপিয়ে কে একজন আসছে। কাছে এল। খাবারঅলা। আবছা অন্ধকার থেকে কতকগুলো মানুষ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অচেনা মানুষ সব। হঠাৎ তিতু একটা বেঞ্চি দেখতে পেল, তারপর আর-একটা। বাক্স, বিছানা, পুঁটলি, জলের কুঁজো। কুলি আসছে ; ছেলে মেয়ে বুড়ো···। ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেকখানি। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তিতু ? কোথায় ? তিতু অবাক হয়ে এদিক ওদিক চাইছে। এত মানুষ, এ-রকম ভিড়, গণ্ডগোল কেন এখানে ?····হঠাৎ তিতুর চোখে পড়ল রেল লাইন। তারপরই কানে গেল কে যেন তিতুকে শুধোচ্ছে, বাবু কোন ক্লাস···? তিতুর কাছে এবার সব স্পষ্ট হয়ে গেল। স্টেশনে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তিতু। গাড়ি আসার ঘণ্টা পড়েছে। কুলিরা মালপত্র মাথায় তুলছে, যাত্রীরা উদগ্রীব হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকল। আচমকা তিতুর খেয়াল হল, সে অনেক বড় হয়ে গেছে, বেশ বড়। কুলি তাকে বাবু বাবু করছে। তিতুর পায়ের কাছে তার বিছানা বাক্স সুটকেশ নামানো।···গাড়ি আসছে···গাড়ি আসছে····ওই না দূরে ইঞ্জিনের কালো মুখ ভেসে উঠছে···ঐ যে ধোঁয়া···লোকজন, হুড়োহুড়ি·· ঘণ্টা বাজছে, স্টেশন····গাড়ি এসে পড়ল।

তিতুর মনে হল তার হাত কাঁপছে। বুক ধক্ ধক্ করছে, সমস্ত রক্ত ছুটোছুটি করছে, কী গরম তার গা, জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে তিতু। ওই যে ধোঁয়া ইঞ্জিনের, রেল লাইন কাঁপছে, গমগম শব্দ। আর কতটুকুই বা—। ট্রেনটা এসে দাঁড়াবে আর তিতু লাফিয়ে গিয়ে একটা কামরায় চড়ে বসবে। তারপর গাড়ি ছেড়ে দেবে।

গাড়ি চলে যাবে এই স্টেশন ছেড়ে….এই জায়গা ছেড়ে… তিতুকে নিয়ে।

বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছিল তিতুর। আনন্দে আগ্রহে রোমাঞ্চে উত্তেজনায়। প্লাটফর্মের মাটি থেকে পা যেন সরে যাচ্ছে। তিতু তাকিয়ে আছে হাঁ করে।….ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছে না তিতু। শুধু কালো গোল ছায়া। ছায়াটা এগিয়ে আসছে…আসছে…বড় হচ্ছে…স্পষ্ট হচ্ছে…।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিতু খপ্ করে তার স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিল। আর মাত্র ক'মুহূর্ত, তারপর তিতু কোথায়—এখানে আর নয়, এই বিশ্রী জায়গায়।

ঘুম ভেঙে গেল তিতুর। চোখ চেয়ে তিতু দেখল, তার সেই পুরনো ঘর, সেই খাট, দরজা, টেবিল। বেমানান বিশ্রী বড় ঘরে তিতু পড়ে আছে। যে-ঘর তিতুর একটুও ভাল লাগে না। একেবারেই নয়।

দ্বিতীয় পর্ব

তীর্থপতি

বার.

'এই ঘর, তীর্থপতিবাবুর।'

বেমানান এক পরদা ঝুলছিল দোর গোড়ায়; পুরু, দরজা অনুপাতে বড়। আশে পাশে কোথাও একটু ফাঁক নেই। ভেতরে চোখ যায় না। হাওয়ায় সামান্য কাঁপছিল।

প্রায়-সন্ধ্যের মরা অসাড় আলোয় ঘরের বাইরেটাও বিবর্ণ, ঝাপসা; কেমন যেন দূর দূর দেখাল। ভেতরটা শান্ত, স্তব্ধ। অন্ধকার স্থির হয়ে আছে পরদার গায়ে; মনে হয় না ঘরের মধ্যে কেউ আছে, এত নিঃশব্দ, শূন্য, প্রাণহীন্।

'বাবু ঘরেই আছেন।' চাকরটি বলল; ও একতলা থেকে পথ দেখিয়ে তিন তলার ছাদে এই নতুন মানুষটিকে নিয়ে এসেছে।

'ও, আচ্ছা; তুমি যাও।' সামান্য ঘাড় হেলিয়ে মৃদু মোলায়েম গলায় বিদায় দিল অতিথি মানুষটি।

ছাদ দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল ছোকরা চাকর। 'বাবু ঘরে আছেন'···শব্দটা আবার যেন ফিরে এসে কানে লাগল এর। হয়ত তার ইতস্ততা দেখেই চাকরটা বলেছে।

ছাদ ফাঁকা। জলো কালির মতন অন্ধকার আরও একটু ঘন হয়েছে। শ্যাওলাজমা কালো ছাদ, আলসে, গংগা জলের ট্যাংক, ফাটলে গজানো বট কি পাকুড় চারা, ও-প্রান্তে একটা টিনের খুপরি—সমস্ত ছবিটা কেমন খাপছাড়া, অস্পষ্ট, অবাঞ্ছিত। তীর্থপতির খোঁজ যেন ঠিক এখানে পাওয়ার মতন

নয়। মনে অন্য রকম একটা ছবি ছিল। এখানের সঙ্গে মিলছে না।

পরদায় হাত রেখে আবার ইতস্তত করল এ-বেচারী, অল্পক্ষণ কি ভাবল, শুকনো কাশির শব্দ করল একটু। ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই।

উলটো-পালটা এক দমক হাওয়া ছাদময় ছুটে এসে পরদার ওপর যেন আছড়ে পড়ল। দুলে ফেঁপে ঢেউ খেয়ে এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসবার আগেই ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন মানুষটি। পরদার আধখানা তার গায়ে এসে পড়ল, পেঁচিয়ে ফেলল আলতো করে গলা, বুক।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরও গাঢ়। খোলা জানলা দিয়ে অতি ক্ষীণ ঝাপসা একটু যা আলোটে ভাব এসেছে। এই ঘর দেখা যায় না, মানুষ চেনা যায় না। জানলার দিকে মুখ করে হেলানো চেয়ারে কেউ একজন বসে আছে। খুব ঘন ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল মানুষটাকে।

গায়ের পাশ থেকে পরদা সরিয়ে ফেলে দিল এ, দু পা এগিয়ে এল। ডাকল, 'তিতু।'

সংকীর্ণ, চাপা, বিষণ্ণ ঘরে ওইটুকু ডাক স্পষ্ট হয়ে ফুটতে পারল না। যেন এই শূন্যতা, স্তব্ধতা এবং স্থির অন্ধকার সেই মৃদু কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে শুষে নিল।

তীর্থপতির সাড়া-শব্দ নেই। ঘুমের ঘোরে শোনা অলীক ডাকের মতন হয়ত শব্দটা তার কানে গিয়েছিল। কিন্তু এই অসাড় ডাক সাড়া দেবার মতন নয়।

'তিতু।'

নতুন করে আবার যে, ডাক উঠল—ঘরের নির্জনতা, বা

স্থির গাঢ় অন্ধকার তাকে শুষে নিতে পারল না। বরং তীর্থপতির মনে হল, খুব কাছে কোনো চেনা মানুষ তাকে আচমকা ডাক দিয়েছে। তিতু....! গলার স্বর ধরার চেষ্টায় মনের অন্ধকারে অন্ধের মতন হাতড়াল একটু। মাসি! তীর্থপতি চমকে উঠল। ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ। 'কে?' ঘাড় ঘোরাল তীর্থপতি। পিছনের মানুষটিকে দেখা গেল না। উঠে দাঁড়াল। ভীত হৃদপিণ্ডের দ্রুত ধ্বনি নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছিল।

'আমি।' মাত্র তিন কি চার হাত দূর থেকে জবাব এল।

অন্ধকারে স্থূল ছায়ার মতন যে দাঁড়িয়ে আছে তীর্থপতি তাকে চিনতে পারল না।

অচেনা মানুষটিও যেন ইচ্ছে করে সময় দিল আরও অল্পক্ষণ। মুখোমুখি চেয়ে থাকল অন্ধকারেই। 'আমি বকুল।' শেষ পর্যন্ত মৃদু গলায় পরিচয় দিল বকুল।

তীর্থপতি বিস্ময়ের একটা মাঠ পেরিয়ে অন্য বিস্ময়ের ফাঁকা ধু ধু তেপান্তরে এসে পড়ল।

ক'টি মুহূর্ত ভীষণ নিস্তব্ধতায় কাটল। মনে হল, এর চেয়ে বেশি স্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

বকুল মেঘের মতন কালো অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে এই-ঘরের রূপ অনুমান করবার বৃথা চেষ্টা করল। অসম্ভব। কিছু বোঝা যায় না। বরং বকুলের অস্বস্তিকর এবং বিষণ্ণ এক অনুভূতি হচ্ছিল। যেন কোনো মৃত মানুষের স্মৃতি আগলে বসে থাকা অসাড়, শূন্য, অনালোকিত ঘরে এসে পড়েছে সে হঠাৎ।

'তোমার ঘরে কি আলো নেই! জ্বালো। কী বিশ্রী ভূতুড়ে অন্ধকার...' বকুলের আর সহ্য হচ্ছিল না।

সুইচ টিপে বাতি জ্বালল তীর্থপতি। মাথার ওপর থেকে এক দমক উজ্জ্বল আলো এই ঘরের মধ্যে ঠিকরে এসে পড়ল। পিণ্ডকার অন্ধকার ভেঙে লহমায় একটি রূপ পেল এই ঘর।

আলোয় বকুলের দিকে তাকিয়ে তীর্থপতি প্রথমেই কেন যেন ওর মুখে সেই ওপর-ঠোঁটের তিলটুকু খুঁজল। বকুলের সঙ্গে তিলটাও কি বড় হয়েছে!

'আমি ঠিক চিনতে পারি নি…' তীর্থপতি এতক্ষণে স্বাভাবিক মানুষের মতন কথা বলল। গলার আড়ষ্ট স্বরে একটু সংকোচ। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বিস্ময় এবং বিহ্বলতার রেখা এখনও পুরোপুরি অটুট রয়েছে।

ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বকুল। অচেনা ভীতিকর এক আবহাওয়া থেকে বোধগম্য প্রত্যক্ষ আলোকিত পরিবেশে ফিরে এসে বেশ আরাম এবং স্বস্তি পেল এতক্ষণে। তীর্থপতির দিকে চাইল। স্পষ্ট করে, ভরা দৃষ্টি মেলে।

'তুমি কি ভেবেছিলে ভূতে ডাকছে?' বকুল কৌতুক করে বলল, হাসি হাসি মুখে। অল্পের মধ্যে বেশ সহজ হতে পেরেছে ও, বোঝাই যাচ্ছিল।

তীর্থপতিকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বকুলের কথার জবাব দিল না। বেতের চেয়ারটা ঠেলে এগিয়ে দিল সামনে। বললে, 'বসো।'

চেয়ার টেনে নিজের মনের মতন করে গুছিয়ে নিয়ে বকুল বসল। হাঁপ ছাড়ার মতন ভঙ্গি করে নিশ্বাস ফেলল; বলল, 'বাব্বা! তোমার এই বাড়ি খুঁজে বার করতে কি হয়রানিই হয়েছে আমার। আধ ঘণ্টার ওপর শুধু ঘুরছি আর

ঘুরছি। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আগে একটু জল খাব, তেষ্টা পেয়েছে যা।'

ঘরের কোণায় কুঁজো। তীর্থপতি জল গড়াতে গেল।

'ওমা, ওকি···না না, তোমায় জল গড়িয়ে দিতে হবে না —আমি নিচ্ছি।' বকুল চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল। তীর্থপতির ঠিক পিছুতে। 'এ ঘরেই জল আছে কি করে জানবো, আমি ভাবলাম বুঝি চাকরকে হাঁক ডাক করতে হবে। নাও ওঠো, আমি নিচ্ছি।'

'আমিই দিচ্ছি।' তীর্থপতি শান্ত গলায় বলল।

ততক্ষণে তীর্থপতির জল গড়ানো হয়ে গেছে। কাচের গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়াল। 'চা খাবে?'

জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বকুল একটু হাসল। 'আতিথ্য করছ! দেখো, পরে গালাগাল দিয়ো না মনে মনে।' জলের গ্লাস প্রায় এক নিশ্বাসে শেষ করল বকুল। কুঁজোর জলে গ্লাস ধুয়ে জায়গা মতন রেখে দিল।

তীর্থপতি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। বকুল বললে, 'চায়ের কথা বলতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু চা কিন্তু, তার বেশি আতিথ্য করো না যেন, আমি তাহলে···'

তীর্থপতি চলে গেল। পরদাটা কাঁপতে লাগল।

বকুল বেতের চেয়ারে বসে ঘরের চারপাশে এবার ভাল করে তাকাল। ঘরটা ছোট। লম্বাটে ধরনের। একটি মাত্র জানলা, ছোট, গুটি চারেক শিক লোহার, রঙ-ফ্যাকাসে কাঠের পাল্লা। ভালোর মধ্যে জানলাটা যা দক্ষিণ ঘেঁষে।

দরজাও বড় নয়, সরু; দুটো মানুষ পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না। অথচ পরদাটা কী বড়—যত চওড়া, তত ঝুল। আশ্চর্য!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের সব কিছু এবার দেখছিল বকুল। ছোট ঘর, সরু সরু দেওয়াল, মাথার ওপর পোকায় খাওয়া কড়ি কাঠ। দেওয়ালগুলোয় বুঝি খুব নীল ধরিয়ে চুনকাম করা হয়েছিল, ফরসাটে ভাব কবে মুছে গেছে—এখন শুধু নীল ছোপ কোথাও কোথাও।

বকুল উঠে পড়ল। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে হঠাৎ। খাপছাড়া পায়ে ঘরের এদিক ওদিক একটু হাঁটল, দাঁড়াল, দেখল। উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষে বিছানা। ছোট অথচ ভালো খাট। মাথার দিকে গাঢ় খয়েরি পালিশ। হালকা রঙের বেড্‌কভার, শাটিনের কাপড়ের বালিশ। পায়ের দিকে আলনা। জামা কাপড় পাজামা, তলার থাকে জুতো। জানলার কাছ ঘেঁষে ছোট মতন টেবিল, সামান্য ক'টা টুকিটাকি; নক্‌শা করা সরু ফুলদানি আর এলার্ম ঘড়িটাই সহজে চোখে পড়ে, পেতলের একটা পাখিও। কালির দোয়াত, অ্যাসট্রে···। ক্যালেণ্ডারের ছবিটা বকুল স্পষ্ট করে দেখতে পেল। আধ-ভাঙা ঘুরোনো বুক-র‍্যাকের ওপরে দেওয়ালে আঁট হয়ে আছে ক্যালেণ্ডারটা। বকুলের মনে হল, ছবিটা সমুদ্র বা বিরাট নদীর। দিকচক্রবালে হারিয়ে যাওয়া আকাশ আর একটি উড়ন্ত পাখি ছাড়া সেই স্তব্ধ জলরাশির কাছে আর কিছু নেই।

বুক-র‍্যাকটা আস্তে করে একবার ঘুরিয়ে দেখল বকুল। টাল খেয়ে ক্ষীণ শব্দ করল কাঠগুলো, একটু নড়ল। খান কয়েক বই, কিছু কাগজ, ইংরিজী পত্রিকা।

ধুলো ধুলো গন্ধ লাগছিল বকুলের। অনেক ধুলো জমে আছে র‍্যাকটার মধ্যে—বকুল ভাবল। আঙুল ক'টা একবার দেখল। ধুলো লেগেছে। মুঠোর রুমালে হাত মুছে বকুল অযথাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটু দাঁড়িয়ে আবার ফিরে এল। আসতে আসতে পুবের দেওয়ালের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কালো ফ্রেমে বাঁধানো একটি ধূসর ছবি। বকুল চিনতে পারল না।

তীর্থপতি ফিরে এল।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল বকুল। 'এটা কার ফটো ?'

'মা, বাবা আর আমি। খুব ছেলেবেলার।'

'ন্যাকি!' বকুল খুঁটোনো চোখে আবার একবার দেখল, 'তোমার মুখটা—! ও, হ্যাঁ···এবার মনে পড়েছে, এই ছবিটা ত আগেও দেখেছি। সেই যে, যখন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, তোমার ঘরেই ছিল। ··ইস্, তীর্থপতিবাবু তখন গ্যালিস দেওয়া ইজের পরত···' বকুল হেসে উঠল।

'তা পরত।'

'যাই বলো তোমার বাচ্চা বয়েসের চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার একেবারে মিল নেই।' বকুল হাসতে হাসতে বলল। ফিরে এল বেতের চেয়ারটার কাছে। বসল। 'রাস্তায় দেখলে তোমায় আমি চিনতেই পারতুম না।'

'নামটাই শুধু তোমার মনে ছিল ?'

'তা বাপু ছিল। বলতে কি নামটা আমার খুব ভাল লেগেছিল তখন, তার পরেও····। না, নাম আমি ভুলবো না কখনও। হয়ত দেখবে মরার সময়ও···' বকুল কথা শেষ না করে আবার হেসে উঠল। 'তা বলে এখন আর তোমায় ওই

নাম ধরে ডাকতে পারব না, জিবে আটকে যাবে।' তীর্থপতির মুখে চোখ তুলে অল্প একটু দেখল বকুল। 'যদি তখন ঘরে বাতি জ্বালা থাকত—আমি কিছুতেই ডাকতে পারতাম না, তীর্থপতি-ই বলতাম। তীর্থপতিবাবু, আপনি-টাপনি—এই রকম কিছু বলতে হত।....সত্যি, তুমি কত বড় হয়ে গেছ।'

তীর্থপতি বকুলের দিকে স্বচ্ছ চোখে তাকাল। এই যেন প্রথম পুরো চেহারাটা দেখল নজর করে। বকুলও বড় হয়েছে। ওর সিঁথির সিঁদুরের দিকে কয়েক পলক চেয়ে, তীর্থপতি বলল, 'তোমার শরীর আগের চেয়ে একটু ভালই হয়েছে।'

'একটু! চোখে আরও একটা চশমা দাও তুমি।' বকুল রগড়ের ভান করে বলল, 'আমার কর্তাটি তোমার কথা শুনলে মজা দেখাত। একটু বলছ কি তুমি—এখন ত কলসির মতন মোটা হয়ে গেছি। বারো হাত শাড়ি পেলেই ভাল হয়।' বকুল সরল সহজ গলায় হাসতে লাগল।

কথাটা না মিথ্যে, না সত্যি। তীর্থপতি ভাবছিল, রোগাটে ঢেঙা সেই বকু এখন আর নেই। শরীরটা সেরেছে। তা বলে বিশ্রী রকম মোটা নয়, ও যা বলছে। বেশ ভরাট চেহারা হয়েছে বকুর। রঙটা তখন ছিল কালো ঘেঁষা ফরসা, এখন যেন ফরসার ভাবটাই বেশি। লম্বাটে মুখের গড়নটি আরও পুরন্ত সুশ্রী হয়ে উঠেছে।

ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারের কোণা টেনে বকুলের দিকে সামান্য মুখোমুখি হয়ে তীর্থপতি বসল।

'অনেক কাল পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল—কি বলো।' বকুল বলল।

'হ্যাঁ, অ-নেক দিন—' তীর্থপতির স্বর মৃদু, দৃষ্টি অন্যমনস্ক।

'বছর ছ সাত ত হবেই।' মুঠোর রুমাল দিয়ে চোখের কোণা মুছতে মুছতে বকুল নিজের মনেই বলল, 'সেই তুমি যখন কলেজে আই-এ পড়তে এলে তখন—তারপর···। ইস্ তখনও তুমি হাফ প্যাণ্ট পরতে—আমরা হাসতুম····আমার বাপু সব মনে আছে।' কথা শেষ করে এমন ভাবে তাকাল বকুল যেন তার মনে অনেক হাসির খোরাক এসে গেছে, এবং তীর্থপতি তা অনুমান করতে পেরেছে কি না সেটা লক্ষ্য করছে।

পুরোনো দিনের কথা তুলতে তীর্থপতির কোনো রকম উৎসাহ দেখা গেল না। শান্ত দুর্বল গলায় ও শুধলো, 'তুমি হঠাৎ কলকাতায় ?'

'আসি মাঝে সাঝে দু' বছর চার বছরে। গত বছরের আগের বছরে শীতেও এসেছিলাম একবার। অনেক দিন ছিলাম—মাস তিনেক ত বটেই। খুব ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে দেখা হয়। ঠিকানাই জানতাম না।'

'আমি বরাবরই কলকাতায় রয়েছি।'

'রয়েছ, কিন্তু কোথায় রয়েছ কে জানবে! আমাদের বাড়িতে পা দাও নি একবারও।···সেই প্রথম কলেজে পড়তে এসে যা যেতে খুব। তারপর ত ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে।' বকুল কোলের কাছে শাড়ির ভাঁজ নেড়ে চেড়ে ঠিক করল।

'দিদিমণি কেমন আছে ?'

'ভাল না।' বকুল নাক ঠোঁট কুঁচকে একটা ভঙ্গি করল। তীর্থপতির চোখে এই ভঙ্গি খুব চেনা চেনা লাগছিল। 'বয়স হয়ে গেছে—আর বেশি দিন নয়। এখন রোজই এটা

ওটা লেগে আছে—বাতের ব্যথা, বুকের কষ্ট,—সারাদিনই বিছানায়। এই শীতটা কাটে কি না কে জানে....!' বকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মুখে দুর্ভাবনা এবং বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে।

তীর্থপতি চুপ করে থাকল। জানলার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে।

'দিদিমণি তোমার কথা এখনও বলে।' বকুলই কথা বলল আবার, 'কেমন একটা টান আছে।...তোমরা ত সে-সব গ্রাহ্য করো না।' বকুলের শেষ কথায় তার ক্ষুব্ধতা খোলাখুলি প্রকাশ পেল।

'একদিন যাব।' তীর্থপতি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'থাক্, আর তোমায় মন ভোলাতে হবে না।' বকুল হাত তুলে নাড়ল নিষেধের ভঙ্গিতে। 'আমার বিয়ের পর ছ-টা বচ্ছর কেটে গেল, একদিন ভুলেও ত খোঁজ নিতে যাও নি ও বাড়িতে—কে মরল কে বাঁচল।...বড়দার মেয়েটা মারা গেছে তা জানো? জামাইবাবু আজ দু-বছর হাসপাতালে—টি বি হয়েছে, দিদি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়িতে। ছোড়দাটা যা হোক একটা চাকরি বাকরি করছিল—দলে পড়ে হুজুগে মাতলো, গোলমালে চাকরিটা খুইয়েছে।' বকুল হতাশ অপ্রসন্ন মুখে চেয়ে থাকল।

তীর্থপতি কথা বলল না। বকুলদের পরিবারের দুর্যোগ দুর্ভোগ বা বিড়ম্বনার ইতিহাসটুকু শুনে তার সহানুভূতি জাগল কি জাগল না কিছুই বোঝা গেল না।

চাকরে চা আনল। বকুলের জন্যে চায়ের পিরিচে করে সন্দেশ আর ওমলেট। জলও গড়িয়ে দিল।

'কে খাবে এ সব ?' বকুলকে অসন্তুষ্ট মনে হল, 'তোমায় বারণ করলাম না।'

'খাও সামান্য, কি আর এমন…'তীর্থপতি নিজের চায়ের পেয়ালা টেনে নিল।

'ক-ত ভদ্রতাই শিখেছ আজকাল।' বকুল খাবারের ডিস এগিয়ে ধরল, 'নাও, তুমি নাও আগে।'

'উঁহু, এখন আর আমার—'

'রাখো', বকুল ছোট করে ধমক দিল, 'তুমি একাই ভদ্রতা শিখেছ। নাও—'

আপত্তি অনুরোধের ছোট পালা চলল একটু, তারপর বকুল কেমন এক শাসন শাসন চোখ মুখ করে ধমকের গলায় বলল। 'হাঁ কর শীগগির—নয়ত আমি এই ডিম তোমার গায়ে ফেলে দেব।'

একটা সন্দেশও তীর্থপতিকে নিতে হল পরে। বকুলের এ-ধরনের পীড়াপীড়ি, জোর, ছেলেমানুষি তার ভাল লাগছিল না।

'পুরুষ মানুষদের একটা দোষ কি জানো—?' বকুল চেয়ারে গুছিয়ে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

তীর্থপতি তাকাল না। বকুলের কথা শোনার কৌতূহল বা আগ্রহ তার নেই বলেই মনে হল।

'ভালো কথায় কিছুতেই গা করবে না, যেই তেড়েফুঁড়ে ওঠো অমনি অন্য চেহারা, একেবারে সুবোধ বালক।' বকুল সরল গলায় হাসতে লাগল। 'সত্যি আমি তাই দেখেছি। বরাবর দেখছি। মাথার ওপর চেপে না বসলে কোনো কাজটি করাতে পারবে না এদের দিয়ে।....আমার কর্তাটিও ওই,

ছেলেটিও অবিকল তাই।' বকুল আর এক চুমুক চা খেল, আর এক দফা হাসল, 'দেখলাম ত; এই কলকাতায় বদলি নিয়ে ফিরে আসতে কত বলেছি, গা দেয় না, শেষে যখন খেতে বসতে ঝগড়া লাগালাম—তখন বাবু ধাতে এলেন। ছেলেটাও এক্কেবারে বাপের মতন। ভাল কথা গ্রাহ্যই করে না, দু'চার ঘা দিই যখন রাগের মাথায়, ব্যাস্ অমনি সুড়সুড় করে দুধটি খাবে, ইজেরটি পরবে।' বকুল সংসারের কথা বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল; বেশ হাসি খুশী মনোরম দেখাচ্ছিল।

চায়ের কাপ মাটিতে রেখে তীর্থপতি সিগারেট ধরাল। 'কলকাতায় পাকাপাকিভাবে এসে গেছ তাহলে!'

'হ্যাঁ, বেঁচেছি। ও ছাই পাটনা ফাটনা আমার ভাল লাগত না।' বকুল ঠোঁট উলটে নাক মুখ কোঁচকাল বিরক্তিতে। 'তা ছাড়া দেখ না—এখানে বাড়ির ওই অবস্থা—মনটা ভাল থাকত না। বছর দু' বছর অন্তর একবার করে চোখের দেখা। মেয়েমানুষের জীবনটা যেন কলম করার গাছ, এক জায়গায় জন্মায়, তাকে কেটে আর-এক জায়গায় ফল ধরান হয়।'

তীর্থপতি অনেকক্ষণ পর এবার বকুলের মুখের দিকে চাইল।

একটু চুপচাপ। বকুল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখল। গায়ের কাপড়টুকু ঠিক করল অযথাই। কপালের ওপর ক'টি চুল এসে পড়েছিল, হাতে করে গুছিয়ে নিল।

তীর্থপতি সিগারেটে ঘন করে টান দিয়ে আস্তে আস্তে গাঢ় ধোঁয়া বের করতে লাগল।

'মিনুপিসি কলকাতায় এসেছে।' বকুল আচমকা বলল।

'মাসি?' তিতু চমকে উঠল।

'দিদিমণিদের ওখানেই উঠেছে— ; আমি ত আবার ঠিক ও-বাড়িতে থাকি না, কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।'

'মাসি হঠাৎ কলকাতায় এসেছে কেন?' তীর্থপতি প্রায় রুক্ষ গলায় শুধলো।

'কি সব দরকার আছে।' বকুল যেন থতমত খেয়ে এড়িয়ে গেল অনেক কথা। সামান্য থেমে আবার বলল, 'তোমার কাছেও।'

'আমার কাছে—!'

বকুল কি যেন ভাবছিল। বলল, 'তুমি নাকি ওঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছ?'

তীর্থপতি জবাব দিল না কথার। সিগারেটের টুকরো চায়ের তলানির মধ্যে ফেলে দিল।

বকুল দেখছিল, তীর্থপতির মুখে রক্ত ছুটে এসে লালচে ভাব হয়েছিল প্রথমটায়, এখন ধীরে ধীরে কালসিটের রঙ ধরে কালো হয়ে আসছে। চশমার কাচের ভেতর দিয়েও অসহিষ্ণু, বিরক্ত এবং কেমন একটা কাঠিন্যের দৃষ্টি ধরা পড়ছে। বকুল বুঝতে পারল. খবরটায় তীর্থপতি খুব বেশি রকম চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

'আমি প্রায় রোজই ও-বাড়িতে যাই। কাল গিয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলায়, দেখি মিনুপিসি এসেছে।' বকুল যেন তার তরফের সব কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছিল, 'আজ সকালে মিনুপিসি আমার বাড়ি এসেছিল।..... অনেক কথা বলল। আমায় বলে নয়, দিদিমণিদের কাছেও বলেছে। হয়ত আমায় দু'দশটা বাড়তি কথাও বলেছে; জানি না ঠিক।'

তীর্থপতি সঙ্গে সঙ্গে কথার কোনো জবাব দিল না।

বকুলকে একবার লক্ষ্য করে দেখল। গালে হাত রেখে ও তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'মাসি তোমায় পাঠিয়েছে?' তীর্থপতি মাথার ওপর ছাদের ফিকে আলোটে-ভাব দেখতে দেখতে শুধলো।

'পাঠিয়েছে—?' বকুল অস্পষ্ট শব্দ করে জবাব দিল, 'না, মিনুপিসি আমায় পাঠায় নি।'

'তবে?'

তবে! বকুল প্রশ্নটা প্রথমে ঠিক ধরতে বা বুঝতে পারল না। পরে বুঝল। মিনুপিসি যদি না পাঠিয়ে থাকে তবে এতকাল পরে সে হঠাৎ এসেছে কেন?....কেন?

এই সহজ সরল সামান্য একটা প্রশ্ন যেন দেখতে দেখতে মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। খানিকটা ঘন শুকনো কালির ওপর হঠাৎ জল পড়ে যেমন আস্তে আস্তে রঙ ছড়াতে থাকে। দু'টি ক্ষুদ্র শব্দ অনেক শব্দ, বহু শব্দার্থের মতন বাড়ছিল। কেন? কেন তুমি এসেছ, কি দরকারে, কোন উদ্দেশ্যে, এতদিন পরে, হঠাৎ, এই ভর সন্ধ্যায়, ঠিকানা খুঁজে, বাড়ি খুঁজে.......?

বকুল হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় এবং কুণ্ঠিত বোধ করল। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। যেন তার এই হঠাৎ-আসা অনুচিত, অশোভন। কিংবা এই আসার সঙ্গে কিছু একটা ভীষণ স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

বকুল আগে কথাটা ভাবে নি। মনে হয় নি, আচমকা তাকে সামনে দেখে খুব অবাক এবং খুশী হওয়া ছাড়া তীর্থপতির অন্য কোনো রকম ধারণা হতে পারে, হওয়া সম্ভব।

'মিনুপিসির হয়ে আমি এসেছি—নয়ত আসতাম না,

আসতে পারি না, এ-কথা তুমি ভাবছ কেন?' ক্ষুব্ধ আহত গলায় বকুল বলল শেষে।

মনে হল, তীর্থপতির কান নেই, শুনছে না, বা শুনলেও নিস্পৃহের মতন শুনছে।

খানিকটা চুপ করে থেকে বকুল বলল, যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ত দিচ্ছে এমন গলায়, 'তুমি এমন কিছু পর নও আমাদের কাছে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মানুষ দেখা করতেও আসে। তার আবার কেন কি জন্যে—এত কথা হয় না কি?'

এবারও তীর্থপতি নিরুত্তর থাকল। শুধু দেশলাই জ্বালার অত্যন্ত মৃদু একটু শব্দ। আবার সিগারেট ধরিয়েছে।

একজন বরাবর চুপ করে থাকলে অন্য জনে কত আর কথা বলতে পারে। বকুলও চুপ করে থাকল। দরজার ঘন পরদার গাঢ়তা এবং অস্বাভাবিকতা দেখছিল। অথচ ঠিক দেখছিল না কিছুই। এই ঘরের দেওয়াল কড়িকাঠ বিছানা চোখ এক থেকে অন্যতে সরে সরে যাচ্ছিল। নীচে গলিতে বোধ হয় কোনো গাড়ি আটকে গেছে, তার হর্ণ আর ইঞ্জিনের থেকে থেকে আক্রোশের শব্দটা ভেসে আসছে।

জানলার দিকে তাকাল বকুল। বাইরে যে একটা জগৎ আছে বোঝা যায় না। এই ঘরের আলো ডিঙোলেই শূন্যতা এবং অন্ধকার। কিংবা, বকুলের মনে হল, শুধরে নিয়েই মনে হল, এই ঘর আর ওই প্রাণহীনতা আলাদা নয়, একই। যেটুকু আলো জ্বলছে এখানে সেটুকু অলীক, অস্বাভাবিক। দ্বীপের মতন স্বতন্ত্র, নির্বাসিত, সম্পর্কচ্যুত হয়ে এই ঘর পড়ে আছে, চার পাশে কূলহীন অন্ধকারের দূরত্ব রেখে। বকুল

আচমকা এসে পড়ে ঘরটিকে তার স্বভাব থেকে সরাতে চেয়েছিল। এখন তাই এত বেয়াড়া বেখাপ্পা গুমোট আস্বাভাবিক লাগছে।

'মিনুপিসি আমায় তার হয়ে এখানে পাঠায় নি।' বকুল আর সহ্য করতে পারল না, এই বিশ্রী অসাড় শক্ত অর্থহীন স্তব্ধতা। অধৈর্য, উত্তেজিত, খানিকটা বা প্রতিবাদের আক্রোশেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি ভুল ভাবছ। আমি কারও হয়ে ওকালতি করতে আসি নি।'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল বকুল। তীর্থপতির ঠোঁটে ধোঁয়ার ফিকে বাতাস ছাড়া আর অন্য-কিছু নেই—না কৌতূহল, না প্রশ্ন। ও যেন মনে মনে সব বুঝে নিয়েছে। বকুল বুঝতে পারছিল, তার কথা শেষ হয় নি, তার কথা বলা হয় নি। ওকালতি নয়, স্বার্থ নয়—তবে কেন এসেছে ও ?

কেন ? বকুল তাড়াহুড়োয় যেটুকু ভাবতে পারল ভেবে নিল। 'আমি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, অ-নেক কাল দেখা সাক্ষাৎ নেই তাই।'

'মাসি ক'দিন থাকবে ?' তীর্থপতি হঠাৎ শুধলো।

'জানি না। হয়ত দু চার দিন।' বকুল অসন্তুষ্ট গুমোট গলায় জবাব দিল।

'তোমাদের বাড়িতে ?'

'দিদিমণিদের—।'

একটু চুপচাপ। তীর্থপতি একবার কি একটা কথা বলতে গেল, প্রথম শব্দটা শোনা গেল, কিন্তু তারপর আর কিছু না—একেবারে নীরব।

সামান্য অপেক্ষা করে বকুল বলল, 'কি বলছিলে ?'

'না, কিছু না।' মাথা নাড়ল তীর্থপতি।

বকুল দু' এক পলক দেখল তীর্থপতিকে। অসহ্য এক বিরক্তি এসেছে এবার তার। নিজেকে সামলাতে না পেরে বলল, 'তোমার মাথা টাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? এ-রকম হয়ে গেছ কেন?

'কি রকম?'

'রকম আর কি, নিজে বোঝো না!···কোনো ব্যাপারেই গা নেই, গরজ নেই····কোনো রকমে আছি, ব্যাস্···' বকুলের স্বর ক্ষুণ্ণ, সামান্য অভিভূত।

'এই ত ভালো'

'ভালো না আর কিছু!' বকুল ঠোঁটের অবজ্ঞা-সূচক একটা ভঙ্গি করল, 'চোর-ছ্যাঁচড়ের মতন পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকার মতন। মানুষ এই ভাবে বাঁচে না কি! প্রাণ নেই কোথাও। যেমন বাড়ি, তেমনি ঘর; মানুষও সেই রকম—' বকুল কথা বলতে বলতে ঘরের চারপাশে তাকাচ্ছিল।

তীর্থপতি জবাব দিল না কথার। শুনল শুধু। ঘরের মধ্যে টিকটিকি ডাকছিল। দূরে রেল লাইন দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। বাতাসে মিলিয়ে আসা শব্দ।

'ক'টা বাজল?' বকুল আচমকা শুধলো। তারপর নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের কাছে গেল। 'ওমা, আটটা ত বাজে দেখছি। না, এবার যাই।'

তীর্থপতি হেলান ক্যাম্বিসের চেয়ারে একই ভাবে বসে আছে। বকুলের কথায় একবার তাকাল।

বকুল সামান্য নড়ল চড়ল, তীর্থপতিকে দেখল। হঠাৎ তার মনে হল, তীর্থপতির শান্ত নীরব মূর্তি এখনও একটা

প্রশ্নের মতন স্থির হয়ে আছে। ওই মানুষটা তার নিরাসক্ত নিস্পৃহ উপেক্ষার আচরণে যেন বলছে, তুমি কেন এসেছিলে, যদি মাসির হয়ে না এসে থাকো তবে ?....

সেই ভয়ংকর অস্বস্তি আবার। নিজের কাছেই এবার প্রশ্নটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে, বকুলের অভিমানকে আঘাত করছিল। বিরক্ত করছিল। প্রতি মুহূর্তে আরও কঠিন হয়ে তাকে বিভ্রান্ত করছিল। বকুলের মন হল এই বিশ্রী অস্বস্তিকর প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে সে চলে যেতে পারে না।

টেবিলের ওপরে এটা-সেটা নাড়তে লাগল বকুল। পেতলের সারসটাকে হাতে তুলল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার পলকের জন্যে দেখল তীর্থপতিকে, চোখ ফিরিয়ে নিল। নিজেকে নিজেই যেন শোনাচ্ছে এমন গলায় বলল, 'মিনু-পিসির কাছে অনেক কথা শুনলাম। খারাপ লাগছিল খুব।.... মানুষের দুঃখ কষ্টে মানুষ আসে। তা ছাড়া এক সময় ত আমাদের খুবই ভা-ব ছিল...'আস্তে আস্তে থেমে থেমে কেমন এক সংযত আবেগে কথা শেষ করে বকুল থামল। এবং কি আশ্চর্য তার মনে হল, এতক্ষণ যে বিরাট, বিশ্রী রকম ভার বসেছিল বুকে, তা হালকা হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা বলে বকুল নিজেকে মনে মনে সমর্থন করল। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি, খু-বই ভাব ছিল, বন্ধু ছিল দু' জনে দু'জনার, স্নেহ ভালবাসা ছিল যথেষ্ট—আজ সেই অধিকারেও এসেছে। ভেবেছিল, কয়েকটা কথা বলবে, চেনা-জানা আপন-জনকে, স্নেহ ভালবাসা বা বন্ধুত্বের সম্পর্কে গায়ে পড়ে মানুষ যেমন সমবেদনা সহানুভূতি জানায়, উপদেশ দেয়, তেমনই। কিন্তু... কিন্তু তিতুকে কিছু বলা হল না!

বকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। নড়ে চড়ে উঠল। 'বেশ রাত হল, চলি ; অনেকটা যেতে হবে আবার।'

তীর্থপতি হেলানো পিঠ সামনে ঝুঁকিয়ে সামান্য সোজা হল। ভঙ্গিটা যেন বলছে, ও তাই বুঝি, আচ্ছা! বকুলের দিকে চেয়ে মৃদু ম্লান হাসির ভাব করল।

বকুল টেবিলের কাছ থেকে সরে তীর্থপতির চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তে কোনো রকম অভিমান নেই তার। সামান্য অবাক হবার ভাণ করে বকুল বলল, 'ওমা, বসে থাকলে যে, ওঠো—রাস্তাটুকু এগিয়ে দাও।'

আপত্তি করল না তীর্থপতি। 'চলো'।

মেস বাড়ির সিঁড়ি পেরিয়ে রাস্তা। ছোট-গ্যাসের টিম-টিম আলো আছে কি নেই। ঠেলা গাড়িতে পথ ভরতি, কুকুর কাঁদছে, কার্তিকের অল্প অল্প ঠাণ্ডা।

'একদিন এসো, আমার ওখানে।' বকুল বলল।

'দেখি, যাবো।'

বকুল ঠিকানা দিল, পাশাপাশি দু' জনে হাঁটছে। পিছনে আকারহীন ছায়া। সামনে গর্ত-খোঁড়া রাস্তা। অনেকটা দূরে গ্যাসপোস্টের ঝাপসা একটু আলো। পথ প্রায় নির্জন। পায়ের শব্দ উঠছে। কেমন যেন কানে লাগার মতন।

'বিয়ে থা করবে না?' বকুল হঠাৎ বলল, কিসের যেন খেয়ালে। সামান্য হালকা গলায়।

তীর্থপতি জবাব দিল না। রাস্তার পাশে একটা গাছের ছায়া থেকে একটা ভীত কাক আচমকা ডেকে উঠল। বার দুই। তারপর আবার চুপ।

'কি, বললে না?' বকুল আবার শুধলো।

'কিসের—।'

'বিয়ে করবে না।'

'না।'

অল্প কয়েক পা এগিয়ে বকুল আরও হালকা সরস গলায় শুধলো, 'কেন, কেউ আছে নাকি?'

'কিসের কি থাকবে?'

'এই,...এই কোনো মেয়ে টেয়ে, পছন্দ করা...' বকুল তীর্থপতির হাতের কব্জির কাছটায় আলগা করে ছুঁলো। 'সত্যি করে বলো ত তিতু।...মিনুপিসি বলছিল যদি তোমার...' বকুল আর শেষ করল না। অথচ তার সরল সকৌতুক একটু হাসির ছটায় যেন কথার পরও কথা থেকে গেল। এই অন্ধকারে।

তীর্থপতি নিরুত্তর। গ্যাসপোস্টটা কাছে এল। ঝাপসা আলোর গণ্ডির মধ্যে ছ'জনের ছায়া সামান্য একটা আকার পেতে পেতে মিলিয়ে গেল আবার। অন্ধকার।

বড় রাস্তার মোড়ের কাছে এসে তীর্থপতি হঠাৎ বললে, 'বাবা কেমন আছে?

বকুল তীর্থপতির মুখের দিকে তাকাল। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। অত্যন্ত বিষণ্ণ, ক্লান্ত আভাসটুকু ছাড়া।

'ভালো না। মিনুপিসি বলছিল, এখন একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছেন পিসেমশাই।'

একটা বাস আসছিল। তীর্থপতি তাকিয়ে থাকল। বাসটা বেশ জোরে আসছে। আসবে। বকুলকে তখনও খানিকটা যেতে হবে তাড়াতাড়ি, নয়ত বাস ধরতে পারবে না।

'তুমি যাও বকু। তাড়াতাড়ি।' তীর্থপতি বলল।

বকুল মুখ তুলে তীর্থপতিকে দেখবার আগেই আকাশটা চোখে পড়ল। একটা মেঘ যেন ভাসতে ভাসতে এসে মরে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে চাঁদের গায়।

তের.

তীর্থপতির ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটায় তন্দ্রার ঘোরে অনুভব হ'ল, এখনও সে ঘুমিয়ে আছে। আচমকা বেয়াড়া শব্দ করে জানলার একটা পাট বন্ধ হয়ে যায় নি। ম্লান একটু আলো বা বাইরে অশ্বত্থপাতার শব্দ—সবটাই স্বপ্নের জগতে ঘটছে। অপরিচ্ছন্ন অবশ চেতনায় এই ধরনের অনুভব খানিকটা সময় তীর্থপতিকে শান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখল। সামান্যক্ষণ পরে, ঠিক বুঝতে পারল না ও, কখন চোখের পাতা খুলে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাইরে দমকা হাওয়া উঠেছে, ঝোড়ো বাতাসের মতন। জানলার বাইরে অশ্বত্থের একটি সুরু-প্রশাখার পাতায় বাতাসের আছড়ানি লেগে পত্‌পত্‌ শব্দ হচ্ছে থেমে থেমে। ফ্যাকাশে আলো পড়েছে কাছটায়, জানলার ঠিক গায়ে। অশ্বত্থের ডালটা জানলার গা ছোঁওয়া। তীর্থপতি শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলো এবং পাতার ছায়ার সামান্য একটু জাফরিও দেখতে পেল।

একবার মনে হল তীর্থপতির, জানলার ভেজান পাটটা খুলে হুকে যথারীতি আটকে দেয়। বিছানা ছেড়ে উঠতে

ক্লান্তি লাগছিল। উঠি কি উঠবো না করে আরও খানিকটা সময় কেটে গেল।

এখন কত রাত, তীর্থপতি ভাববার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হতে পারে মাঝ রাত; সকাল-হব-হব হয়ে এল, তাও হতে পারে। অনিদ্রার ক্লান্তি এবং অস্বস্তি এতক্ষণে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারল তীর্থপতি। আসলে কতক্ষণ আর ঘুমিয়েছে! যে-টুকু ঘুমিয়েছে তাও ঠিক ঘুম নয়—তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা, স্নায়বিক শিথিলতা হয়ত। জানলার একটা কপাট দমকা বাতাসে বন্ধ হয়ে গেলে যেটুকু শব্দ হয় তাতে গভীর শান্ত ঘুম ভাঙে না, ভাঙতে পারে না।

অনিদ্রার বিরক্তি আরও বেশি করে অনুভব করতে লাগল তীর্থপতি। মাথার চুলে আঙুলের চিরুনি টানল, খানিকটা হাত রগড়াল ঘাড়ে, কপাল টিপল, চোখ বুজে শুয়ে থাকল ঘুম ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ঘুম আর এল না। ক্লান্তিকর অবাধ্য চিন্তাগুলো ঘুরে ফিরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাথার মধ্যে ক্রমাগতই ধোঁয়ার মতন পাক খাচ্ছিল, আর শেষ পর্যন্ত পথ না পেয়ে চিন্তার জগতটাকে ক্রমশই ঘোলাটে, ভারী করে তুলছিল।

নিজের বিচলিত বিপর্যস্ত ভাবটা তীর্থপতি এখন উগ্র ভাবেই অনুভব করছিল। সম্ভবত পাঁচ কি ছ' ঘণ্টা সে মোটা-মুটি একই মানসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। অবস্থাটা শান্ত আবহাওয়ার নয়, বেপরোয়া বাঁচিমরি রকমের লাফানো ঝাঁপানো উগ্রতারও নয়। এর মাঝামাঝি কোনো ধরনের। যেন একটি অদ্ভুত আবর্ত ক্রমাগত মনের মধ্যে পাক দিয়ে দিয়ে গভীরে নেমে যাচ্ছে। কিংবা কোনো এক মাকড়সা

জাল বোনা শুরু করে ক্রমাগত মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে পেঁচিয়ে জটিল থেকে জটিলতর জাল সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

বকুল না এলেই ভাল ছিল, তীর্থপতি ভাবল। ভাবনার পুনরাবৃত্তি করল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই একই কথা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত হতাশ হয়ে মনে মনে সে বলেছে। এখন আবার নতুন করে বলল।

শত হলেও কথাটা শেষাবধি যা দাঁড়ায় তীর্থপতি তা বুঝতে পেরেছে। বকুল ঠিক বকুল হয়ে আসে নি। সে তার চেয়ে বেশি কিছু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তীর্থপতির অতীত এবং বর্তমান, বাবা মাসি, তাদের পারিবারিক ক্লান্তিকর ইতিহাস, তার বেদনা ও বিরক্তি এবং আরও কত কি এই ধরনেরই। হয়ত বকুল জানে না, কখনও কখনও একটি মানুষ যতটুকু জায়গা জুড়ে আসে তার চেয়ে শতগুণ বেশি ছায়া তার পিছনে পড়ে থাকে। কায়াটা সেখানে নিছক হেতু। দৃষ্টির ঠিক আগোচরে নয়, কিন্তু লক্ষ্যেরও বস্তু না।

তীর্থপতি বকুলের ওপর লক্ষ্যকে বেঁধে রাখতে পারে নি, চোখ এবং মন বকুলকে ডিঙিয়ে তার পিছনের বৃহৎ ও জটিল ছায়াটার দিকেই আটকে ছিল।

সে ছায়া কেমন ? গঠনহীন আকারহীন ছায়া নিশ্চয় নয়। এ এক ধরনের জগৎ। তীর্থপতির প্রতিপক্ষ অস্তিত্ব। অসহ্য বিরক্তি এবং নিস্পৃহতা সত্ত্বেও ওই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তীর্থ-পতিকে লড়তে হয়। ওখানে কি নেই, কে নেই ! বাবা আছে, মাসি আছে, তীর্থপতি নিজে, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের বন্ধন, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা, দায়িত্বহীনতা—আরও কত যে !

বকুল এই প্রতিপক্ষ জগতটিকে আবার করে তীর্থপতির সামনে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। তীর্থপতি মনে মনে এর সঙ্গেই লড়ছিল। আর স্বভাবতই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, অসহ লাগছিল। তবু মুক্তি পাচ্ছিল না।

ঘুমিয়ে পড়তে পারলে নিস্তার পাওয়া যেত। সকালে এতখানি উত্তেজনা হয়ত থাকত না। কিন্তু কি কপাল, ঘুম এসেও চলে গেল। যেন অল্প একটু বিশ্রাম দিতে এসেছিল।

বিছানার ওপর অস্বস্তির সঙ্গে বার কয়েক এ-পাশ ও-পাশ করে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল তীর্থপতি। জল তেষ্টা পেয়েছে। বাতি জ্বালল না। নির্ভুল হাতে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। বাতাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া জানলার পাটটা খুলে হুকে আটকে দিল। চাঁদের আলো সবটা জানলা জুড়ে স্থির হয়ে বসল। বাইরে অশ্বত্থের পলকা ডালের আগা মাথা নাড়ছে এখনও। পাতা কাঁপছে—মৃদু মৃদু।

তীর্থপতি সিগারেট ধরিয়ে জানলার কাছে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল শূন্য ক্লান্ত চোখে। চাঁদের আলোটুকু চুপ করে পড়ে আছে। অশ্বত্থের ডালপালা খানিক ম্লান আলো খানিক ছায়া নিয়ে বাইরে কি এক নিস্তব্ধ রহস্যের মতন দাঁড়িয়ে। কোথাও একটু শব্দ নেই, সাড় নেই। ক্রমঘনীভূত স্তব্ধতা এই রাত্রিকে ঢেকে ফেলেছে।

তীর্থপতি অনেকক্ষণ প্রায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল; নড়ল না কাঁপল না, জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত নিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্তকে সে অনুভব করছিল অস্পষ্ট চেতনায়। মরা ফ্যাকাসে একটু আলো এবং পরিপূর্ণ নীরবতাকেই তীর্থপতি যেন একটি অস্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে অনুভব করতে পারছিল,

অদৃশ্য কোনো বন্ধনে তার স্বত্তা ওই নির্বাক অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

সিগারেটের আগুনের আঁচটুকু নখে লাগল। আঙুলের আগায় জ্বালা জ্বালা স্পর্শটুকুতে তীর্থপতির ঘোর কাটল। ছুঁড়ে ফেলে দিল টুকরোটা।

আবার বিছানায়। বিছানায় শুয়ে তীর্থপতি বুঝতে পারল, মনের মধ্যে যে-মাকড়সাটা জাল বুনছিল—সে থামে নি। এখনও তার ছোট্ট বিশ্রী শরীরটা পাক খেয়ে, ঘুরে ফিরে টানা-পোড়েন দিয়ে জালটাকে আরও জটিল করে বুনে যাচ্ছে।

তীর্থপতির হঠাৎ মনে হল, বকুলের কাছেই কথাটা সে বলে দিলে পারত। যত দরকারই থাক মাসি যেন তার সঙ্গে দেখা করতে না আসে। তেমন দরকার থাকলে বরং একটা চিঠি লিখলেই চলবে।...তীর্থপতির বাস্তবিক এখন অনুতাপ হচ্ছিল, কেন বকুলের কাছে কথাটা সে বলে দিল না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মাসি ঠিক এখানে এসে হাজির হবে।

কথাটা ভাবতেই তীর্থপতির মন অসীম বিরক্তিতে ভরে উঠছিল। মাসির চেহারাও সে মনে মনে দেখতে পাচ্ছিল। সেই অসহ্য বিশ্রী স্থূল এক ব্যক্তিত্ব, তীর্থপতি যা ঘৃণা করে। সম্ভবত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই যার প্রতি এতখানি ঘৃণা তার।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই ঘৃণ্য মানুষটিই এই ঘরে এখন অন্ধকারে তীর্থপতির চোখে কেন্দ্রীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝাপসাভাবে। মাসির ঠোঁট বন্ধ, চোখ ধারাল, দৃষ্টিও তীব্র, মুখের কাঠিন্য সামান্য যেন ক্ষয়ে গেছে।

তীর্থপতি চোখ সরাতে চাইল, উপেক্ষাভরে তাড়াতেও

চাইল মাসিকে, পারল না। মাসি নড়ল না। বরং তীর্থপতির মনে হল, কেমন এক ভয়ে সে নিজেই চোখ নামিয়ে নিল।

আমি কি হেরে গেলাম! মনে মনে অত্যন্ত বেদনা-ভরে নিজেকে শুধলো তীর্থপতি। মাথা নেড়ে না-না বলতে গেল, কিন্তু অনুভব করল সে হেরে যাচ্ছে। মাসিই জিতছে। যত জিতছে ততই মাসি হাসছে, উপেক্ষার অবজ্ঞার।

পরাজয়ের বিশ্রী এক আক্রোশ ফেনিয়ে উঠতে লাগল তীর্থপতির মনে। এই আক্রোশ পশুর মতন। হিংস্র, নির্মম। তীর্থপতির মানসিক চেতনা আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল।

বালিশে মুখ গুঁজে ক্লান্ত অসহায় আহত মনোভাব নিয়ে কখন চুপ করে শুয়ে পড়ল তীর্থপতি। জানালার ওপর থেকে চাঁদের ফ্যাকাশে আলোটুকু সরে গেছে, অন্ধকার নিবিড় হয়ে দুলছে দেওয়ালে, বাইরে বাতাস শান্ত, ঝিমঝিমে নীরবতা।

কখন যেন খেয়াল হল তীর্থপতির, তার বুকের তলায় জমে থাকা কত কালের পুরনো কান্না আবার আজ ওপরে উঠে এসে গলার কাছে ছটফট করছে। এই কান্না ছিল তিতুর। তীর্থপতি তাকে শুকিয়ে নিঃশেষ করতে চাইছে, অথচ পারছে না।

সারা জীবন ধরে সে একই কান্না কাঁদতে পারে না; তিতু কাঁদত তার অসহয়তার জন্যে—তার চারপাশে শক্ত করে বসানো খাঁচার শিকগুলোর জন্যে, আর কাঁদত নিঃসঙ্গতার জন্যে। তীর্থপতি তিতু নয়। তিতুকে সে পুরোপুরি মুছে ফেলতে চেয়েছে যৌবনে। আমি অসহায় নই, খাঁচায় বন্দী হয়ে নেই: তীর্থপতি নিজেকে বলত; নিজের আচরণকে

পরখ করে দেখাত—সে মুক্ত। মুক্তি আছে বলেই আজ তীর্থপতি তার রুচি মতন খুশি মতন খেয়াল বশে থাকতে পারে। হ্যাঁ পারে। তাই সে আছে। পিছনের খাঁচাকে সে দূরে ফেলে দিয়ে এসেছে। সেদিকে তাকায় না, অসীম উপেক্ষায় ঘৃণায় বীতরাগে ক্রমশই তাকে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।......আর নিঃসঙ্গতা? তীর্থপতি ছেলেবেলার সেই নিঃসঙ্গতাকে আজ আর অনুভব করে না। তিতুর নিঃসঙ্গতা ছিল ছেলেমানুষের, বোকার.......আসলে সে নিঃসঙ্গতা অভিমানের। তিতু চাইত সঙ্গ, তিতু চাইত তার প্রতি অন্যের আকর্ষণ। আদর স্নেহ ভালবাসা—ভালবাসাই চাইত তিতু। তীর্থপতি বুঝেছে, এ চাওয়াটা ভাল নয়। সঙ্গ চাইলে সঙ্গী জোটে, বন্ধু, আত্মীয়, প্রেমিকা—তাও। এরা জীবনে শুধু জট পাকায়, বাঁধন বাঁধে—মুক্তিকে আগল দেয়। আসলে, নিঃসঙ্গ না হলে মুক্তি নেই। তুমি শুধু তোমার—অন্য কেউ তোমার ভাগীদার হলেই, কিছুটা তার হয়ে যায়। তাকে যদি কিছু দাও তবে তার হাতে তোমার বাঁধনের একটা দড়ি স্বেচ্ছায় তুলে দেওয়া। তীর্থপতি তা দেবে না। সে মুক্তি চায় নিজের মতন করে, সে নিঃসঙ্গতা চায় আত্মরক্ষা করার জন্যে।

বাইরে বুঝি অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। না কি মনের! তীর্থপতির মনে মনে শপথ করল, সে হারবে না; কিছুতেই না। মাসির কাছে সংসারের কাছে অতীতের কাছে সে হার মেনে নেবে না।

চৌদ্দ

একটা দিন মাঝে রেখে কাঁচা রোদ ভরা সকালে তপতী এল।

'তোমায় বলে নি এরা কেউ, আমি কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে ফিরে গেছি।' তপতী বলল।

তীর্থপতি সামান্য মাথা নাড়ল। যার অর্থ বোঝায়-হ্যাঁ, বলেছে।

'কোথায় গিয়েছিলে কাল?' বিছানার এক পাশে বসেছিল তপতী। শাড়ির আঁচলটা সামান্য সরিয়ে দিল। মনে হল, ঢিলে ঢালা হয়ে বসল এতক্ষণে। বাঁ হাত দিয়ে খোঁপাটাকে একটু সামলে নিল। 'কখন ফিরলে?'

'ন'টার পর।' তীর্থপতি জবাব দিল। ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসেছিল ও। মাসির দিকে চাইছিল না। চাইতে পারছিল না।

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিল?'

'না। অন্য একটু কাজে।'

দু'জনেই চুপ করে গেল। সকালের রোদ এখনও ঘরে ঢোকে নি। রোদের আভাটুকু ছড়ানো রয়েছে। বাইরে ঝকঝকে রোদ। সূর্য খানিকটা না উঠে গেলে এ ঘরের জানলা দিয়ে রোদ ঠিক আসে না। জানলার বাইরে রোদের চিককাটা অশ্বত্থ শাখাটা দুলছে। কাক চড়ুই ডাকছে।

তীর্থপতি বিব্রত বোধ করছিল। মাসি আসতে পারে এই সন্দেহে কাল বিকেলের পর আর মেসে ফেরে নি। আজ ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলতে না খুলতেই মাসি এল।

তীর্থপতি পলকের জন্যে একবার মাসির দিকে চাইল। পায়ের ওপর দিয়ে পা টেনে মাসি বসে আছে। পিঠ টান করে। বসার ভঙ্গিতে এখনও যেন একটা মর্যাদা ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা। সাজপোশাকেও যতটা সম্ভব সেই পুরোনো মাসির ছায়া রয়েছে। পরনের শাড়িটা সিল্কের, জামাটাও হয়ত। তীর্থপতি মনে মনে একটু শ্লেষ হাসি হাসবার চেষ্টা করে, কৌতুক অনুভব করতে চাইল। পারল না।

'তুমি ত অনেকদিন বাড়ি যাও নি।' মাসি বলল, বলার পর ছোট করে হাই তুলল। অবসাদের।

তীর্থপতি বুঝতে পারল, আসল কথার আগে এটা ভূমিকা। চুপ করে থাকল। বাইরে ছাদে পায়ের শব্দ। হেমন্ত বোধ হয় আসছে। সকালে উঠে মুখটা কোনো রকমে ধুয়ে নিতে পেরেছে, এখনও চা খাওয়া হয় নি।

'ছুটিছাটা পেলে যাও না কেন?' মাসি এবার শুধলো।

কি বলবে ঠিক করতে পারল না তীর্থপতি। ইচ্ছে হয় না যেতে, ভালো লাগে না—মনে মনে বলল। মুখে সরাসরি কথাটা বলতে বাধল; বলল, 'হয়ে ওঠে না।'

হেমন্ত চা দিয়ে গেল। দু-জনার মতন। তীর্থপতি উঠে এক কোণা থেকে বিস্কিটের টিনটা নিয়ে এল। তপতী হাত নাড়ল, না বিস্কিট নেবে না। তীর্থপতি নিজে দুখানা বিস্কিট নিয়ে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিল।

চা খেতে খেতে তপতী আবার কথা তুলল। 'তোমার বাবাকে আর ত বাড়িতে রাখা যায় না।'

তীর্থপতি কথাটা যেন ঠিক ধরতে পারল না। মাসির মুখের দিকে চাইল।

'চার পাঁচ মাস হল বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।' তপতী ঠোঁটে পেয়ালা ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে আবার হাতটা বুকের কাছে নামিয়ে নিল। একটু নীরব থেকে বলল, 'এখন এক-রকম বদ্ধ উন্মাদ।

মাসির মুখ দিনের আলোতেও কেমন সুদূর ঝাপসা লাগল তীর্থপতির, কয়েক মুহূর্তের মতন। তারপর ধীরে ধীরে আবার স্পষ্ট হল। তীর্থপতি তার নিজের চাঞ্চল্য এবার অনুভব করতে পারল। মাসিকেও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। বোধ হয় হতাশ ও ধৈর্যহীন।

'আমাদের ওখানে আর কিছু হবে না,' তপতী বলছিল, 'ডাক্তার মজুমদার আজকাল দেখছিলেন দায়ে অদায়ে, তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন কোনো পাগলা হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

তীর্থপতি কোনো কথা বলল না। মাসির দিকে চেয়ে দেখল না। ক্রমশই কেমন বিতৃষ্ণা ও বিরক্তিতে মন ভরে উঠছিল; বাবার ওপর, মাসির ওপর। যেন সমস্তটার জন্যে ওরাই দায়ী।

'কলকাতায় এলাম—একটা ব্যবস্থা-ট্যবস্থা যদি করা যায়,' মাসি বলছিল, 'মজুমদারসাহেব একটা চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর এক বন্ধু আছে এখানে—ও-সবেরই ডাক্তার। এখানে কোথায় যেন আছে একটা হাসপাতাল....'

'জানি না।' তীর্থপতি মাসির প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এমন সুরে বলল।

'আছে—এই কাছাকাছিই কোথায় যেন। তবে সেটা ভাল না। উনি—ডাক্তার ধর—মজুমদার সাহেবের বন্ধু—

তিনি রাঁচির কথা বলছিলেন—রাঁচিতে জানাশোনা আছে তাঁর।' মাসি একটু থামল, চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল পায়ের গোড়ায়। 'খরচাপাতি কি রকম লাগতে পারে সেটা জানতে পারলে…'

তীর্থপতি একদৃষ্টে জানলার দিকে তাকিয়ে। বছর দেড়েক আগেকার পুরনো ফ্যাকাশে একটা ভাঙা-চোরা ছবি দেখছিল। ছবিটা দেখলে তীর্থপতির দুঃখই হয়। কিন্তু উপায় কি। বাবার কথা মনে পড়লে ওই ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যদি আপত্তি বা অগ্রাহ্য করলে ছবিটা বাতিল করা যেত, তীর্থপতি আপত্তি করত। বিশ্বাস করা মুশকিল, ওই মানুষটি তার বাবা—সেই মল্লিকসাহেব। অতীতের সঙ্গে এই মানুষটির মিল কোথায়? সেই বিশাল চেহারা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব, কাঠিন্য, না কিছুই নেই আর। ছাঁচটুকু আছে শরীরের, নয়ত এ-মানুষ অন্য কেউ। অসুস্থ, দুর্বল, কেমন অস্বাভাবিক। ময়লা পাজামা পরনে, বাড়িতে কাচা একটা শার্ট গায়ে, পায়ে রবারের চটি। মুখে না-কামানো দাড়ি, দাঁতগুলো হলুদ। চোখের মণি দুটো এখনও তীব্র, অথচ চোখের সাদা অংশটা কেমন রাতজাগার ক্লান্তি এবং ঘোরে জড়ানো। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দৃষ্টি ওটা নয়।

তীর্থপতি ছবিটার শেষটুকুও দেখতে পেল। বাবা ঘরের দরজায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোরের মতন। যেন ঘরের মধ্যে কেউ আছে, বাইরে থেকে বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে তার কথা শুনছে। বাবার সমস্ত চেহারায় ভঙ্গিতে এই আড়িপাতার ভাবটাই ফুটে উঠেছে।……তীর্থপতি কাছে যেতেই বাবা

চমকে উঠে মুখে আঙুল দিয়ে সাবধান করে দিল : চুপ্…
কথা বলো না।…তীর্থপতি অবাক। কি একটা কথা বলতেই
চটে উঠল বাবা। যেন বাবা কাদের হাতে নাতে ধরে ফেলতে
যাচ্ছিল, তীর্থপতির গলার স্বরে তারা পালিয়ে গেছে।…অথচ
বাস্তবিক ঘরটা শূন্যই ছিল, একেবারে শূন্য।

'তোমার কি মনে হয়?' তপতী শুধলো।

মাসির কথায় চমকে উঠল তীর্থপতি। জানলার সামনে
থেকে ছবিটা মিলিয়ে গেল।

'আমায় কিছু বললে?' তীর্থপতি মাসির দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, বললাম যে— ; শোনো নি! কি ভাবছিলে?'

'কিছু না, এই এমনি ‥', তীর্থপতি জল হয়ে যাওয়া চায়ের
পেয়ালা নামিয়ে রেখে দিল। হঠাৎ কে জানে কেন মাসির
ওপর তার ভীষণ আক্রোশ জাগছিল। ইতর রকমের ঘৃণাও।
সচেতনভাবে তীর্থপতি সেটা বুঝছিল। মাসিকে আঘাত
করার জন্যে তার মধ্যে একটা উত্তেজনাও জেগে উঠেছে।

'তোমার বাবার কথা বলছিলাম, তাঁকে এবার রাঁচিতে
রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।' তপতী কপালে হাত দিয়ে
ওপর দিকে টানল একটু, সিঁদুরের দু'পাশে এলোমেলো ক'টি
চুলের গুচ্ছকে কপাল থেকে তুলে দিতে চাইল।

রাঁচিতে! তীর্থপতি বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছিল।
উত্তেজনা। কেমন এক কাঠিন্যের অনুভব মুখে; জ্বালা, তাপ।
হাতের আঙুলগুলোও কাঁপছে।……হঠাৎ একটু কুঁজো
হয়ে উঠে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট
আর দেশলাই টেনে নিল। হ্যাঁ, মাসির মুখের সামনে
বসেই সিগারেট খাবে। এখন সে আর তিতু নেই।

তীর্থপতি এই সিগারেট খাওয়াকেই প্রথম আঘাত বলে মনে করল।

সিগারেট ধরাল তীর্থপতি। ধোঁয়া যেন বেশি করেই ছুঁড়ল। অনেকখানি ধোঁয়ার জন্য গলা জ্বালা করে উঠল। কাশি এল।

তপতীর হাবভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। গলার স্বরেও। 'রাঁচি ছাড়া আর কোথায় বা তুমি দিতে পার?'

তীর্থপতি বোধ হয় অন্য কিছু আশা করেছিল। মাসি তার ধারে কাছেও ঘেঁষল না দেখে আরও বিরূপ হয়ে পড়ল। প্রতিবাদের একটা দমকা ঝোঁক চেপে গেল। 'রাঁচিতে পাঠিয়ে কি হবে?' তীর্থপতি বলল; যতটা শক্তভাবে বলতে চাইল ততটা শক্ত শোনাল না গলা। বরং হতাশ বেসুরোই শোনাল।

তপতী একটু অবাক হল হয়ত। বলল, 'কি হবে কি করে বলব, ট্রিটমেণ্ট হবে।'

তীর্থপতি চুপ করে গেল। ঠিক কোন্ কথা বলা যায় ভেবে পেল না। সিগারেটটাও বিস্বাদ লাগছিল। ফেলে দিল ছুঁড়ে। মাথার কোথাও, নাকের কোন অন্তর-সন্ধিতে জ্বালা করছে। মাসির দিকে আর চাইল না।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর তপতী বলল, 'আমার ত মনে হয় আর দেরি না করে রাঁচিতে পাঠানোই ভাল। তুমি কি বলো?'

কি বলবে তীর্থপতি! কেনই বা সে বলবে! কি তার আসে যায়! বাস্তবিক তার বলার অপেক্ষায় কিছু নেইও। মাসি তাকে কিছু না জানিয়েও বাবাকে পাগলা গারদে ঢুকোতে পারত। এই মতামত জানতে চাওয়ার কোনো অর্থ

হয় না। তবু মাসি যে জানতে চাইছে, সেটা আর কিছু নয় —তীর্থপতিকে কোনো দায়িত্বের পাকে বেঁধে ফেলা। তীর্থপতি অনায়াসেই বুঝতে পারল, মাসির আসল উদ্দেশ্য টাকা। বাবাকে বাঁচিতে রাখার খরচটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। বিরূপ মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। মাসিদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রটা শুধু টাকার ওপর বেঁচে আছে। শুধু টাকার ওপর। তীর্থপতি মনে মনে ভাবছিল, বাস্তবিক মাসান্তে একবার মনিঅর্ডারের ফর্ম ভরতি করা ছাড়া তার সঙ্গে তাদের পরিবারের আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ব্যাপারটা সরল। তীর্থপতি বরং এই সরল নিয়মিত অভ্যাসটি পালন করে খুশীই হয়েছে। ওদের ভাল মন্দ সুখ দুঃখ দায় দায়িত্ব কোনো কিছুর সঙ্গেই তার যেন যোগ নেই, ভাবনাও না। তাদের সংসার এবং সে দুটি স্বতন্ত্র পৃথক অস্তিত্ব। ফলে তীর্থপতি অনুভব করত, তার পিছনে বা পাশে কোথাও কোনো বন্ধন নেই। ওই তিনের সে একজন নয়, সে আলাদা। কিন্তু এখন, মাসির কথায় কেন যেন খুশী হতে পারছিল না। নেহাত টাকার জন্যে মাসি এসেছে— এই চিন্তা তাকে কেমন বিরক্ত অপ্রসন্ন করছিল।

'তুমি বরং এর মধ্যে একবার বাড়িতে চল।' তপতী বলল, কি ভেবে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর।

'এখন—?…এখন আর সময় কোথায়।' তীর্থপতি মাথা নাড়ল।

'কত সময় তোমার দরকার—যাবে ত আসানসোল—দু তিন ঘণ্টার রাস্তা—শনিবার বিকেলেও চলে যেতে পার, সোমবার সকালের গাড়িতে ফিরে অফিস যাবে।'

তীর্থপতি মাসির কথায় বিশেষ মন দিল না। বলল, 'না ; এখন হবে না—পরে এক সময় যাব।'

'আর তুমি গিয়েছ!' মাসি অবিশ্বাসের হতাশার হাসি হাসল একটু, 'সেই কবে দেড় দু' বছর আগে একবার গিয়েছিলে। তাও....' মাসি কথাটা শেষ করল না, থেমে গেল। একটু পরে, নিশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'আমি সব বুঝি তিতু, স-ব।'

তীর্থপতি অনেকটা যেন চমকে উঠে মাসির দিকে চাইল। মাসির পিঠ কখন আপনা থেকেই শ্লথভঙ্গি হয়ে গেছে। একটু কুঁজো হয়ে বসেছে। মুখটা বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ। মাসিকে অত্যন্ত অবসন্ন হতাশ দেখাচ্ছিল। তীর্থপতি আরও দেখল, মাসির শাড়ির যে-আঁচলটুকু কোল থেকে সরিয়ে রেখেছিল, তার ভাঁজে আঙুলের ডগার মতন একটি ফুটো। শাড়িটার রঙ এখন যেন ফ্যাকাশেই দেখাচ্ছিল।

একটু চুপচাপ। মাসি অন্যমনস্ক ভাবে আলনার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক্ ...ও-সব কথা তুলে লাভ নেই। আমার কথা তুমি শুনবে আমি তা ভাবি না। কিন্তু এটা অন্য কথা—তোমার বাবার। ....আমিও আর পারছি না, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ নিয়ে ঘর করা যায় না। সে যে কী যন্ত্রণা....!'

তীর্থপতি মনে মনে আবার অস্বস্তি এবং বিমূঢ় বোধ করছিল। একবার মনে হল বলে, ওই মানুষ যখন মল্লিক-সাহেব ছিল তখন ত তুমি একাই তাকে নিয়ে ঘর করেছ! তখন যন্ত্রণা কে পেয়েছে!...কথাটা অবশ্য বলতে পারল না তীর্থপতি। বরং ভাবল, অন্য একটা কথা তার বলা দরকার।

নয়ত কোন্ কথা কোন্ দিকে গড়িয়ে যাবে কে জানে। মাসির মনের গতি বদলাবার জন্যেই যেন অচমকা বলল ও, 'তুমি চলে এলে, এখন কে দেখছে বাবাকে ?'

'কে আর, চাকরে।....দেখার আছেই বা কি। দু-টো খাবার ঘরে পৌঁছে দেওয়া। তারপর বাকি যা তা ত খেয়াল মতনই করবে নিজে। খাবে কিংবা খাবে না। চিৎকার করবে, গালাগাল দেবে—আমাকে তোমার মাকে—তোমাকে। ছাড়া পেলে মারধোরও করে। আজকাল তাই ঘরের বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখতে হয়।'

তালা দিয়ে রাখতে হয়! মারধোর করে! তীর্থপতি কেমন এক যন্ত্রণা বোধ করল কথাটা ভাবতেই। মাসির দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকল অল্প একটু, যেন সেই মুখের ভাব থেকে আরও কিছু জানবার চেষ্টা করছে।

'তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা হলে আমি বাঁচি।' মাসি বলল।

আমি বাঁচি! তীর্থপতির কানে কথাটা অত্যন্ত কুৎসিত শোনাল। এর চেয়ে নির্দয় উক্তি যেন হতে পারে না। মাসি বাবাকে পাগলগারদে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট হতে চাইছে। মাসির ওপর মনটা আবার তিক্ত হয়ে উঠল।

'তুমি ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এড়াতে চাও ?' তীর্থপতি হঠাৎ অত্যন্ত রুক্ষ গলায় শুধলো।

তপতী তাকাল। তীর্থপতির মুখের ভাব, কথা, গলার স্বর কেমন অচেনার মতন লাগল। অবাক হল তপতী। কি যেন ভাবল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'তুমি কথাটা ঘুরিয়ে ধরেছ। আমি ও-ভাবে কিছু বলি

নি।··তাছাড়া আমার দিকটাও আমি ভাবব। তোমার বাবা···'

'আমারই বাবা শুধু?' তীর্থপতি ধৈর্য হারিয়ে কথার মধ্যে তীব্রভাবে বাধা দিল অত্যন্ত হিংস্র এক প্রশ্ন জুড়ে।

'না, আমারও স্বামী।' তপতীর ম্লান ক্ষুব্ধ গলা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু স্বামী বলেই বদ্ধ পাগলকে ঘরে পুষে রাখতে হবে! ভোগ ত তোমায় ভুগতে হয় না, আমায় ভুগতে হয়। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি সে যন্ত্রণা কী! তোমার কাছে গা খুলে মারের সে-চিহ্ন নাই বা দেখালাম।'

তীর্থপতি মাসির দিকে আর তাকাতে পারল না। কিন্তু অনুভব করতে পারল বাবার নির্দয়তা তাকেই বেদনা এবং লজ্জা দিচ্ছে।

'গেঁয়ো ভূতদের মতন আমার ও-সব বাজে স্বামীভক্তি নেই। ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে পুরে রাখলে পাগল আরও পাগলই হবে।···হাসপাতালে দিলে···'

'ভালো হবেই এমন কোনো কথা নেই।' তীর্থপতি আবার বাধা দিল কথার মধ্যে। কিন্তু গলার স্বরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে।

'তাও হতে পারে; তবু চেষ্টা করতে দোষ কি!'

চুপ করে গেল তীর্থপতি। মনের চারধার ক্রমশই যেন খালি খালি মনে হতে লাগল। শূন্য। বিরাগ, বিতৃষ্ণা, তিক্ততা, উত্তেজনা—সব আস্তে আস্তে একে একে পিছু হঠে পালিয়ে যাচ্ছে। তীর্থপতি মাথা নিচু করে অনেকটা সময় বসে থাকল। তারপর, ঘাড় উঠিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'তুমি যা ভালো বোঝো করো।'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না তপতী। সামান্য পরে বলল, 'বরাবর আমি যা ভালো বুঝব করব তা হয় না, তিতু। তোমার বাবার ভালমন্দ বোঝার দায়িত্ব তোমারও আছে। তুমি তার ছেলে।'

ছেলে! মাসি আজ পিতাপুত্রের সম্পর্ক মনে করিয়ে দিতে এসেছে নাকি! শ্লেষ বা বিদ্রূপ উঁকি দিয়েও দিল না।.... তীর্থপতি বুঝতে পারছিল, সে হেরে গেছে। মাসির কাছে, সংসারের কাছে, ও সম্পর্কের কাছে। তিতু যদি না জন্মাত তার বাবা থাকত না, মা মরত না, মাসির শাসন আর ঘৃণায় কুকুর-ছানার মতন বেঁচে উঠতে হত না। কিন্তু যে-মুহূর্তে জন্মেছে সে-মুহূর্ত থেকেই কোনো জটিল সূত্রে ওদের সঙ্গে তার এক ক্লান্তিকর দুঃসহ বন্ধন। অত্যন্ত শক্ত। চাও না-চাও, তুমি এই জালে জড়িয়ে পড়েছ। ফাঁক থেকে পালাবার উপায় নেই। না, নেই। তীর্থপতি সোয়া শ' মাইল দূরে পালিয়েছে ঠিক, দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে—তাও ঠিক; কিন্তু এই দূরে সরে থাকা, চোখে না পড়া—এর আসল মূল্য কতটুকু! কিছু না। দূরত্ব এবং অদর্শন তার বদ্ধ উন্মাদ বাবা আর ওর মধ্যে সম্পর্কটাকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে নি। হয়ত মৃত্যুই শুধু এ-সম্পর্ককে মুছে দিতে পারে! কিংবা তাও বুঝি পারে না।

তীর্থপতি বুকের মধ্যে ভার অনুভব করছিল। অনেক বাতাস যেন জমে গেছে, অনেক। এই ভার বড় কষ্টের। কেমন অবোধ্য এক বেদনার। অনুভব করা যায়। যত অনুভব করা যায় ততই ঘন হয়, গভীরতর হয়ে ওঠে।

'আমি আর কি করব নতুন করে, তুমি একটা ব্যবস্থা

ত করেই ফেলেছ'—তীর্থপতি মাসির দিকে খানিক তাকিয়ে খানিক না-তাকিয়ে বলল, 'বাঁচিই ভাল। খরচা যা লাগে আমি কিছুটা দেব।'

'কিছুটা—!' তপতী সামান্য নড়ল, পা সোজা করল, হাতের চুড়ি আঙুলের ডগায় আস্তে আস্তে ঠেলে মণিবন্ধের দিকে নামাতে লাগল। চুড়িটা হাত গলে বেরিয়ে আসতে পারে। 'আমি বরং অন্য একটা কথা বলি ভেবে দেখো। তোমার বাবার খরচটা পুরোই তুমি দাও। খুব বেশি হলে অবশ্য আলাদা কথা।·····তোমার বাবা হাসপাতাল চলে গেলে, আমি ভাবছি, আমাদের বাড়ির ও-দিকটা ভাড়া দিয়ে দেব। ভাড়ার টাকায় আমার চলে যাবে। তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না আলাদা করে।'

তীর্থপতি নতুন করে অবাক হল আবার। মাসির মুখের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

'বাড়ি ভাড়া দেবে?' তীর্থপতি বাড়ি শব্দটা কেমন করে যেন উচ্চারণ করল।

'উপায় কি! বাঁচতে হবে ত।' মাসি শুকনো হাসি হাসল।

তীর্থপতি বুঝতে পারল না, মাসি কি পাগলের মতন কথা বলছে। অবশ্য তাদের ইঁট কাঠের বাড়িটাও এমনিতে ছোট। বাবার মাথার গোলমাল শুরু হবার পর পরই কোম্পানী থেকে এক রকম আগেভাগেই জোর জবরদস্তি করে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছিল। সেই টাকায় বাড়ি। কোম্পানীর এলাকার বাইরে—জি. টি রোডের কাছাকাছি। বাড়ি করার মধ্যে মাসিরই হাত ছিল বেশি। এমন কিছু

প্রচুর অর্থ কোম্পানী বাবাকে দেয় নি যে বিরাট একটা বাড়ি ফাঁদা যায়। তীর্থপতি তখনও কলেজে। খুব হিসেব করে মাসি বাড়িটা করে ফেলেছিল। সময় মতন। নয়ত টাকা থাকত না। বাবা টাকা রাখতে পারত না।······তীর্থপতি কিছুই ঠিক জানে না, বাবা কত টাকা পেয়েছিল, কত টাকা খরচ হয়েছে বাড়ির পিছনে, ব্যাংকেই বা কত টাকা ছিল। এ-সব বিষয়ে খোঁজ নেবার কিছুমাত্র আগ্রহ তার ছিল না, নেয় নি কোনদিনই। চোখের ওপর যা দেখেছিল সেইটুকুই তার জানা—বাবার গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, রেফরিজারেটার, কিছু কিছু ফার্নিচার; একে একে। প্রথমটায় বাবা এবং মাসি মল্লিকসাহেবের বাড়ির আদব কায়দা বজায় রেখেছিল, যতদিন পেরেছে; তারপর ক্রমশই এক এক করে সব হাত ছাড়া হতে লাগল। ইদানীং বছর দেড় দুই ধরে খুবই দুরবস্থা যাচ্ছিল। তীর্থপতিকে টাকা পাঠাতে হচ্ছিল বাড়িতে।

কিন্তু তীর্থপতি ঠিক সে-বাড়ির কথা বলে নি। চোখে দেখা বাড়ি ছাড়াও একটা বাড়ি আছে না! সেটা কি····সেটা ···এলোমেলো ভাবে চিন্তাটা এসেছিল, ভাসা মেঘের মতন অল্পের জন্যে ছায়া ফেলে, তীর্থপতি কি যেন ধরব ধরব করছে, আবার ভেসে গেল।

'ভাড়াটে পাবে কি তুমি?' তীর্থপতি নীরবতা ভেঙে সাধারণ গলায় এবার শুধলো।

'পাব।' মাসি নিশ্চিন্তভাবে মাথা হেলিয়ে সায় দিল, 'আমাদের আশেপাশে এখন কত বাড়ি উঠেছে, সবাই ভাড়া দেয়।······কমলবাবুকে মনে আছে তোমার···অটোমোবাইল

স্টোর্সের···ওই যে মোড়ের দোকানটা···ভদ্রলোক একা মানুষ······সেদিনও বাড়ির কথা বলছিলেন, ওঁকেই দিয়ে দেব। ঝঞ্ঝাট থাকবে না।'

তীর্থপতির মনে হল, মাসি কি করবে তার একটা ছক আগে থেকেই পুরোপুরি ঠিক করে রেখেছে। বাবাকে রাঁচিতে পাঠাবেই, বাড়ি কমলবাবুকে ভাড়া দেবে, আর···আর কি ··? আর যে কি তীর্থপতি জানে না।

কেমন করে যেন নিঃসন্দেহ হল তীর্থপতি, মাসি যা করব বলে স্থির করেছে তা উলটে দেবার ক্ষমতা তার নেই। আগে মনে হয়েছিল, টাকা একটা বাধা, তীর্থপতি টাকা দেবে না বললে মাসিকে থামতে হবে, বাবাকে রাঁচি পাঠানো চলবে না। এখন বুঝতে পারল, তার মতামতের মূল্য আর টাকার মূল্য মাসির কাছে সমান। বাবাকে বাড়ি থেকে সরাতে সে অরাজী হলেও মাসি বাবাকে সরাবে, টাকা দিতে পারব না জানালেও মাসি বাবাকে রাঁচিতে পাঠাবে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, হয়ত বাড়ি বিক্রি করেই।

খুবই অবাক হচ্ছিল তীর্থপতি, সব ঠিকঠাক করেও মাসি কেন তার মতামত জানতে এসেছে। কেন ?···কেন ? তীর্থপতি এই কেন-র কোনো জবাব পাচ্ছিল না।

আরেকটু পরে মাসি উঠল, উঠে দাঁড়াল। শাড়িটা ঠিক করল, ঘাড়ের ওপর থেকে খোঁপাটা তুলল, মাথার কাপড় টেনে নিল সামান্য।

তীর্থপতির ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছিল। মনের কোথায় যে এক অদ্ভুত বোধ কেবলই পাক খাচ্ছে। ছোট্ট ঘূর্ণি ; সে-ঘূর্ণি উড়ে যাচ্ছে না, অগ্নিশিখার মতন তার শিখাটা ক্রমশই চূড়ার

মতন ওপরেই উঠছে। উঠতে উঠতে সরু হচ্ছে, সরু থেকে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর।

ভয়, সেই ভয়....যে-ভয় তিতু পেত, যে-ভয় তার জীবনের সঙ্গে কি ভাবে যেন জড়িয়ে গেছে। কিছু একটা সাংঘাতিক সর্বনাশ হতে যাচ্ছে দেখলে যে-ভয় তাকে গলা টিপে, বুক দুমড়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে মারতে চায়।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তীর্থপতির। মুখ সাদা, ফ্যাকাশে, রক্তহীন। ঠোঁট শুকনো। চোখের দৃষ্টি অপলক, প্রায় মৃত মানুষের মতন।

মাসি যেন দেখতে পেয়ে থমকে গেল। চঞ্চল হল। ক' মুহূর্তের বিমূঢ়তা; মাসি কাছে এসে গায়ে হাত দিল। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, 'তিতু—এই তিতু—!'

তীর্থপতি নিরুত্তর। আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিল, প্রশ্বাস ফেলল। আবার। হৃদপিণ্ড যে কাঁপছে অনুভব করতে পারল। কপালের কাছে শিরাটাও বার কয়েক দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল। জিবের আগায় একটু স্বাদ। মাসিকে দেখল। সামনে গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একটা হাত মাসির তখনও ওর কাঁধের ওপর।

'কি হয়েছিল হঠাৎ, তুমি অমন করলে?' মাসি অবাক স্বরে শুধলো, 'তোমার অসুখ টসুখ করেছে নাকি কিছু?'

অসুখ! জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল তীর্থপতি। অশ্বত্থের পলকা ডালপালায় একটা পাখি এসে বসেছে। নড়ছিল আগাটা।

'যে-ভাবে থাকো তুমি—' মাসি হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'এতে অসুখ বিসুখ করা আশ্চর্য নয়।'

সামান্য একটু অপেক্ষা করে তীর্থপতি উঠে দাঁড়াল। মাসির দিকে চাইল না। অন্য দিকে চেয়ে জড়ানো মৃদু গলায় বলল, 'বাবাকে তুমি রাঁচিতেই পাঠিয়ে দাও মাসি। যা খরচ লাগে···কত আর লাগবে···আমি যোগাড় করে দেবোখন।'

তপতীর সঙ্গে সঙ্গে তীর্থপতিও আসছিল। তপতী বলল, 'তোমার অফিস নেই?'

'আছে, যাবো পরে। চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'থাক, নাই বা গেলে। শরীরটাও ত খারাপ লাগছিল একটু আগে—'

'ও কিছু না; চলো—'

ছাদের রোদ যেন দু-জনার চোখেই বিঁধল। কেউ কোনো কথা বলল না।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তপতী অচমকা বলল, 'তুমি একবার সময় করে বাড়িতে যেও। কতদিন ত যাও নি।'

'বাড়ি!' তীর্থপতি অন্যমনস্কভাবেই পুনরাবৃত্তি করল। পরে খেয়াল হল, নিজের গলার স্বরেই বোধ হয়।

'যাবে না নাকি আর?' তীর্থপতির গলার স্বরে কেমন যেন সন্দেহ হল তপতীর।

হাঁটতে লাগল তীর্থপতি। জবাব দিল না।

কি ভেবে মাসিই আবার কথা বলল। 'আমি সব বুঝতে পারি তিতু। কেন তুমি যাও না, জানি।······কিন্তু বাড়িটা তোমারই।····তোমার বাবাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে একলা একলা কত দিন আর থাকব। আমিও ত মানুষ!'

মাসির কথা, বলার ভঙ্গি, গলার স্বর—সব যেন কেমন অদ্ভুত শোনাল। যেন মাসি চিরটা কাল একলা একলাই কাটিয়েছে। চিরটা কাল। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে, মিসেস মল্লিক হবার পর, স্বামী পাগল হয়ে গেলে, এবং স্বামীকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছে যখন—তখনও। ভবিষ্যতেও থাকবে।

মাসি যে এক দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তাই যেন মনে হয়। কিন্তু, তীর্থপতি বুঝতে পারল না, বিশ্বাস করতেও পারল না, মাসির জীবনে কোনো নিঃসঙ্গতা ছিল, আছে, থাকবে।

রাস্তায় খালি ট্যাক্সি দেখে তীর্থপতি হাত দেখাল। মাসিকে তুলে দিল। মাসি মাথা নেড়ে না না করতে যাচ্ছিল। ভাড়ার কথা ভেবেই হয়ত। তীর্থপতির দুঃখই হল। সেই মাসি। গাড়িতে তুলে দিয়ে নীচু গলায় বলল, 'বকুলদের বাড়ির ঠিকানায় কাল কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব তোমায়।'

ট্যাক্সি ছাড়ার আগে মাসির মুখ আর-এক পলক দেখল তীর্থপতি। বাস্তবিকই মাসিকে অবসন্ন দুর্বল নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল।

ফিরতি পথে তীর্থপতির কেন যেন বার [illegible] মনে হচ্ছিল, মাসি একলাই ছিল—একলাই থাকবে, বাবাও একলা ছিল—একলাই থাকবে; আর সে নিজেও একলা....একলা...একা...। তাদের সংসারে সবাই নিঃসঙ্গ ছিল, সবাই। নিঃসঙ্গই থেকে যাবে।

পনের.

অকালে বর্ষা নেমেছে। আজ দু' তিন দিনই এই রকম। আকাশ মেঘলা, রোদে রঙ ধরে না, ময়লা ফ্যাকাশে আলো, ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। অগ্রহায়ণের বুঝি শেষ। শীতের আমেজ লাগা বিষণ্ন, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির দিনে, যখন শেষ বিকেল আর সন্ধ্যার অন্ধকার জট পাকাচ্ছে, বাতিগুলো সবে জ্বলে উঠেছে রাস্তায়—তীর্থপতি রমেশ মিত্র রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়াল। ইলশেগুঁড়ির মতন জলের বিন্দু ঝরছে। রাস্তায় বাতির কাচের দিকে তাকিয়ে দেখল তীর্থপতি, ফুলের রেণুর মতন জলকণা বাতাসে উড়ে উড়ে এলোমেলো হয়ে ঝরে পড়ছে।

রাস্তায় খানিক অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকল তীর্থপতি। তারপর কেমন যেন নেশা-করা-মানুষের মতন কোনো অনুগত আকর্ষণে আবছা চেতনায় বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে ছোট রাস্তায় মোড় নিল।

একটা গলির ঠিক শুরুতে এসে তীর্থপতি দাঁড়াল। মনে মনে নামটা ভাবল, নম্বরটা মনে করল। এই গলি কি? নাম খুঁজল দেওয়ালে। দেখতে পেল না।

আরও এগিয়ে পানের দোকানে শুধিয়ে গলি খুঁজে পেল তীর্থপতি। বাড়িও। সদরে কড়া নেড়ে সেই ধাতব বিশ্রী শব্দে হঠাৎ যেন শরীরটা কেমন অদ্ভুত লাগল।

ততক্ষণে ভেতর থেকে সাড়া এসেছে। দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ। তীর্থপতি গলির মধ্যে ঘোলাটে অন্ধকারের

দিকে চাইল, উলটো মুখে গ্যাসের বাতিটা তার দিকে চেয়ে আছে। পাশের পাঁচিল থেকে একটা বেড়াল ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল গলিতে, তারপর সর সর করে পালিয়ে গেল ফিকে আলোটুকু পেরিয়ে। ঢোঁক গিলে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকল তীর্থপতি।

দরজার একটা পাট খুলে গলা বাড়াল বকুল। 'কে ?.... ওমা তুমি !'

তীর্থপতি চৌকাঠের এ-পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও। যেন এখনও সে ফিরে যাবার কথা ভাবছে। এবং শেষ মুহূর্তে যে-ঘটনা ঘটল সে-ঘটনার রহস্য তার কাছেই দুর্বোধ্য লাগছিল।

'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এসো—' বকুল খোলা দরজা থেকে সরে পথ দিল।

তীর্থপতি বোধ হয় এই প্রথম সচেতন ভাবে অনুভব করল, কোথায় কার কাছে সে এসেছে।

সদর ডিঙিয়ে তীর্থপতি ভেতরে এল। দরজা বন্ধ করে দিল বকুল। অল্প একটু খোলা জায়গা পেরিয়ে ঢাকা একফালি বারান্দা। বাতি জ্বলছে। বারান্দার একদিকে চিলতে মতন ঘর, হলুদ-রঙ আলো; বারান্দায় একটি বাচ্চা ছেলে মোড়ার ওপর বসে। বারান্দার ও-পাশটা অন্ধকার।

'বাব্বা, শেষ পর্যন্ত এলেই তা হলে! পথ ভুলে নাকি ?' বকুল কথা বলতে বলতে ঢাকা বারান্দায় উঠল।

পুরোপুরি স্বাভাবিক সহজ হতে পারে নি এখনও তীর্থপতি। কিছুটা অন্যমনস্ক, কেমন এক ঘোর ঘোর ভাব। অথচ মোটামুটি সবই চোখে পড়ছে, বকুলের কথাও শুনছে।

বারান্দায় মোড়ায় পা-ঝুলিয়ে-বসা বাচ্চাটা ততক্ষণ উঠে পড়েছে। বকুলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাপড় ধরে পায়ে পায়ে লেপটে যাচ্ছে। ওর মুঠো থেকে শাড়ি ছাড়াবার চেষ্টা করছিল বকুল এক হাতে, অন্য হাতে এলো আঁচল পিঠে গুছিয়ে রাখছিল। 'আ, কি পায়ে জড়াচ্ছিস···সর··· একটু সরে দাঁড়া। এমন অসভ্য ছেলে····!' বকুল ছেলেটার হাত ধরে টেনে তফাত করে দিল।

তীর্থপতি বারান্দায় উঠল। তার মনে হল, বকুলের ছেলের জন্যে কিছু একটা আনা উচিত ছিল। খেলনা-টেলনা কিংবা কিছু টফি লজেন্স। বিব্রত বোধ করল তীর্থপতি। বকুলের ছেলের কথা তার একবারও মনে পড়ে নি।

'এসো, এ-ঘরে এসো—' বকুল ডাক দিয়ে আগে আগে বারান্দার অন্ধকার দিকটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আরও অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে টুক করে বাতি জ্বালল।

বকুলদের বসা-শোওয়ার ঘর দেখা গেল। পায়ের জুতো খুলে তীর্থপতি ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'তারপর—হঠাৎ, আমাকে চমকে দিতে নাকি? না সত্যি সত্যি পথ ভুল করে?' বকুলের মুখে খুশীর দীপ্তি।

'এদিকেই এসেছিলাম একটা কাজে—মনে পড়ল···' তীর্থপতি বলল। লজ্জা বাঁচাতে।

'পথে মনে পড়ল! তা হলে সত্যি আর আমাদের কথা ভেবে আসা হয় নি।' বকুল টান দিয়ে কথাটা বললে। বিশেষ একটি অর্থ যেন থাকল। হাসিটুকু তবু উজ্জ্বল হয়ে মুখে লেগে আছে।

বোধ হয় আরও লজ্জা পেল তীর্থপতি। অস্বস্তি বোধ

করল। বকুলের ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেকে লঘু করবার চেষ্টা করল। 'নাম কি রেখেছ ছেলের ?'

'জিজ্ঞেস করো ওকে।' বকুল চোখ নামিয়ে সকৌতুকে ছেলেকে দেখতে লাগল। 'তোর নাম বলে দে।'

নাম বলার কোনো লক্ষণই দেখাল না ছেলে। মার পায়ে পায়ে আরও জড়িয়ে প্রায় ঝুলতে লাগল শাড়ি ধরে।

'এটা একটা বাঁদর!' বকুল ছেলেকে ঠিক ভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এমনিতে সারাদিন দাপট, অচেনা লোক দেখলেই একেবারে লতাগাছ। ভীষণ দুষ্টু।....কই, বলো—, নাম বলো···ছি ছি, বাড়ি গিয়ে কত নিন্দে করবে···'

'কে ?' ছেলের আধো-জড়ানো অস্ফুট প্রশ্ন।

'কে—? কে আবার—ওই মামা···' বকুল তীর্থপতির দিকে পলকের জন্যে আড়চোখে চাইল, 'এই মামা কে জানো, তোমার তিতু-মামা—' বকুল একটু থেমে এবার সরাসরি তাকাল তীর্থপতির দিকে, 'কি, তুমি তিতুমামা থাকবে না তীর্থপতি মামা হবে—বলে ফেল বাপু!'

'যা খুশি।' তীর্থপতি হাসি মুখ করল।

'তিতুটাই ভাল। ও বেচারীর তী-র্থ-প-তি উচ্চারণ হবে না—ওর মারই বলে জিবে জড়িয়ে যায়।' বকুল খিল খিল করে হেসে উঠল।

তীর্থপতি বকুলের হাসিটুকু শুনতে শুনতে ক্রমশই যেন সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

'তুমি যে তালগাছ হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলে, বসো।' বকুল বলল। 'ভিজেছ ত ? মাথা মুছে নাও'।

মাথা মোছার দরকার ছিল না। বসল তীর্থপতি। কাঠের

চেয়ারে। বকুল ছেলেকে তীর্থপতির দিকে ঠেলে দিল। 'এই বাঁদরটার সঙ্গে তুটো কথা বল। নাম না বললে ওকে ছাড়বে না ঘর থেকে। আমি আসছি।'

বকুল চলে গেল। ছেলেটি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল তীর্থপতির দিকে পিট পিট করে চেয়ে। তীর্থপতিও অল্প সময় চুপচাপ ছেলেটিকে দেখল। বকুলের মুখের আদল তার ছেলের মধ্যে নেই। এক যদি চোখের চঞ্চলতাটুকু ধরা যায়, তবে। নয়ত মার শ্যামল রঙটাই যা পেয়েছে। হয়ত ওর বাবার····। তীর্থপতির খেয়াল হল, বকুলকে তার স্বামীর কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় নি। কথাটা মনেও আসে নি। কিন্তু সে-ভদ্রলোক কোথায়? এখনও বাড়ি ফেরেন নি নাকি? সন্ধ্যে ত হয়ে গেছে।

'তোমার বাবা কোথায়?' তীর্থপতি বকুলের ছেলেকে শুধলো।

জবাব দেবার ইচ্ছে বা গরজ অন্য পক্ষের আছে বলে মনে হল না। মুখে আঙ্গুল দিয়ে দিব্যি সে দাঁড়িয়ে আছে।

'শোনো, এখানে এসো।' তীর্থপতি হাতের ইশারা করে কাছে ডাকল।

মাথা ঝাঁকিয়ে বকুলের ছেলে আপত্তি জানাল।

তীর্থপতি অসহায় বোধ করছিল। ছোট ছেলেকে কি বলে বশ করতে হয় সে জানে না। তোমার নাম কি, বাবা কোথায়, পড়তে জানো তুমি, আচ্ছা বলো ত বাঘ কেমন দেখতে···ইত্যাদি প্রায় বাঁধা কয়েকটা কথা বলে বেচারী দিশেহারা হয়ে চুপ করে গেল। আর কিছু মনে পড়ল না, বলতেও পারল না।····ছেলে-বশের আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরটাই

দেখতে লাগল তীর্থপতি। মাঝারি ধরনের ঘর। গুটি তিনেক জানলা। পাতলা একরঙা কাপড়ের পরদা। জোড়া খাট, সুন্দর করে বিছানা পাতা, বালিশে ঢাকা। ঘরের একপাশে আলনা, ওদিকে ছোট আলমারি, তীর্থপতির পাশেই কালো পালিশ তোলা ছোট টেবিল, টুকিটাকি ক'টা জিনিস সাজানো, খান দুই লাইব্রেরীর বই।

ঘরটি পরিচ্ছন্ন, নিবিড়তা মাখানো। বুঝতে পারা যায়, এ-ঘরে মানুষ থাকে, কথা বলে, হাসে, গল্প করে। এই ঘরের কোথায় যেন একটা প্রাণ আছে ; মমতা ও সুখ আছে।

তীর্থপতির ভাবনাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এক কথা ভাবতে অন্যটা আসে, এক ছবি দেখতে অন্য ছবি এসে দাঁড়ায়। সেই ছোট ফ্রক পরা বকু, সেই ধাঁধার খেলা, পাশা-পাশি ঘুমোনো। কে যেন একটার পর একটা ছবি অগোছাল ভাবে এলোপাথাড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, দ্রুত হাতে। বড় বকুকেও দেখতে পাচ্ছিল তীর্থপতি—দূরের স্মৃতিলোকে টুকরো টুকরো ছবির মতন থেকে গেছে। শাড়ি পরা বকু, লম্বা বিনুনি, কখনও বা সুন্দর খোঁপা—গলায় সরু মতন হার, হাতে বালা—বকুল কলেজে ঢুকেছে ম্যাট্রিক পাশ করে। তীর্থপতিকে দিয়ে নোটের ডিউপার্ট আনানো, রোম হিস্ট্রির বিদঘুটে পড়া বোঝা, এক বড়দিনে বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে জরদা-পান খেয়ে তীর্থপতির গায়ে বমি করে ভাসানো, নতুন মেট্রো সিনেমায় দু'জনে বসে মিকি রুনির ছবি দেখা, দু-জনে কত গল্প, ক্যারাম খেলা। না, সম্ভব নয় ; অত ছবি—প্রায় তিন চার বছরের ছবি চোখের পলকে মনে করা এবং পর পর দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বলা যায়, বোঝা যায়

—বকুলের সঙ্গে তার খুব মধুর এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কেউ কাউকে না দেখে গোটা একটা সপ্তাহ কাটিয়েছে বলে মনে হয় না। ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় তীর্থপতির বুক ফাঁকা হয়ে যেত, মন খারাপ ; বকুর মুখ ভার, চোখ সজল। বকু অযথাই চটে যেত, কথা বলত না।

ভাবতে ভাবতে তীর্থপতি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, হাসির শব্দে চমকে উঠল। বকুলের ছেলে খুব হাসছে। ছেলেমানুষের হি হি হাসি। হাসির কারণটা তীর্থপতি ধরতে পারল না।

বকুল ওই হাসির মধ্যেই ঘরে ঢুকল। এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে কাঁচের ডিশে কুচো-নিমকি ভাজা। বলল, 'আমার ছেলে রান্নাঘরে গিয়ে কি বলছে জানো? বলে, ওই মামাটা বাবুরাম। এমন বাঁদর ছেলে হয়েছে। বাবুরামটা যে কি তা আর নাই বা শুনলে। সেটা ছিল আফিংখোর; কাপড় নিতে এসে ঢুলত, মাথা ঠুকে যেত দেওয়ালে। তুমি কি ঢুলছিলে নাকি?'

তীর্থপতি অবাক। 'কই, না—!'

'তবে, চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিলে হয়ত কিছু।' বকুল খাবারের ডিশটা টেবিলে রাখল, চায়ের কাপ-ও, 'বৃষ্টি বৃষ্টি দেখে তোমার জন্যে ক'টা নিমকি ভেজে আনলাম, বেসম দিয়ে আলুও ভেজেছি।...মনে আছে, ও-বাড়িতে কি রকম তেলেভাজাটাই চলত আমাদের? নাও তাড়াতাড়ি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর রুচবে না।'

ডিশটার দিকে তাকাল তীর্থপতি। আগ্রহ বোধ করল না। 'অতগুনো! বরং অল্প কিছু—'

'রাখো রাখো—অত আবার কি! গরম গরম ভেজে আনলাম হাত পুড়িয়ে।'

'এখন আর এ-সব ঠিক সহ্য হয় না।' তীর্থপতি ম্লান একটু হেসে বলল।

'সবই হয়, পাওনা তাই।' বকুল অক্লেশে ধমক দিল, যেমন দিত আগে। 'ও-সব না খাও ত আমাকেই এখন মিষ্টির দোকানে যেতে হয়। বড় লোকের মুখ, সন্দেশ টন্দেশ আনিগে যাই।'

'তুমিও ত ভদ্রতা—আতিথ্য করছ?' তীর্থপতি ডিশটা তুলে নিল।

'করছি। আগে কে পথ দেখিয়েছে মশাই?' বকুল চায়ের কাপটা ঢাকা দিয়ে দিল।

বকুলের ছেলেকে তীর্থপতি হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল কিছু, বকুল বাধা দিল। 'সর্বনাশ, দিয়ো না ওকে, ও এখুনি একেবারে খেয়ে নেবে। খেলেই আর কথা নয়, বিছানা।'

'তোমার ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হল না।' তীর্থপতি বকুলের ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল।

'নাম বলে নি?'

'কোথায় আর বলল!'

'কি রে, নাম বলিস নি?' বকুল ছেলেকে শাসন করল।

'বলেছি।' ঘাড় হেলিয়ে দিল ছেলে।

'তীর্থপতি কৌতুক বোধ করল। 'বলেছ! মনে মনে নাকি!'

'ওর নাম বাচ্চু। ভাল নাম অশোক।' বকুল হেসে বলল, 'তুই-ই ওর বাপের দেওয়া।...ও নাম বলেছে ঠিকই—তুমি হয়ত অন্যমনস্ক ছিলে, শুনতে পাও নি।'

বকুলের দিকে চেয়ে থাকল তীর্থপতি। অন্যমনস্ক! এতই কি অন্যমনস্ক ছিল ও!

'গৃহকর্তাকে দেখছি না!' তীর্থপতি হাসি মুখে শুধলো।

'কেষ্টনগর গেছে; শাশুড়ির নাকি হাত ভেঙেছে এই বুড়ো বয়েসে। আর বলো না, আজ ক'মাস যা যাচ্ছে একটার পর একটা। শনিতে পেয়েছে আমাদের।' বকুল ভাগ্যের ওপর বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ।

সামান্য একটু চুপচাপ। বকুলই আবার কথা বলল, 'তুমি কিন্তু আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে।'

প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত। তীর্থপতির ক' মুহূর্ত বুঝি সময় লাগল বুঝতে। মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল, বলল, 'আরে না না, আজ নয়। পরে বরং....'

'থাক্, পরে আর তুমি এসেছ। আজই বা আপত্তি কেন?'

'আপত্তি, কই আপত্তি করছি না ত। আজই খাওয়ার কি আছে! মেসেও কিছু বলি নি।'

ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটের গোড়ায় দাঁত বসিয়ে বকুল তার সেই চেনা পুরনো ধমক্ দেবার ভঙ্গি করল। সরাসরি চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার মেসের পোলাও মাংস ত খাচ্ছ রোজই; গরীবের বাড়িতে দুটো রুটি তরকারিই খেয়ে যাও।'

তীর্থপতি অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে গেল। চায়ের কাপটা টেনে নিল অলস হাতে।

'তুমি চা খাও—। আমি এটাকে খাইয়ে আনি, এখুনি ঘুমের বায়না ধরবে।' ছেলের হাত ধরে বকুল চলে গেল।

চা খাওয়া শেষ হল তীর্থপতির, সিগারেট একটা শেষ

করে আর-একটা ধরাল। বাইরে মিহি একটানা বৃষ্টির শব্দ! হয়ত সামান্য জোরেই পড়ছে। রান্নাঘর থেকে বকুলের গলার স্বর ভেসে আসছে থেমে থেমে। কানে যায়, কথা বোঝা যায় না। কোথাও বুঝি রেডিয়োয় সেতার বাজছে। গলিতে পায়ের শব্দ। এই ঘর, বিছানা, আসবাবপত্র, বকুল, বাচ্চু—সবই কেমন মিলে মিশে ঘন একটি নক্‌শার মতন লাগছিল। তীর্থপতি স্বতন্ত্রভাবে এর কোনো একটিকেও অনুভব করতে পারছিল না। এরা প্রত্যেকটি এক সম্পূর্ণতাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। তীর্থপতির মনে হল, এই সম্পূর্ণতা বকুলদের সংসারের মধ্যেই রয়েছে—ওদের মিলিত সম্পর্কময় জীবনের মধ্যে। বিস্ময়ের কিছু আছে বইকি, তীর্থপতি মনে মনে নিজের বিস্ময়কে সমর্থন্ করে ভাবছিল, তিনটি প্রাণী এবং তাদের একই সঙ্গে বসবাসের মধ্যে দিয়ে কি করে একটি জীবনের নক্‌শা তৈরি হয়ে যায়! ওরা কোথায় বাঁচার সুখটুকু পায়? কেমন করে?

নিজের কাছে নিজের এই প্রশ্ন ওকে চিন্তিত বিস্মিত করছিল। কিছু একটা খুঁজে পাবার চেষ্টা যে করছে তীর্থপতি সে নিজেও বুঝছিল। কি আছে এই জীবনের মধ্যে, এই নেহাতই চলনসই গোছের সংসারের মধ্যে? বকুল, তার স্বামীপুত্র, একটি ছু'টি মাথা গোঁজা ঘর, পরিপাটি বিছানা, রান্নাঘর, চায়ের কাপ···এর কিছুই নতুন না। তীর্থপতি এককালে এ-রকম সংসার চোখে দেখে নি। পরে দেখেছে, বকুলদের বাড়িতেই। সেখানে এ ওর গায়ে জড়িয়ে, পায়ে পা ঠেকিয়ে, একজনের ধুতি শাড়ি অন্য জনে পরে ছু' বেলা ছুটি খেয়ে পরে বেঁচে থাকত। তীর্থপতি বাঁচার সে-দারিদ্র্য

দেখেছে। খারাপ লাগত, অস্বস্তি হত—কিন্তু কখনও মনে হয় নি সে-সংসারকে ও অপছন্দ বা ঘৃণা করেছে। অস্বচ্ছলতা নিশ্চয় তার চোখে লাগত, কিন্তু মনে গভীর ভাবে যা দাগ কাটত তা ওদের সংসারের আনন্দটুকু। পরস্পরের সঙ্গে ওরা মিলিত ছিল, যদি খুশীর বান আসত সবাই খুশী হত, যদি বেদনা আসত সবাই বেদনা ভোগ করত। আট দশ জনের একটি গোটা পরিবার এক রকম ছন্দেই চলত। কথায়, ভাবে, আচারে, আচরণে ওরা সবাই বোঝাত যে, সে একা নয়, যদিও তার নাম আলাদা, মন আলাদা তবু তার সঙ্গে তাদের সংসারের সবার মন মেশান।

বকুলদের বাড়ি তীর্থপতির ভাল লেগেছিল হয়ত এই কারণেই। ভিন্ন শাখা প্রশাখা হয়েও একটি গাছের মতন তারা নিজেদের একটি সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করেছিল। সেখান থেকে কিছু খণ্ড করে দেখার উপায় ছিল না। তীর্থপতির কৈশোর জানত, সবই বিচ্ছিন্ন সবই খণ্ড। বাবা আলাদা, মাসি অন্য, সে আর-একজন। খাবার টেবিলে তিনজনে মুখোমুখি হয়, খাওয়া শেষ হলে যে যার ঘরে, যে যার মত চলে যায়।

বকুলদের সংসারে স্নেহ ভালবাসা আদর সুখ আনন্দের পাশাপাশি রাগ অভিমান দুঃখ কষ্ট গ্লানিও সে দেখেছে। কিন্তু সমস্তটা একই, এ-পিঠ ও-পিঠ। যেন সুখ-দুঃখের মিলিত এক অখণ্ড দীর্ঘ ঋতু।

তীর্থপতি নিঃসন্দেহে অনুভব করল, আজ বকুলের সংসারেও সেই পরিবারেরই ছোট একটি ছবি ফুটে উঠেছে। সমস্তটাই অতীত থেকে নেওয়া—সেই ঐশ্বর্য থেকে নিজের ভাগটুকু পাওয়া।

তীর্থপতি তন্ময় হয়ে ভাবছিল, বকুলের এই ছোট ঘরে কোথায় কেমন করে সুখটুকু এল, কেমন করেই বা থেকে গেল!

এই প্রশ্নের বাস্তবিক কোনো জবাব পাচ্ছিল না সে, এমন কিছু ছিল না যা তাকে বুঝিয়ে দেয়—এখানে সুখ কোথায়! দেওয়ালে বকুলদের স্বামী-স্ত্রীর একটা ফটো বাঁধানো, দেখা যাচ্ছে না—আলনায় বকুলের শাড়ির পাশে তার স্বামীর বুঝি একটা ধুতি কোঁচান রয়েছে, ছেলেটার ছোট্ট ছোট্ট জামা, বিছানায় দু-জনের দুটি বড় বালিশ পাশাপাশি, বাচ্চুর জায়গা মাঝে....কিন্তু কি অদ্ভুত, কারও একার কোথাও কিছু নেই। নেই। তিন জনেই তারা অংশ নিয়েছে—আলনায় বিছানায় ঘরে, এবং মনেও।

সমস্ত ঘরটা ধীরে ধীরে তীর্থপতির চোখে একাকার হয়ে এল। টুকরো খণ্ড বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলো জড়াজড়ি করে নিঃশব্দ-জীবনের মতন ভাসতে লাগল। ঘরে ওরা কেউ নেই, তবু ওরাই আছে। শুধু ওরা তিনজন—বকুল বকুলের স্বামী বাচ্চু। আজ এখন যারা আছে, কাল সকালেও তারা থাকবে—এক মাস পরে কি এক বছর পরেও যদি ফিরে আসে তীর্থপতি এই ঘরের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে বকুলদের কথাই মনে করাবে। এই ঘর, ঘরের বস্তু, স্থূলতা ও জড় অনুষঙ্গ হারিয়ে জীবনের সান্নিধ্যে দ্রবীভূত, একাত্ম। ওরা যে জীবনের একটি রূপই তৈরি করে নিয়েছে। এখানে।

ছেলেকে খাইয়ে নিয়ে বকুল ফিরল। আলনা থেকে রাত্রে শোওয়ার মতন ইজের জামা আলাদা করে পেড়ে নিয়ে ছেলের জামা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'তোমার আচ্ছা শাস্তি

হচ্ছে, না! একা একা মুখ বুজে বসে আছ! অবশ্য ভূতের মতন মুখ বুজেই ত বসে থাক তুমি।' বাচ্চুর গায়ে জামা পরিয়ে দিয়ে পা ছুটি মুছিয়ে দিল বকুল। 'চলো···এবার ওই রান্নাঘরের সামনে মোড়ায় বসবে, আমি রান্না করতে করতে দিব্যি গল্প করতে পারব।' বিছানায় ওপর ছেলেকে তুলে দিল, 'বিছানা ধামসাবে না বাচ্চু, চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।'

বাচ্চু হামাগুড়ি মেরে নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে হল, এখন ঘুম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর ওপর তার খেয়াল নেই। 'এসো'—বকুল ডাক দিল তীর্থপতিকে।

বকুলকে এখন অন্য রকম লাগছিল তীর্থপতির। যে-মেয়ে তার মেসে গিয়েছিল সেই মেয়ে সবটাই নয়, কিছু অদল-বদল আছে। গার্হস্থ্য ভরাট একটি রূপ এর। ঘরোয়া করে শাড়ি পরা, মেটে-হলুদ-রঙ ছোট পাড়, গায়ে নীল বুটি দেওয়া সাদা সাধারণ ব্লাউজ, হাতে ক'গাছা চুড়ি, গলায় সরু হার। খোঁপাটি চারপাশ থেকে পরিষ্কার করে বেঁধেছে, ঘাড় দেখা যায়।

রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল বকুল, বেতের মোড়াটা দরজার কাছে এগিয়ে দিয়ে। তীর্থপতি বসল।

'তোমার জন্যে আমি কালিয়া মাংস রাঁধছি না তা বলে। ডিমের তরকারি আর লুচি।' বকুল উনুন থেকে কয়লা সরিয়ে কড়াইটা চাপাল। কি একটা বসিয়ে দিল।

'মন্দ কি, ভালই।' তীর্থপতি রান্নাঘরের বিচিত্র চেহারা দেখতে দেখতে জবাব দিল।

'ভাল না ছাই! এমন দিনে এলে যে, মানুষটা বাড়ি নেই। ও থাকলে আজ তোমায় তরিবৎ করে খাইয়ে

দিতুম।' নিজের মনেই হাসল বকুল, 'এত তাড়াহুড়োও করতে হত না। দেখছ না ছাই, দুটো কথা বলতেও পারছি না তোমার সঙ্গে।'

বাইরে ফাঁকা উঠোনের দিকে চোখ ফেরাল তীর্থপতি। বৃষ্টি নেই। জলো ঠাণ্ডা বাতাস, একটু শীতের ভাব, ঝাপসা মলিন আলো।

'মিনুপিসির কোনো চিঠি পেয়েছ?' বকুল জানতে চাইল।

'পেয়েছি।'

'কি হল পিসেমশাইয়ের?'

'রাঁচিতে।'

শেষ কথার পর দু'জনেই চুপ করে গেল। যেন তলায় তলায় পরস্পরে বিষয়টা নিয়ে বাকি কথা বলছে। সসপেন্ সরাবার মৃদু শব্দ, বকুলের চুড়ি বাজল, পিঁড়ি সরাবার ঘষা একটু আওয়াজ।

সেদ্ধ ডিমের খোসা ভেঙে ছাড়াতে ছাড়াতে বকুলই আবার কথা বলল, 'মানুষের ভাগ্যের কিছু বলা যায় না, না কি বলো?...আজ কে কি আছে, কাল কে কেমন থাকবে কিছু তুমি বলতে পারবে না। ভগবান যা লিখেছেন কপালে, শেষ পর্যন্ত তাই।' বকুল সখেদে বেদনার সঙ্গে বলছিল। দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলল।

তীর্থপতি মন দিয়ে শুনল সবই, কথা বলল না। ডিমের ভাঙা খোলার দিকে চেয়ে থাকল। বোধ হয় ভগবানের কথা ভাবছিল। ছেলেবেলা থেকেই জিনিসটা তাদের বাড়িতে কোথাও ছিল না। ফাঁকা। বাবা কোনোদিন ভগবানের কথা বলে নি, মাসিও না। মা...? মা কি বলত? তীর্থপতির মনে

নেই। ভগবান মার কপালে আত্মহত্যা লিখেছিল, বাবার কপালে রাঁচি, মাসির কপালে....? কিছুই দেখতে পেল না তীর্থপতি....মনে হল সেখানেও শূন্যতা। নিজের কপালের কথা ভাবল...কি আছে ?

'তুমি যা করেছ, খুব ভাল কাজই করেছ। হাজার হোক, ওনারাই ত তোমার বাবা-মা।' বকুল পুরনো প্রসঙ্গ টেনে বলল, 'এখন ভাগ্য, তোমায় কেউ দোষ দিতে পারবে না, কর্তব্য যা তা পালন করেছ। আমার এত ভাল লেগেছিল—'

প্রথমটায় তীর্থপতির কাছে কথাগুলো ঘোলাটে মনে হয়েছিল। পরে স্পষ্ট হল।

'দিদিমণিদের বাড়ি গিয়েছিলে নাকি ?' তীর্থপতি শুধলো।

'হ্যাঁ, প্রায় রোজই যাই। কাল গিয়েছিলাম।'

'কেমন আছে ?'

'এক রকমই।......তোমার কথা সবই বলেছি কিন্তু আগেই।' বকুল সামান্য হাসল, 'শুনে দিদিমণি কি বললে জানো ?'

'কি ?'

'বললে, ওটারও মাথা খারাপ হয়েছে।' বকুল ডিম আলু ছাড়িয়ে আলাদা করে রেখে এবার ছোট ডেকচিটা উনুনে চাপাল। উনুনের আভায় বকুলের মুখ যতটা স্পষ্ট ছিল, ততটা আর থাকল না। বরং থুতনির ওপর একটু ছায়া ছড়িয়ে গেল। 'দিদিমণি মিথ্যে বলে নি, আমারও কেন জানি তাই মনে হয়।' পরিহাসের গলায় বলতে চাইল বকুল, অথচ তরল সুরটা পুরো ফুটল না।

ডেকচিতে তেল মশলা এটা-সেটা ছড়াতে ছড়াতে বকুল কতক মৃদু বিচিত্র শব্দের মধ্যেই শুধলো, 'সত্যি, তুমি অমন ভাবে থাকো কেন ?'

'কেমন—?' তীর্থপতি অন্যমনস্ক গলায় বলল পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে।

'কেমন কি, জানো না নিজে! ভূতের মতন।....তোমায় সেদিন ওই ভাবে দেখার পর আমি প্রায়ই ভেবেছি।' বকুলের গলার স্বরে তার আন্তরিকতা এবং বেদনা ধরা পড়ছিল, 'তোমার ওই ত বয়েস—আমরই প্রায় সমবয়সী—অথচ এর মধ্যে যেন কোথায় চলে গেছ! কত বুড়োটে দেখায়! চেহারাও গেছে। কি ভাব তুমি কে জানে! এত ভাববারই বা কি আছে তোমার ?....হ্যাঁ, অভাব দুঃখ কষ্টের জীবন হ'ত তবুও না হয় বুঝতাম, দশটা দায়-দায়িত্ব ভাবনা-চিন্তা আছে—তাতেই পাগল হয়েছ। সে-সব কিছু না, শুনেছি চাকরি যা করো সেটা ভালই ; তবে ?' বকুল যখন কথা শেষ করল তখন ডেকচিতে আর একটুও শব্দ নেই। খুন্তিটা পর্যন্ত নামিয়ে রেখে দিল বকুল।

তীর্থপতি উঠোনের দিকেই চেয়ে আছে। সিগারেটের ধোঁয়া চোখের কাছে উড়ে আসছিল। হঠাৎ সব চুপ করে গেছে। বকুল চুপ, তীর্থপতি চুপ, রান্নাঘরের কোথাও একটু শব্দ নেই, বাইরে উঠোন গলি সব নীরব হয়ে গেছে।

বকুলেরই কেমন লাগল—অস্বস্তি, ঘোর, গুমোট, অস্বাভাবিক। ভাল লাগছিল না, তবু অনড় নির্বাক হয়ে বসে থাকল। উঠোনের ঝাপসা অন্ধকারে সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিল তীর্থপতি। মুখ ফেরাল। হাঁটুতে চিবুক

রেখে স্থির চোখে বসে আছে বকুল। তার দৃষ্টি চৌকাঠের ওপর। পিঠ এবং ঘাড়ের ওপর খানিক মিটমিটে আলো।

তীর্থপতি কি যেন একটা কথা বলবার চেষ্টা করল, বলতে পারল না। গলায় আটকে গেল। বার কয় কাশল, গলা পরিষ্কার করে খানিকটা বাতাস টেনে নিল বুকে।

বকুল সচেতন হয়ে উঠে এবার কথা বলল, চোখ তুলে; 'তোমার ওই রকম মনমরা ঘরকুণো হয়ে থাকার দরকারটা কি, কি লাভ,—শরীর মন খারাপই হয় তাতে।' কথা বলতে বলতে আবার অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে ও। একটু থেমে আবার বলল, 'এখন বড় হয়েছ, তোমার সুখ আনন্দকে কেউ আগলাচ্ছে না। নিজের মনের মতন করে থাকলেই পার।'

'মনের মতন—! ···সে-ভাবেই ত রয়েছি।' তীর্থপতির গলার স্বর মৃদু, খাপছাড়া।

'ওই নাকি মনের মতন!····ছাই! আমি সেভাবে বলিনি। আনন্দ মেলামেশা করে থাকার কথা বলছি।'

'সবাই কি একই ভাবে থাকতে পারে, বকুল!' তীর্থপতি বলল, 'সকলের সুখও একরকম নয়।'

'তোমায় বলেছে!' বকুল দাঁড়িয়ে উঠে রান্নাঘরের তাক থেকে ময়দার টিনটা পেড়ে নিল। পিঁড়িতে বসে ময়দা মাখতে বসল। 'তুমি ত মানুষই দেখ না, কি করে বুঝলে এ-সব কথা। আমরা অনেক দেখলাম। সবাইকেই দেখেছি, বিয়ে থা করে সুখেই আছে।'···এক মুহূর্ত থেমে যেন কথাটা ত্রুটিহীন করার জন্য যোগ করল, 'অবশ্য সুখ বলতে কি দু-হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচছে সব; না, তা নয়। তবু ওই এক রকম সুখেই আছে।'

'দেখছি তাই।' তীর্থপতি হঠাৎ বলল। হাসবার সামান্য চেষ্টাও করল।

বকুল ময়দা মাখতে মাখতে চোখ তুলে তাকাল, এক পলক; তীর্থপতির চোখের ভাষা ধরবার চেষ্টা করল, নামিয়ে নিল চোখ। একটু চুপচাপ। তারপর হালকা গলায় বললে, 'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'না, সত্যি না।'

ডেকচিটা নামিয়ে ফেলল বকুল। দেখল। খুন্তি নাড়ল। ঢাকা দিয়ে সরিয়ে রাখল। খানিকটা সময় কেটে গেল।

'পৃথিবীতে সবারই কত কি ইচ্ছে থাকে—যারা ভাবে, যা চাই তাই না পেলে নয়—তারা কষ্ট পায়। আমি এটা চাই ওটা চাই করে ঝোঁক ধরি নি। ধরলেও পেতাম না।' অনেকটা যেন আপন মনে বিড় বিড় করে বলল বকুল, মুখ নামিয়ে।

তীর্থপতির চোখের সামনে হলুদ ম্লান-আলোয় পিঠ-কুঁজো বকুল আস্তে আস্তে মুছে আসছিল। এই-বকুলের প্রায় অস্পষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে পুরনো এক বকুলকে তার চোখে পড়ছিল। সে-বকুল বলত, আচ্ছা তিতু আমি বড় কিছু আশা করতে পারি না, একেবারেই না, কেন বলতে পার?

কেন তীর্থপতি জানত না। আজ হয়ত জানতে পারছে। বকুল কষ্ট পেতে চায় না, ঠকতে চায় না, অল্পস্বল্প আশাই তার ভাল।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই আজ মনে হল তীর্থপতির, বকুল বড় বেশি সাবধানী। ওর কাছে কিছু একটা ছিল যা ইচ্ছে

করেই তীর্থপতিকে দেয় নি। হিসেব করে সরিয়ে রেখেছিল। বকুলকে এখন কৃপণের মত মনে হচ্ছিল তার। যেন তীর্থপতিকে ও ঠকিয়েছে।

কি ঠকিয়েছে তীর্থপতি ভাবছিল। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ঢাকা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। বৃষ্টি নেমেছে আবার। ঝির ঝির বৃষ্টি। উঠোনের ঝাপসা আলোয় জলের মিহি জালি এক-একসময় দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখা যায় না। তবু মনে হয়, শূন্য থেকে খানিক লালচে আভা-মেশান কালো রঙ ঝুলছে মাথার ওপর। বারান্দার এক কোণায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল তীর্থপতি। নিজেকে এখন ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, এত গভীর অতল নিঃসঙ্গতা আর কখনও সে অনুভব করে নি। যেন এই ক্লান্তিকর বৃষ্টি, মলিন অপরিচ্ছন্ন একটু আলো, আর সে—এই তিন ছাড়া আর কিছু নেই। সমস্তই শূন্য। জগতটা অন্য কোথাও সরে গেছে। তীর্থপতির জন্য তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সহসা কেমন করে যেন মনে হল, বকুলেরও কি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই? নেই কি? নেই যদি তবে বকুল কেন যায়, বকুল কেন ডাকে, কেন খুশী হয়, কেন বলে 'তুমি অমন করে থাক কেন?…'

তীর্থপতি প্রায় অচেতনভাবে অনুভব করছিল, বৃষ্টি ক্রমেই সরে যাচ্ছে, শূন্যের সেই গাঢ় থম্‌থমে রং তাকে ঘিরে ধরছে আস্তে আস্তে। কেউ কথা বলছে না, কোথাও শব্দ হচ্ছে না। সব তাকে ছেড়ে দূর থেকে দূরে পালিয়ে গেছে। ও একা, একাকিত্ব ছাড়া তার আর কিছুই নেই। কিন্তু সেই একাকিত্ব এখন অত্যন্ত কঠিন, নির্মম। হিংস্র পশুর মতন তীর্থপতির

অস্তিত্বকে মুঠোয় টিপে ধরেছে। যন্ত্রণা দিচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণা। দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চাইছে। তীর্থপতি অসহায় হয়ে হাত বাড়িয়ে কাউকে যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল।

হঠাৎ সেই ভয় এল, পুরনো ভয়। তীর্থপতি ক্ষীণতম চেতনায় অনুভব করল, বাইরে থেকে থম্‌থমে অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সামনে, তাকে ডুবিয়ে নিয়ে যাবে। একটি আলোর রেখা তড়িতে কেঁপে গেল, আকাশে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই, সব থম্‌থমে ভয়ংকর কঠিন হয়ে গেল। বাতাস বন্ধ। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে জীবনের শেষ—শেষ মুহূর্ত এসে গেল। বুক ফেটে যাচ্ছে, বাতাস লোহার মতন ভারী হয়ে ফুসফুসে চাপ দিয়ে ভাঙছে। দুঃসহ যন্ত্রণায় তীর্থপতি শেষবারের মতন নিশ্বাস টানার চেষ্টা করল।'

পলকে কোথায় কি যেন মিলিয়ে হঠাৎ আলো, মানুষ, একটু শব্দ…। তীর্থপতি বিমূঢ় বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নিশ্বাস নিচ্ছিল—আচমকা মনে হল, কে যেন তাকে বুকের কাছটায় ধাক্কা দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে দিল পিছনে।

বকুল। ও বকুল। তীর্থপতি বুঝল না, বকুল তাকে ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল কেন! বৃষ্টির ফোঁটা চশমার কাচে পড়ে সব ঘোলাটে অস্পষ্ট করে তুলল।

মুখে বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে খানিকটা সজ্ঞান হল তীর্থপতি। ফাঁকা উঠোনে সে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর গাঢ় কালো স্তব্ধ আকাশ।

বকুল প্রায় ছুটে গিয়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

কপাট বন্ধের কাঁপানো জোর শব্দটা যেন ভেঙে আছড়ে বুকে পড়ল তীর্থপতির।

আবার সব নিস্তব্ধ।

তীর্থপতির খেয়াল হল, বকুল কি যেন একটা কথা বলেছিল। খেয়াল হল, বকুলের চুড়ির দানাগুলো তার হাতে ফুটেছে। জ্বালা করছে।

অবশ পায়ে উঠোনটুকু পেরিয়ে সদরে দাঁড়াল তীর্থপতি। বিবর্ণ দু'টি কাঠের পাললা ধিক্কারের চোখে চেয়ে আছে।

হাত কাঁপছিল, পা থর্‌থর্ করছে, কাঁধের কাছটা অসাড়। পিঠের ওপর কিসের যেন ভারী বোঝা, চাপ চাপ ব্যথা কোমরে। কোনো রকমে টলে টলে বাইরে গলিতে এসে দাঁড়াল তীর্থপতি। উলটো দিকের গ্যাসের মিটমিটে বাতিটা তার আসা দেখেছিল, যাওয়াও দেখছে।

রাস্তা। তীর্থপতি অবশ পায়ে হাঁটছে। মাথার ওপর কালো কুটিল আকাশ, পায়ের তলায় আলো-চক্‌চকে ভিজে পথ। পিচের রাস্তা যেন কুৎসিত হাসি হাসছিল নিঃশব্দে। তাড়া খেয়ে লুপ্তজ্ঞান ভীত মানুষটাকে পালিয়ে যেতে দেখে হাসছিল।

বেঁহুশ, কেমন এক সম্মোহিত মানুষের মতন হেঁটে যাচ্ছিল তীর্থপতি। পাশ দিয়ে রিক্‌শঅলা গাল দিয়ে চলে গেল, কিছুই কানে গেল না তার। কান দুটো কালা হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে এক ঘোলাটে স্রোত অনবরত বয়ে যাচ্ছে—আর তীর্থপতি যেন একটি মাত্র অদ্ভুত একাগ্র চিন্তাকে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেই স্রোত থেকে উদ্ধার

করে নিতে। সমস্ত শরীরটাই দুর্বল লাগছে, ভীষণ দুর্বল; জ্বরের ঘোরে বিকারের মাথায় পথ চললে যেমন লাগে।

কর্কশ তীক্ষ্ণ একটা টানা শব্দে চমকে উঠল তীর্থপতি। স্পষ্ট চোখে তাকাল সামনে, চারপাশে। বড় রাস্তা...ট্রাম যাচ্ছে...পরিচিত স্থূল যান্ত্রিক আর্তনাদ কানের পরদায় চৈতন্যকে আরও একটু স্পষ্ট করে দিল। তীর্থপতি ঘোলাটে দৃষ্টিতে আলো, মানুষ, বাড়ি, দোকান, বাস সবই ক্রমশ দেখতে পেল। সমস্ত আছে। প্রত্যেকটি চেনা অভ্যস্ত জিনিস। খুব পরিচিত জগত তার নিত্যকার মতন বয়ে চলেছে। শুধু, তীর্থপতির মনে হল, এই জগত থেকে রাতারাতি তাকে কে যেন তাড়িয়ে দিয়েছে।

ট্যাক্সির অন্ধকার নরম-কোণায় আশ্রয় নিয়ে তীর্থপতি মনের বিক্ষিপ্ত জটলাকে একটু স্পষ্ট করতে চাইল।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে অনেক ফেনা সরিয়ে শেষে সেই তলিয়ে যাওয়া মুহূর্তটি ভেসে উঠল ঃ সামনে বকুল, বারান্দার আলোটুকু তার মুখে পড়েছে, বকুলের ওপর-ঠোঁটের সেই সুন্দর তিল, চোখে তরল হাসি। তীর্থপতি তখন পারা-পারহীন এক নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে ডুবে মরতে বসেছে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটছিল। হঠাৎ...বকুলকে সামনে পেয়ে তীর্থপতি বাঁচার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, আশা, ইচ্ছাকে তীব্রতম ভাবে অনুভব করেছিল। অবধারিত মৃত্যুর অন্ধকারে অসহায়ের মতন তলিয়ে যাবার আগে হাত বাড়িয়ে শেষ আশ্রয়টুকু সে খুঁজেছিল।

আরও কি কিছু ছিল তীর্থপতির সেই ভীত বিহ্বল মৃত দৃষ্টিতে? এমন কিছু—যার ধূসরতার মধ্যে লোভার্ত সতর্ক

একটি লালসা সুযোগের অপেক্ষা করছিল ? তীর্থপতি জানে না।...তবে বকুল ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বুকে ধাক্কা দিয়ে তীর্থপতিকে ঠেলে সরিয়ে দিল; আড়ষ্ট বিহ্বল গলায় ভীতিকর শব্দ উঠল। বকুল ভীষণ ভয় পেয়েছিল, ভীষণ ভয়। সম্ভবত পরে সে কেঁদে ফেলেছিল। ভাঙা, বোজা, দমবন্ধ গলায় কি যেন বলেছিল বকুল, শোওয়ার ঘরে পড়িমড়ি করে ছুটে যেতে যেতে। তীর্থপতি কিছুতেই মনে করতে পারল না।

কত রাত বোঝা যায় না। বৃষ্টি পড়ছে ; বাইরে অন্ধকার, জলরাশির অতল গাঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বত্থের পাতায় একটানা অনুচ্চ একটি ক্লান্তির শব্দ। ঘর অন্ধকার। স্থির নিঃশব্দ অসাড় রাত্রি।

তীর্থপতি ঘুমোতে পারে নি। বহুক্ষণ সে মনের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে। এখন ও ক্লান্ত, ক্ষত বিক্ষত, আহত। আর তীর্থপতি বুঝতে পেরেছে—এই যুদ্ধে তার হার হয়ে গেছে। চূড়ান্তভাবে হারার পর হতাশা ও নিঃস্বতা তাকে খানিকটা সুস্থির করেছে।

এখন, গভীর বেদনায় এবং সম্পূর্ণ এক রিক্ততার মধ্যে তীর্থপতি ভাবতে পারছিল, তার কৈশোর আর যৌবন একই পরিণতিতে এসে পৌঁছেচে। অতীতকে ভুলতে, মুছে নিশ্চিহ্ন করতে সে পারে নি।...

তীর্থপতি মুক্তি খুঁজেছিল। সে স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গের আচরণ অভ্যাস করেছিল, ভেবেছিল—সে মুক্ত, তাকে আর কেউ খাঁচায় ঢোকাতে পারবে না। কিন্তু মাসি আসার পর

তীর্থপতি বুঝল, পুরোনো খাঁচাটা নতুন করে তাকে আগল দিয়েছে। বদ্ধ পাগল বাবা, নিঃসঙ্গ অসহায় মাসি, সুপ্রাচীন পরিশুদ্ধ এক রক্তের বোধ ও অনুভূতি তাকে আর-এক বন্ধনের মধ্যে এনেছে। হাজার মাথা খুঁড়লেও এই অদ্ভুত বন্ধন থেকে পালাবার উপায় নেই।

ভালবাসার জন্যে এককালে কাঙাল ছিল তীর্থপতি। ক্ষুধার্তের মতন খুঁজে খুঁজে মরেছে। তখন তীর্থপতি তিতু ছিল। পরে ভালবাসাও আর সহ্য হত না। তখন সে তীর্থপতি। মনে হত ভালবাসার একটা উদ্দেশ্য আছে। জড়াতে চায়, খর্ব করতে চায় তার ব্যক্তিত্বকে। এ-চিন্তাই অসহ্য ছিল তার। কৈশোর তাকে কুকুর-ছানার মতন দূর দূর করে রেখেছিল, যৌবন তাকে অনেক কষ্টে একটি ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, বরং বলা ভাল—নিজে সে এই স্বাতন্ত্র্য এবং তার সত্তার একান্ত একটি গঠন সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এই সৃষ্টি তীর্থপতির। তাকে কে হারাতে চায়! তীর্থপতি অন্তত হারাবে না। কিছুতেই না। ভালবাসা কোমলতাকে ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত বিদ্বেষের সঙ্গে দূরে রেখে তীর্থপতি পালিয়ে পালিয়ে থেকেছে। হ্যাঁ, তীর্থপতির ভীষণ সন্দেহ ছিল এই মায়া মমতা দুর্বলতার ওপর। দূরে পালিয়ে নিজের চারপাশে এক নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে নিয়েছিল সে। নিজেকে সুখী, নিজের ব্যক্তিত্বকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। সেই নিবিড় নিঃসঙ্গতা তাকে তৃপ্তি দিত, উচ্চকুল মানসিক বোধকে শান্ত রাখত।

কিন্তু কোথাও একটা ভুল হয়ে গেল। মাসির কাছে হার মানতে গিয়ে, অন্য কার কাছেও হার মেনে বসল। নিঃসঙ্গত যে তাকে শান্তি দেয় নি—নতুন করে অনুভব করতে পারল।

তীর্থপতি (কতকাল পরে) আবার তিতুর মতনই এত বড় জগতে একটি দুটি নিবিড় কোমলতা মমতা ভালবাসাকে খুঁজছিল।....

তীর্থপতি আজ বুঝতে পারছে, সে হেরে গেছে। তিতুর কামনা ছিল মুক্তি আর ভালবাসা, তিতু পায় নি ; তীর্থপতিও শেষ পর্যন্ত মুক্তি আর ভালবাসাই খুঁজেছে আঁকাবাঁকা পথে, অন্য রূপে—তীর্থপতিও পেল না।

এখানে, এই জগতে, বাস্তবিক সুন্দর এক মুক্তি এবং আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসা আছে কি না—কে জানে!

শেষ রাতে তীর্থপতির চোখের সামনে খুব দুর্বল এক ছবি স্পষ্ট হবার চেষ্টা করছিল। সে-ছবি আজই দেখেছে তীর্থপতি। বকুলের বাড়িতে। তার ঘরে, সংসারে। একটি নিতান্ত সাধারণ বাসনায় তীর্থপতি এবার পীড়িত হচ্ছিল।

স্বপ্ন দেখছিল তীর্থপতি ঃ

আবছা অন্ধকার—তীর্থপতি যেন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় কাচের বাক্স চাপিয়ে কে একজন আসছে। কাছে এল। খাবারঅলা। আবছা অন্ধকার থেকে কতকগুলো মানুষ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অচেনা মানুষ সব। তীর্থপতি একটা বেঞ্চি দেখতে পেল, তারপর আর একটা। বাক্স, বিছানা, পুঁটলি, জলের কুঁজো।...হঠাৎ চোখে পড়ল রেল লাইন। তারপরই কানে গেল কে যেন শুধচ্ছে, সেকিন ক্লাস বাবু...? এবার সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। স্টেশনে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তীর্থপতি। গাড়ি আসার ঘণ্টা পড়েছে। কুলিরা মালপত্র মাথায় তুলছে, যাত্রীরা উদগ্রীব। তীর্থপতিও উদগ্রীব

হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকল। গাড়ি আসছে···গাড়ি আসছে···ঐ ইঞ্জিনের কালো মুখ ভেসে উঠল···ঐ যে ধোঁয়া ···লোকজন হুড়োহুড়ি করছে····ঘণ্টা বাজছে, ওই যে···গাড়ি এসে পড়ল।

তীর্থপতির মনে হল, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। বুক ধক্ ধক্ করছে। সাপের মতন সর সর করে এগিয়ে আসছে গাড়ি, রেল লাইন কাঁপছে, গমগম শব্দ। আর কতটুকুই বা—। ট্রেনটা এসে দাঁড়াবে আর তীর্থপতি একটা কামরায় চড়ে বসবে।

বুকের মধ্যে উত্তেজনা ধক্ ধক্ করছিল। তীর্থপতি স্থির চোখে তাকিয়ে আছে····ওই যে ইঞ্জিন····এগিয়ে আসছে··· বড় হচ্ছে···বড়, আরও বড়···গোল কালো—ক্রমশই এগিয়ে কাছে এল। একেবারে কাছে, ইঞ্জিন এবং পুরো ট্রেনটাই দেখতে পেল তীর্থপতি।

স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিল। আর মাত্র ক'মিনিট। তার-পর···? তারপর তীর্থপতি অন্য কোথাও।

ঘুম ভেঙে গেল তীর্থপতির। চোখ চেয়ে দেখল, তার পুরনো ছোট ঘর, সেই খাট, জানলা, দরজা, টেবিল। চাপা বিশ্রী ছোট ঘরে তীর্থপতি পড়ে আছে। যে-ঘর নিরানন্দ, মৃত, শূন্য।

উপসংহার

শেষ ঘরটির দরজাও খুলে দিল তীর্থপতি। নিঃশব্দে দু'টি কাঠের ডানা ঘরের অভ্যন্তরকে উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেতরে আলো নেই, তীর্থপতি কিছু দেখতে পেল না। পুরনো ধুলোর গন্ধ আর ভয়ংকর স্তব্ধতা। বাইরেও আলো নেই, অন্ধকার। আর নতুন ধুলোর গন্ধ।

কয়েক মুহূর্ত স্থির শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীর্থপতি একবার পুরো বাড়িটার যতখানি চোখ যায় দেখবার চেষ্টা করল। গাঢ় অশেষ অন্ধকারে স্থূল ছায়ার মতন একটি কদাকার দেহ যেন দাঁড়িয়ে আছে। তীর্থপতির মনে হল, এই ছায়া, এই দেহ সে সহস্রবার দেখেছে। তবু, কি আশ্চর্য, এর কাছেই আশ্রয় নিয়েছে। এখন, তীর্থপতির ঘৃণা হচ্ছিল, অসম্ভব ঘৃণা।

বাইরে এসে দাঁড়াল তীর্থপতি ; রাস্তায়। পিছনে বাড়িটা পড়ে আছে, প্রতিটি ঘরের দরজা জানলা সম্পূর্ণ-ভাবে খোলা, প্রত্যেকটি ঘর অন্ধকার এবং জনমানবহীন। শূন্য।

না, ঠিক শূন্য নয়। একটি ঘরে মায়া শুয়ে আছে। শান্ত নিশ্চল নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে। মায়াও মরল।...

কালো নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে তীর্থপতি হাঁটছিল, দেবদারু ও শিরীষের অসাড় ডালপালা তাকে দেখছিল, বাতাস পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাঠে পড়ছিল—মাঠ থেকে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মায়াও মরল। তীর্থপতি মৃত্যুর সেই অদ্ভুত মুক্ত চেহারাটাকে দেখবার চেষ্টা করছিল। মৃত্যুর রূপ নেই। তীর্থপতি দেখতে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, সে-রূপ বোধ

হয় এই অন্ধকারের মতন, গাঢ় ঘন নিকষ কালো—শূন্য থেকে শূন্যে বাতাসের পর অন্য বাতাসে বিস্তৃত, পারাপার-হীন।

এই মৃত্যু মা-কে নিয়েছে। এই মৃত্যু বাবাকে অশেষ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেছে। মাসিও এর কাছে হাত পেতে তার হাহাকার এবং নিঃসঙ্গতার কান্না থেকে বেঁচেছে। মায়াও বাঁচল।

তীর্থপতির আজ আর সন্দেহ নেই, জীবনের প্রথম কোষ গঠন থেকে মৃত্যু সব সময় জীবনকে দাবি করেছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতে পায়ে ধরে আয়ু ধার করে চলেছি। কেন? কোন প্রয়োজনে? জীবন কিছু দেবে, মৃত্যু যা দেয় না।

জীবনে কি আছে আর মৃত্যুতে কি নেই—তীর্থপতি আজ আর তা বুঝতে পারছে না। তার জীবন তাকে এক এক কপর্দকও দেয় নি। মুক্তি না, ভালবাসা নয়, শান্তিও না। কোনো অর্থ সে উদ্ধার করতে পারেনি এই জীবন-রহস্যের।

তীর্থপতির মনে হল, এই বিশ্বের কোথাও এক অদৃশ্য নির্মম শক্তি আছে। যে-শক্তি অট্টহাস-আনন্দে বাতাসের ভয়ংকর ঝাপটা মেরে ডানা ভেঙে পাখিকে অশান্ত হিংস্র কুটিল সমুদ্রে ফেলে দেয়। আর এই বিশ্বের ঊর্ধঅধঃ চেয়ে চেয়ে দেখে অসহায় বেদনার্ত কাতর সেই পাখিটির অলীক প্রাণান্ত পরিশ্রম, মুক্তির ব্যাকুলতা—কে যেন তাকেও তেমনই করে ফেলে দিয়েছিল এ-সংসারে। এবং সবাই দেখল, তিতু—তীর্থপতির প্রাণান্ত মুক্তিচেষ্টা।

মাঠ পেরিয়ে আরও রুক্ষ আরও কর্কশ পথে এগিয়ে গেল

তীর্থপতি। মাথার ওপর নিবন্ত নক্ষত্রদল, শান্ত স্থির নিরুদ্দেশ অন্ধকার, চারপাশ থেকেই যেন বাতাস ছুটে চলেছে—চাপা একান্ত অর্ধস্ফুট কান্নার রেশ বাজছে বাতাসে। এই নিস্তব্ধ শীতল কায়াহীন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তীর্থপতি আকাশের দিকে তাকাল। অপলকে অনেক—অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। অতি দূর একটি সীমাহীন দেশ যেন হাতছানি দিচ্ছে।

তীর্থপতি অনুভব করল একটা ট্রেন আসছে। সেই পুরনো ট্রেন কি! তিতু যার ইঞ্জিনের ধোঁয়াটুকু দূরে দূরে দেখেছিল—ভেবেছিল এই গাড়ি আসবে, তিতুকে অন্য দেশে নিয়ে যাবে।

ট্রেনটা আসছে। কাছেই এসে গেছে। তীর্থপতি একটু চঞ্চল হল। ঠিক তেমনই চঞ্চল—তীর্থপতি যেমন চঞ্চল হয়েছিল ট্রেনটাকে খুব কাছে এসে পড়তে দেখে, এবং ইঞ্জিনটাকে পুরো দেখতে পেয়ে—। তীর্থপতিও ভেবেছিল. এই গাড়ি থামবে—তাকে অন্য দেশে নিয়ে যাবে।

সেই ট্রেনটা আজ এল। তার আলো, তার মুখ, তার শব্দ, তার বার বার নিয়ে যাওয়া হাতছানি আজ সত্য হল।

তীর্থপতি একটু কাঁপল, চঞ্চল হ'ল, উত্তেজনায় অধীর হ'ল। কিছু নেওয়ার জন্যে এবার আর হাত বাড়াল না তীর্থপতি। তার নেওয়ার কিছু নেই।

পা বাড়াল তীর্থপতি।

ট্রেন এল, চলে গেল।

তীর্থপতি স্বপ্ন ভেঙে আর চোখ তুলে তাকাল না! কোনদিনই আর নয়।